সখা।

প্রমদাচরণ সেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

সপ্তম ভাগ।

১৮৮৯।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

"THE CHILD IS THE FATHER OF THE MAN."

কলিকাতা
২ নং বেণেটোলা লেন, "সখা"-যন্ত্রে, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত।

ঙ্ক।
৭৪
৩৮
৫১
৭
১২৩
৯২
১৫০
১০১
৫
১১৮
১৮০
১০
১৩৪
১৪৩
৫৮
৩
১৭২
১৪৪
৫৮
৭০
৩৬
১০৮
১৩৩
১৩৫
৩, ৬৫
১৫১
১৭২
৩৫
১২৮
৪৯
১১৫

সূচীপত্র।

বিষয়।	লেখক বা লেখিকাগণের নাম।	পত্রাঙ্ক।
অনরেবল প্রসন্নকুমার ঠাকুর (সচিত্র)	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	৭৪
আকবর সাহের মহানুভাবতা	শ্রীগগণচন্দ্র হোম	৩৮
আকাশ ভ্রমণ ও মেঘ হইতে লম্ফপ্রদান (সচিত্র)	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	৬১
আখ্যান-কুসুম	শ্রীগগণচন্দ্র হোম	৭
আগ্রা (সচিত্র)	শ্রীভুবনমোহন রায়	১২৩
ইংলণ্ডের রাজমুকুট (সচিত্র)	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	৯২
ঈশ্বরের প্রতি (পদ্য)	শ্রীমতী মাঃ	১৫০
উষাবালা	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	১০১
এলাহাবাদ বা প্রয়াগ (সচিত্র)	শ্রীভুবনমোহন রায়	৫
এলিজাবেথ ফ্রাই (সচিত্র)	ঐ	১২, ২৮, ৫২, ১১৮
ওরাংগা	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	১৮০
কংগ্রেস (জাতীয় মহাসমিতি)	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	১০
কৃষক (পদ্য)	শ্রীনিবারণচন্দ্র শর্ম্মা	১৩৪
খোকা বাবু (পদ্য)	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	১৪৩
গরিবের কুটীর (পদ্য) (প্রাপ্ত)	শ্রীচন্দ্রকান্ত বসু	৫৮
চরিত্র	শ্রীবিপিন বিহারী সেন বি, এ,	৩
চক্ষু (সচিত্র)	শ্রীভুবনমোহন রায়	১৫৪, ১৭২
ছায়াপথ	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	১৪৪
জন ব্রাইট (সচিত্র)	শ্রীভুবনমোহন রায়	৫৮
জ্যেষ্ঠতাত	শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,	৭০
টিয়াপাখী (সচিত্র)	ঐ	৩৬
ঠাকুর দাদার গল্প	শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	১০৮
তামাকের অপকারিতা (সচিত্র)	শ্রীভুবনমোহন রায়	১৩৩
দস্যুবীর তাঁতীয়া (সচিত্র)	ঐ	১৩৫
দাসত্ব প্রথা	শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,	৬৩, ৬৫
দিল্লি (সচিত্র)	শ্রীভুবনমোহন রায়	১৫১
দুষ্ট ছেলে (পদ্য)	শ্রীনিবারণচন্দ্র শর্ম্মা	১৭২
ধর্ম্মের প্রভাব	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	৩৫
ধাঁধা	———	১৬, ৩২, ১১২, ১২৮
নববর্ষ (পদ্য)	শ্রীনিবারণচন্দ্র শর্ম্মা	৪৯
নারিকেল, তাল ও খেজুর (সচিত্র)	শ্রীরামব্রহ্ম সান্যাল	১১৫

বিষয়।	লেখক বা লেখিকাগণের নাম।	পত্রাঙ্ক।
নূতন বৎসর (পদ্য) ...	শ্রীনিবারণচন্দ্র শর্ম্মা	২
পাটীগণিতের ফল ...	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	৮৯
পিঞ্জরে পাখী (পদ্য) (প্রাপ্ত) ...	শ্রীরাজেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী	৯৫
পেচক (সচিত্র) ...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	১৮৭
প্রকৃতির ছদ্মবেশ (সচিত্র) ...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	২৫
প্রহ্লাদ চরিত ...	শ্রীমতী কিরণশশী দেবী	১০৩
প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর (সচিত্র) ...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	১৮৬
বজ্রকবজ বা পুত্তিকাভুক ...	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম, এ, ...	১৭০
বাবা আস্‌চেন বাড়ী (পদ্য) ...	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	১০৩
বালক কুশধ্বজ ...	শ্রীশ্রীনাথ রায়	১৫৮, ১৬৮
বিড়াল (সচিত্র) ...	শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ, ...	১৯
বিবিধ (সচিত্র) ...	———	১৭, ৩৩, ৫০, ৮১, ৯৭, ১১৩, ১২৯, ১৪৫, ১৬১, ১৭৭
মজার খেলা (সচিত্র) ...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	৮৮
মহাভারতের গল্প ...	শ্রীভুবনমোহন রায়	৫৪
মন্ত্রণা বোধ ...	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	১১২
রাজা বাবু ...	শ্রীভুবনমোহন রায়	১৪০, ১৪৭
লিমার (সচিত্র) ...	শ্রীরামব্রহ্ম সান্যাল	৯৮
সৎসাহস ...	শ্রীভুবনমোহন রায়	৩১
সপ্তম বর্ষ ...	ঐ	১
সাঁওতালদের কুসংস্কার ...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	১৮৫
সারামার্টিন (সচিত্র) ...	শ্রীভুবনমোহন রায়	১৬২
সীতাকুণ্ড (সচিত্র) ...	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম, এ, ...	২৩, ১২৬, ১৩১
স্বার্থত্যাগ ...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	১৫
হাতী ধরা ...	শ্রীভুবনমো[illegible]	৮৪
হাসির দিনে কান্না (পদ্য) ...	শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	১৮৪
হেঁয়ালী গল্প ...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	৫৬, ৭৮, ৯৪, ১১০
ক্ষুদ্রজ্ঞানী ...	শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায়	৭২

———

সখা

সপ্তম ভাগ। প্রথম সংখ্যা।

জানুয়ারি, ১৮৮৯।

সপ্তম বর্ষ।

একে একে ছয় বৎসর চলিয়া গেল; পাঠক পাঠিকা! তোমাদের সখা আজ সপ্তম বৎসরে পদার্পণ করিতেছে। আজ এই শুভদিনে সখা তোমাদের কাছে উপস্থিত হইল; তোমরা কি ইহাকে আদর করিবে? আজ সখার জন্মদিনে প্রমদাচরণের কথাই আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িতেছে! সখা যাঁহার আদরের ধন ছিল, সখার যিনি জন্মদাতা, সেই প্রমদাচরণ আজ যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে আজ সখার জন্মদিনে তিনি কত আদর করিতেন! আজ তাঁহার শিশু সখাকে সাত বৎসরের দেখিয়া তাঁহার কত সুখ, কত আনন্দ হইত! আমরা সখার তেমন আদর—তেমন যত্ন করিতে পারিতেছি না, তেমন করিয়া সাজাইয়া তোমাদের কাছে উপস্থিত করিতে পারিতেছি না। প্রমদাচরণ জীবিত থাকিলে আজ তাঁহার সখাকে তিনি যে অঙ্গে যে আভরণের প্রয়োজন, যেখানে যাহা শোভা পায় তাহা দিয়া সাজাইতেন। প্রমদাচরণ চলিয়া গিয়াছেন, সখার লালন পালনের ভার আমাদের হস্তে পড়িয়াছে; আমরা তাঁহার যত্নের, আদরের সখাকে তেমন যত্ন আদর,—তেমন লালন পালন, করিতে পারিতেছি না। কিন্তু সাধ্যানুসারে চেষ্টা ও যত্নের আমরা ক্রটি করিতেছি না। সখা জীবিত থাকিয়া যাহাতে প্রমদাচরণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে, আমরা সাধ্যমতে সে চেষ্টা করিতেছি। সখা পিতৃমাতৃহীন বলিয়া তাহার আদর যত্ন, লালন পালন হইতেছে না, একথা কেহ না বলিতে পারেন, আমরা যথাসাধ্য সে চেষ্টা করিতেছি। যাহাতে বালক বালিকাদিগের চরিত্রের বিকাশ হয়, জ্ঞানের বিস্তার হয়, সুপথে মতি হয়, দয়া পরোপকার প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি প্রাণে জাগিয়া উঠে, এপ্রকার গল্প, আখ্যায়িকা, জীবন-চরিত এবং প্রবন্ধ প্রভৃতি, প্রতিবারেই সখার দিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি। দেশে ভাল চিত্র সুবিধামত পাওয়া যায় না, এই জন্য আমরা বিলাতের বিখ্যাত কাসেল্ (Cassell) কোম্পানীর নিকট হইতে চিত্র আনাইতেছি; এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকার আরও দুইটী কোম্পানীর নিকট ইহার জন্য পত্র লিখিয়াছি; সুবিধা হইলে আমরা সেই সকল সুন্দর চিত্রে সখার অঙ্গ সাজাইয়া পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিব।

আর দু একটী কথা বলিয়াই আমরা শেষ করিব। ছয় বৎসর পূর্ব্বে প্রমদাচরণ সখার জন্মদিনে কয়েকটী কথা লিখিয়াছিলেন। আমরা সেই কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিতেছি। "এই সুবৃহৎ ব্যাপারে দেশের সমস্ত শিক্ষিত পুরুষ এবং শিক্ষিতা রমণীদিগের সাহায্য আবশ্যক হইবে।

শিক্ষিত পিতামাতাদিগের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন আপন আপন বালক বালিকাকে শিক্ষা দিবার সময় আমাদিগকে তাঁহাদের সাহায্যকারী বলিয়া মনে করেন। এই পত্রিকার লিখিত গল্প প্রভৃতি দ্বারা বালক বালিকা-দিগের চরিত্রের বিকাশ এবং জ্ঞানের বিস্তার করাই আমাদিগের লক্ষ্য, সুতরাং যদি তাঁহারা দেখেন এই লক্ষ্যের বহির্ভূত কোনও বিষয় পত্রিকায় লিখিত হইতেছে, তখন যেন দয়া করিয়া আমাদিগকে তাহা জানান এবং যে প্রণালীতে লেখা হইতেছে, তৎসম্বন্ধে যাহাতে উন্নতি হইতে পারে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সে বিষয়ে পরামর্শ দেন।” নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এপ্রকার পরামর্শ আমরা এপর্য্যন্ত পাই নাই। বালক বালিকাদিগের পিতা-মাতা বা অভিভাবকদিগের পরামর্শ পাইলে, সখা দ্বারা আরও সুন্দর ও সুচারুরূপে কার্য্য হইতে পারে। কেবল বালক বালিকাদিগের পিতামাতা বা অভিভাবকগণ কেন, এ বিষয়ে যিনি আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া কোন পরামর্শ দিবেন, আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা গ্রহণ করিব। পাঠক পাঠিকাদিগের উপরও অনেক নির্ভর করে। বিলাতে বালক বালিকাদিগের জন্য যে সমস্ত পত্রিকা আছে, আমরা দেখিয়াছি তাহাতে পাঠক পাঠিকাগণ এমন সমস্ত প্রশ্ন করেন এবং এমন সকল বিষয় লিখিতে অনুরোধ করেন, যে তাহাতে সকলেরই বেশ উপকার হয়।

যাহা হউক, এ বৎসর যাহাতে আমরা সখাকে আরও সুন্দর সাজে সাজাইয়া পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট পাঠাইতে পারি তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিব। উপদেশপূর্ণ গল্প ও আখ্যায়িকা, জীবন-চরিত এবং অন্যান্য প্রবন্ধ ভিন্ন, সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের কথা, ঐতিহাসিক ঘটনা, ভারতবর্ষের বিবিধ স্থানের সচিত্র বিবরণ প্রভৃতি দিতে চেষ্টা করিব। এক কথায় সখা যাহাতে পাঠক পাঠিকা-দিগের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, আমরা সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইব।

অবশেষে যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া সখায় লিখিয়া-ছেন এবং লিখিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা অন্ত-রের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি এবং হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। যাঁহারা যে প্রকারে ইহার উন্নতির জন্য সাহায্য করিয়াছেন, যে সকল গ্রাহক গ্রাহিকা ইহাকে “সখা” বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন, সকলকেই আজ এই সখার জন্মদিনে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি; এবং যাঁহার কৃপায় শিশু সখা আজ ছয় বৎসর অতিক্রম করিয়া সপ্তম বৎসরে পদার্পণ করিল, এবং যিনি সকল শুভ সংকল্পের চিরসহায়, আমরা সেই পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া, আবার নূতন বৎসরের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি।

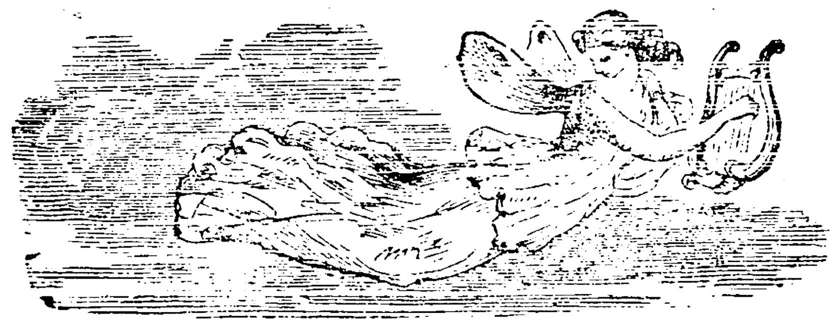

নূতন-বৎসর।

মলিন-মুখে, মনের-দুখে, পুরাতনটী গেল,
নূতন সাজে, ধরার মাঝে, নূতন বছর এল!
পূব্-আকাশে, নবীন-বেশে, উঠ্‌লো নূতন রবি,
সোণার-বরণ, চারু কিরণ, ভুবন-মোহন-ছবি!
এল নূতন, যায় পুরাতন, নাচ্‌চে বালকগণ,
নূতন-আশে, সুখ-সরসে, হ’চ্ছে নিমগণ!
মধুর-স্বরে, হরষ-ভরে, ডাক্‌ছে পাখিগণ,
হেরে নূতন, আদরের ধন, আহ্লাদে মগন!

ব’ল্‌চে ডেকে, দেখ্‌বি কে কে, আয় তোরা সকলে,
ওই গেলরে, জনমতরে, পুরাতন্‌টী চ’লে!
আস্‌চে ধেয়ে, দেখ্‌রে চেয়ে, সাধের নূতন ওই!
ক’রে আরতি, যত্নে অতি, আয়রে তারে লই!
হরষ মনে, শুভ-ক্ষণে, রাজার আসন-পরে,
এসরে ভাই, মিলে সবাই, সবাই সমাদরে!
ক’রে প্রণতি, “জগৎ-পতি”, কর এই মিনতি,
“দীন-দয়াময়,” হউন সদয়, এদীন-দেশের প্রতি!
যেনরে ভাই, আমরা-সবাই, গত বর্ষের মত,
এবৎসরে, তিলের তরে, দুঃখ না পাই এত!
যমের-দোসর, সেই ভয়ঙ্কর, “ঘূর্ণি-বায়ু”* এসে,
যেনরে আর, ঘোর হাহাকার, নাহি পাড়ে দেশে!
অনাবৃষ্টি, অতি-বৃষ্টি, যেন নাহি হয়!
জলাভাবে, শস্য সবে, নাহি হয় লয়!
সু-বর্ষণে, জলদ-গণে, তৃপ্ত করে দেশ!
যেন এবার, না থাকে আর, অন্ন-জ্বালা লেশ!
মহামারী, জ্বর-জারী, নাহি রহে আর!
স্বস্তি-সুখ, হাসি-মুখ, থাকে সবাকার!
হোন্ সুমতি, নরপতি, প্রজার প্রতি চান্!
“করের-ভার,” মস্তকে তার, যেন না চাপান্!
অনর্থ-মূল, দেশ-প্রতিকূল, মিছে সমর দায়,
আর যেনরে, নাহি করে, প্রজার কড়ি ব্যয়!
দেশ মজালে, সব ডুবালে, সুরা ভয়ঙ্কর,
রাজা-প্রজায়, মিলিয়া তায়, দূর করি সত্বর!
সকল কষ্ট, হউক নষ্ট, শান্তি করুক বাস!
মহোৎসবে, মাতি সবে, থাকি বারমাস!
আত্মীয় পর, ভগ্নি-সোদর, সবাই থাকুন সুখে!
যেনরে ভাই, দেখি সদাই, হাসি “সখা”র-মুখে!
এবৎসরে, খুব আদরে, যেন আবার ভাই,
হাসি মুখে, মনের-সুখে, বিদায় দিতে পাই!!

* “টর্ণেডো”।—গত বৎসরে এই ঝড় ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে বিস্তর অনিষ্টপাত করিয়াছিল।

চরিত্র।

আমরা এই প্রবন্ধে চরিত্র (character) এবং স্বভাব একই অর্থে ব্যবহার করিব। চরিত্র এবং স্বভাব বলিতে সামান্যতঃ কি বুঝায় এবং মানব সমাজেই বা কি বুঝায় তাহারই আলোচনায় আমরা অদ্যকার প্রবন্ধ শেষ করিব।

জগৎসংসারে যত দ্রব্য আছে প্রত্যেকেরই কোন না কোন বিশেষ স্বভাব আছে। সূর্য্যের স্বভাব প্রত্যহ উদয় হওয়া, পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া পশ্চিমে অস্ত যাওয়া, এবং রজনীর আঁধার বিনাশ করিয়া তেজের সহিত কিরণ প্রদান করা, ইত্যাদি। জলের স্বভাব উচ্চ হইতে নিম্নে যাওয়া, হিম লাগিলে বরফ হইয়া জমাট বান্ধা, আবার উত্তাপে বাষ্প হইয়া অদৃশ্য হওয়া, ইত্যাদি। বিড়ালের স্বভাব ইন্দুর নাশ করা, সহস্র সাবধান হইলে ও যত্ন করিলেও চুরী করিয়া দুধ খাওয়া, ঘুঙ্গুর ঘুঙ্গুর করিয়া আনন্দ প্রকাশ করা, ইত্যাদি। এই প্রকার জগতের প্রত্যেক দ্রব্যের কোন না কোন বিশেষ স্বভাব আছে। সুতরাং মানুষেরও বিশেষ কোন স্বভাব আছে তার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, মানবজাতির মধ্যে আবার একজনের প্রকৃতির সহিত আর একজনের প্রকৃতির প্রভেদ যত বেশী এমন আর কোন জীবের বা জড়দ্রব্যের মধ্যে তত নহে। গঙ্গার জল উত্তাপে বাষ্প হয়, যমুনার জলও তাহাই হইবে, আবার তোমাদের বাড়ীর পেছ-

নের ডোবার জলও যে তাহা হইবে না এমন কোন কারণ দেখা যায় না। শীতপ্রধান দেশের হিম যদি এ প্রদেশে থাকিত তবে এদেশের জল যে বরফে পরিণত হইত তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। সূর্য্য সর্ব্বদাই একভাবে চলিতেছে; গগণ-মণ্ডল ঘন মেঘে আবৃতই থাকুক, আর শীতকালের কুয়াসায় ঢাকাই থাকুক, সূর্য্যের উদয় হইতেও বিরাম নাই, বা কিরণ প্রদান করিতেও বিশ্রাম নাই। কিন্তু মানবসমাজে এরূপ সমভাব দৃষ্ট হয় না। কেহবা নিশিথে নিশাচরের ন্যায় পরদ্রব্য হরণে রত, কেহবা দিবসে সুরাপানে মত্ত হইয়া যথেচ্ছাচারে সাধারণের ভয়ের কারণ হইতেছে। আবার অন্যদিকে কেহবা নিজের সর্ব্বস্ব ধন ব্যয় করিয়া পরোপকারে রত, আবার কেহবা ধর্ম্মের নিশান উড়াইতে উড়াইতে ঈশ্বরের নাম ঘোষণায় জীবন কাটাইতেছে। চৈতন্য, বুদ্ধ, ঈশা এক দিকে, আবার নিরো, সিরাজউদ্দৌলা প্রভৃতি অন্য দিকে।

মানবসমাজ এবং অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া আমরা দেখি যে, স্বভাব পরিবর্ত্তন করিবার একটি ক্ষমতা মানবের হাতে আছে। মানুষ ইচ্ছা করিলে ভাল হইতে পারে, ইচ্ছা করিলে মন্দ হইতে পারে। মানুষ দেবতা হইতে পারে, মানুষ দানবও হইতে পারে। এ ক্ষমতা মানুষের কোথায়, এবং কেমন করিয়া সে ক্ষমতা চালাইলে মানুষ দেবতা হইতে পারে, তাহাই দেখান আমাদের উদ্দেশ্য। এবং এই প্রবন্ধ তাহার সূচনা মাত্র।

স্বভাব বিষয়ে যিনি যাহা এযাবৎ লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন, তাহা সত্য হইলেও সম্পূর্ণ নহে। স্বভাব ভাল এবং মন্দ এই দুই বিভাগে বিভক্ত, ইহা সত্য। যে ব্যক্তি অমায়িক, সত্যবাদী, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, ধার্ম্মিক এবং বিনয়ী তাহার স্বভাব উত্তম সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন ব্যক্তির স্বভাব কি প্রকার তাহা কতক বলা হইলেই সম্পূর্ণ বলা হইল না। মনে কর একটি টেবিল সম্বন্ধে যদি বলা হইল যে টেবলটী গোলাকার, টেবলটি বৃহৎ, টেবলটি বার্ণিশ করা, তাহা হইলে কি বলা হইল যে টেবলটি কি উপাদানে গঠিত? টেবলটি যে কাষ্ঠ নির্ম্মিত তাহা বলা প্রয়োজন। এবং গোলাকার, বৃহৎ ইত্যাদি ইহার বিশেষণ মাত্র। ইহা প্রকৃত কি উপাদানে গঠিত তাহাই পূর্ব্বে নির্ণয় করা প্রয়োজন এবং তৎপর ইহার সৌন্দর্য্যার্থে বিশেষণ অন্বেষণ করা আবশ্যক।

মানবের জ্ঞান আছে। অন্যান্য পশুদের ভাল মন্দ বিবেচনার ক্ষমতা নাই,—কিন্তু মানবের তাহা আছে। একটি নির্দ্দোষী সুন্দর শিশু সর্পের গাত্রে হস্ত দিলে যে, সর্প তাহাকে দংশন করিবে না এমত চিন্তা করা অসম্ভব। এই যে গৃহে গৃহে রাশি রাশি বস্ত্র ইন্দুর এবং উই পোকায় নষ্ট করে, তাহা যে অন্যায় কার্য্য তাহা কি তাহারা ভাবিয়া দেখে? কখনই না। কিন্তু মানবের মধ্যে এ প্রকার অজ্ঞতা দেখা যায় না। সুরাপান যে অন্যায়, মদ্যপায়ী তাহা বেশ বুঝে; চুরী করা অন্যায়, তাহা চোরে বেশ বুঝে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এসমুদয় অন্যায় বুঝিয়াও কোন কোন মানব তাহা হইতে বিরত হইতে পারে না। তাহাদের কার্য্য করিবার ক্ষমতা এত দুর্ব্বল যে, তাহাদের জ্ঞানানুসারে তাহারা কার্য্য করিতে পারে না। সুতরাং মানুষ যখন যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝে তাহা যদি করিতে না পারে তখন আমরা তাহাকে মন্দ স্বভাব, এবং যখন তাহা পারে তাহাকে ভাল স্বভাবের বলিয়া থাকি। মানুষের কার্য্য যে তাহার নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, সে বিষয় বোধ হয় কেহই সন্দেহ করিবেন না। যদি

কেহ দেবমন্দিরে না যাইয়া সুরাদোকানে যায় তবে কি আমরা বিশ্বাস করিব যে, সে তাহার ভাগ্য দোষে তথায় যাইতেছে, এবং তাহার নিজের ইচ্ছায় নহে?

এখন আমরা দেখিতেছি যে, প্রত্যেক মানুষের নিম্নলিখিত স্বাভাবিক গুণ আছে।—

১। ভাল মন্দ বোধ জ্ঞান।

২। নিজের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার ক্ষমতা।

মানুষের কার্য্যে যখন এই উভয়ের সমাবেশ দেখি তখনই আমরা ভাল স্বভাব দেখিতে পাই, আর যখন তাহা না হয় তখন আমরা মন্দ স্বভাব দেখি। একটি দৃষ্টান্ত দিব। বৃদ্ধ, দুর্ব্বল পিতার উপদেশ, পুত্র ইচ্ছা করিলে যেমন পালন বা অগ্রাহ্য করিতে পারে, প্রত্যেক মানবও তেমনি সৎ বা অসৎ ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত বা অগ্রাহ্য করিতে পারে।

সুতরাং মানব স্বভাব, আমাদের মতে ব্যক্তিগত ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত—ভাল বা মন্দ। মানুষের ইচ্ছা এবং কর্ত্তব্য বোধে যখন সামঞ্জস্য থাকে, তখন মানুষের ভাল স্বভাব এবং যখন অসামঞ্জস্য হয় তখন মন্দ স্বভাব দেখি।

বালককাল হইতে কেমন করিয়া চেষ্টা করিলে, ভবিষ্যতে ভাল স্বভাব হইতে পারে, সে বিষয়ে পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

এলাহাবাদ বা প্রয়াগ।

হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ প্রয়াগ ভারতের একটী অতি পুরাতন এবং প্রধান নগর। মহাভারতে প্রয়াগ ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানকে বারণাবত বলা হইয়াছে, পাণ্ডবগণ এই বারণাবতেই অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ রাজা অশোক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন; সে স্তম্ভটী এখনও দুর্গমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে পাঠানগণ প্রয়াগ অধিকার করে। ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট বাবর কর্ত্তৃক পাঠানদিগের হস্ত হইতে প্রয়াগ গৃহীত হয়। এবং মোগল-কুল-ভূষণ আকবর ইহার নাম এলাহাবাদ বা "আল্লাহাবাদ" অর্থাৎ ঈশ্বরের নগর রাখেন। এখন এলাহাবাদ নামেই ইহা প্রসিদ্ধ। প্রয়াগ, গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে অবস্থিত। হিন্দুদিগের ইহা একটী অতি পবিত্র তীর্থ স্থান; এবং ভারবর্ষের নানাস্থান হইতে হিন্দুগণ এই খানে তীর্থ করিতে আসিয়া থাকেন। গঙ্গা, যমুনা, এবং সরস্বতী হিন্দুদিগের এই তিনটী পবিত্র নদী সম্মিলনের জন্য এস্থান ত্রিবেণী নামে অভিহিত হইয়া থাকে, এবং হিন্দুগণ এই সঙ্গম স্থানকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করেন। গঙ্গা এবং যমুনার দুইটী পৃথক স্রোত যে স্থানে মিলিত হইয়াছে সে স্থান অতি সুন্দর; দুইটী বিভিন্ন স্রোত বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; গঙ্গার জল সাদা, এবং যমুনার জল কাল। কিন্তু সরস্বতী

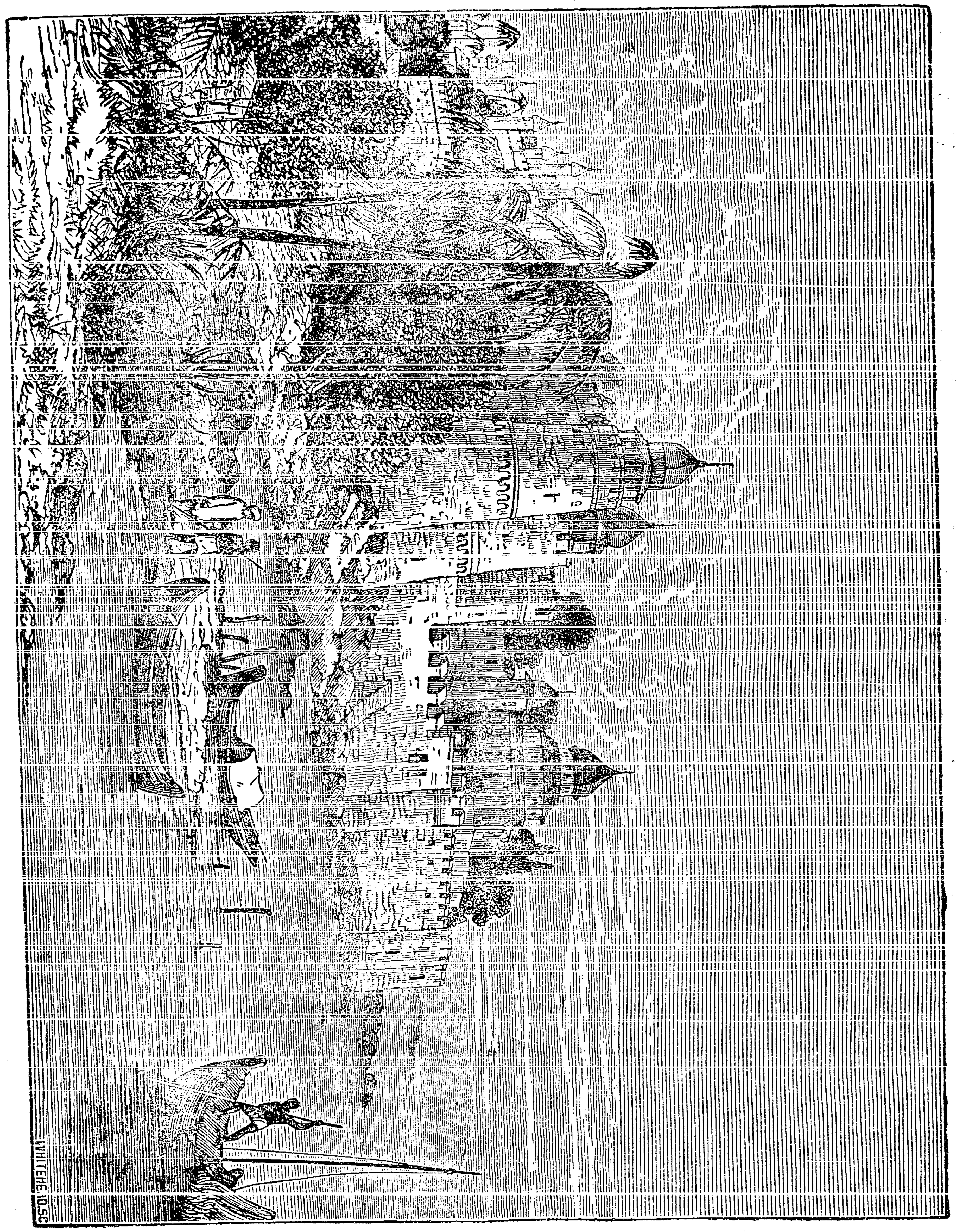

নামে কোন স্বতন্ত্র নদীস্রোত প্রয়াগের নিকট দৃষ্টিগোচর হয় না। হিন্দুরা বলেন যে, ঐ নদীস্রোত ভূগর্ভ দিয়া প্রবাহিত হইয়া, গঙ্গা ও যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রয়াগ দুর্গের নিম্নে ভূগর্ভস্থ একটী মন্দিরের প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীরের গাত্র হইতে যে অতি অল্প অল্প জলধারা নিসৃত হইতেছে, তাহা দেখাইয়া হিন্দুরা বলিয়া থাকেন যে, ইহাই সেই সরস্বতীর ভূগর্ভস্থ স্রোতধারা। এই প্রয়াগ তীর্থে প্রতি বৎসর মাঘিপূর্ণীমার সময় একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে।

এলাহাবাদ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাবের হস্ত হইতে ইংরাজদিগের হস্তে যায়। এবং ইংরাজেরা এই স্থান দিল্লীর নাম মাত্র সম্রাট সাহ আলমের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। সাহ আলম মহারাষ্ট্রীরদিগের সহিত যোগদান করাতে, ইংরাজেরা এলাহাবাদ ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাবকে প্রদান করেন। ইংরাজেরা অযোধ্যা রক্ষা করিবেন এবং অযোধ্যার নবাব তৎপরিবর্ত্তে ইংরাজদিগকে একটা কর প্রদান করিবেন, এই প্রকার এক সন্ধি হয়। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব এই করের পরিবর্ত্তে এলাহাবাদ ও তন্নিকটস্থ স্থান ইংরাজদিগের হস্তে অর্পণ করেন। এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহের শান্তি হইলে, এলাহাবাদ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী হয়।

এলাহাবাদের যে স্থানে এদেশীয়দিগের বাস, সে স্থান তত সুন্দর নহে। কিন্তু ইংরাজেরা যে স্থানে বাস করেন, সে স্থানটী বেশ সুন্দর; এখানে অনেক বাঙ্গালীরও বাস আছে। মিউর কলেজের বাড়ীটী এখনকার বাড়ীর মধ্যে একটা দেখিবার জিনিস।

পুরাতন দেখিবার জিনিসের মধ্যে এলাহাবাদ-দুর্গই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান (পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় চিত্র দেখ); তার পর খুস্রুবাগ এবং জুম্মামসজিদ্। প্রয়াগের দুর্গটী অতি পুরাতন; ইহা হিন্দুদিগের সময় হইতে আছে। মোগলসম্রাট আকবর হিন্দুদিগের সেই পুরাতন দুর্গটী রক্ত প্রস্তর দ্বারা পুনর্নির্ম্মিত করেন। এই দুর্গ মধ্যে বৌদ্ধরাজ অশোক নির্ম্মিত এক স্তম্ভ আছে; ইতিপূর্ব্বেই তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এই স্তম্ভের নিকটেই ভূগর্ভস্থ সেই দেবমন্দিরে যাইবার জন্য একটী সোপান আছে। এই স্থানে একটী বট গাছের গুঁড়ি দেখিতে পাওয়া যায়; কথিত আছে ইহার বয়স পোনের শত বৎসর। এই গুঁড়িটী এখনও জীবিত রহিয়াছে এবং হিন্দুগণ এই স্থানে পূজা দিয়া থাকেন। এই স্থানে একটী প্রদীপ সর্ব্বদাই জ্বলিতেছে, এবং পূজার জন্য একজন ব্রাহ্মণ উপস্থিত রহিয়াছেন। দুর্গ মধ্যে আকবরের একটী বৃহৎ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই প্রাসাদের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রকোষ্ঠে ইংরাজেরা একটী অস্ত্রাগার স্থাপিত করিয়াছেন।

খুস্রুবাগ উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মিত একটী সুন্দর বাগান। ইহার মধ্যে তিনটী প্রস্তর-নির্ম্মিত গোরস্তম্ভ আছে। এই প্রস্তর নির্ম্মিত গোরগুলি অতিশয় সুন্দর; ইহার উপরে শ্বেত প্রস্তরের গম্বুজ রহিয়াছে; বাহিরের দিক নানাপ্রকার কারুকার্য্যে শোভিত এবং ভিতরের দিক সুন্দররূপে চিত্রিত রহিয়াছে। মধ্যস্থানে জাহাঙ্গীরের পুত্র খুস্রুর গোরস্তম্ভ; এইটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং দেখিতে আগ্রার তাজমহলের ন্যায়। এই স্তম্ভের দক্ষিণ-পার্শ্বে খুস্রুর মাতার, এবং বামপার্শ্বে কনিষ্ঠ ভ্রাতার গোরস্তম্ভ রহিয়াছে।

আখ্যান-কুসুম।

প্রিয় বালক বালিকাগণ, আমি একখানা সুন্দর ছোট খাট আখ্যায়িকার বই পড়িতেছিলাম; তাহা হইতে দু একটী গল্প তোমাদিগকে উপহার দিতেছি। আশা করি, তোমরা তাহা পড়িয়া সুখী হইবে ও উপকার লাভ করিবে।

"আদর্শ ব্যবহার।"

বঙ্গদেশে নুরপুর নামে একটী গ্রাম আছে। এক সময় তথায় যাদব চন্দ্র রায় নামে একজন জমিদার ছিলেন। সেই বৃদ্ধ জমিদার শিকার করিতে বড় ভালবাসিতেন;—তিনি প্রায় প্রতিদিনই শিকারে বাহির হইতেন। একদিন তাঁহার জমিদারীর প্রজা একজন সামান্য কৃষক আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আপনি যে শিকার করিতে গিয়াছিলেন তাহাতেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে; আপনার সঙ্গের ঘোড়া, লোকজন ও শিকারী কুকুরাদির পদাঘাতে আমার ক্ষেতের ফসল একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এবৎসর আর যে তাহাতে কিছু হইবে এমন আশা নাই।" কৃষকের এই কথা শুনিয়া জমিদার বলিলেন—"হাঁ, আমরা যে তোমার সমূহ ক্ষতি করিয়াছি, তাহা আমি অবগত আছি। তোমার কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা যদি তুমি আমাকে ঠিক করিয়া বলিতে পার, তবে আমি সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিব।" কৃষক এইকথা শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া বলিল, "হুজুর দয়া করিয়া এরূপ হুকুম করিবেন জানিয়া, আমি আমার একজন আত্মীয় দ্বারা পূর্ব্বেই তাহা ঠিক করাইয়াছিলাম।" জমিদার জিজ্ঞাসা করিলেন "কি পরিমাণে তোমার ক্ষতি হইয়াছে?" কৃষক বলিল "আজ্ঞে পঞ্চাশ টাকার অধিক নয়।"

"কি, পঞ্চাশ টাকা মাত্র! আচ্ছা, তা আমি এখনই দিতেছি।" এই বলিয়া সেই বৃদ্ধ জমিদার খাদাঞ্জিকে পঞ্চাশটী টাকা দিবার জন্য হুকুম দিয়া কৃষককে বিদায় দিলেন।

কৃষক খাদাঞ্জিখানা হইতে টাকা লইয়া গৃহে চলিয়া গেল। কিন্তু ইহার দুই মাস পরে সে আবার জমিদারের কাছারিতে আসিয়া জমিদার মহাশয়ের সাক্ষাৎ প্রার্থী হইল। জমিদার মহাশয়ের সম্মুখে যাইয়া বলিল, "হুজুর, আপনার হয়ত সেই ক্ষেতের কথা মনে থাকিতে পারে, আমি সেই বিষয় নিয়াই আবার হুজুরের নিকট আসিয়াছি।" জমিদার একথা শুনিয়া বলিলেন,—"কেন, আবার কেন? আমি কি তখন উপযুক্ত পরিমাণে তোমার ক্ষতিপূরণ করি নাই?" কৃষক যোড় হস্তে বলিল—"আজ্ঞে, হাঁ, তাহা করিয়াছেন; আমি এখন সেজন্য আসি নাই। আমি আজ সেই টাকা ফেরত দিতে আসিয়াছি, কারণ এখন দেখা যাইতেছে যে, তদ্দ্বারা আমার ক্ষেতের কোন ক্ষতি হয় নাই, আশ্পাশের ক্ষেত হইতে আমার ক্ষেতে বরং অধিক ফসল জন্মিয়াছে। আমার লোকসান্ হইবে ভাবিয়াই তখন আমি হুজুরের নিকট টাকা নিয়াছিলাম, কিন্তু এখন লোকসান্ না হইয়া বরং আমার লাভই হইয়াছে; তাই, হুজুর দয়া করিয়া যে টাকা দিয়াছিলেন, তাহা আমি ফেরত দিতে আসিয়াছি।"

একথা শুনিয়া সেই প্রবীণ জমিদার খুসী হইয়া বলিলেন,—"আমি তোমার কার্য্যে খুব সন্তুষ্ট হইলাম, লোকের এরূপ ব্যবহার আমি বড়ই ভাল বাসি; মানুষের সঙ্গে মানুষের এরূপ সদাচরণই বাঞ্ছনীয়।" এই বলিয়া জমিদার সেই কৃষকের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন;—তাহার পরিবার, সন্তান সন্ততি ও তাহাদের বয়সাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল তাহার সহিত কথা বার্ত্তার পর তিনি অপর একটী কুঠরিতে প্রবেশ করিলেন, এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কৃষকের হাতে ১২০৲ একশত কুড়ি টাকার একখানা চেক্ (দলিল) দিয়া বলিলেন—"ইহা যত্ন করিয়া রাখিয়া দিবে, এবং তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তুমি কি ঘটনা উপলক্ষে

ইহা লাভ করিয়াছ, তাহা বলিয়া এই খানি তাহাকে দিবে।"

এখন, তোমরা এই অশিক্ষিত সামান্য কৃষকের সাধুতার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অবশ্য মোহিত ও বিস্মিত হইয়াছ! কৃষকের চরিত্র অপেক্ষা সেই বৃদ্ধ জমিদারের প্রকৃতিও কোন অংশেই অল্প মহানুভব নহে; সেই সাধু কৃষকের প্রতি তিনি এরূপ ব্যবহার ও তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া, তাহার সন্তান সন্ততিদিগকে সততা ও সাধুতার দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। বালকগণ, তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়ত কালে এই মহানুভব জমিদারের মত অবস্থাপন্ন হইবে; আশা করি, তোমরা আজ যে সদ্দৃষ্টান্তের কথা পড়িলে, তাহা বিস্মৃত হইবে না। মানুষের প্রকৃতি সৎ হইলে, যেরূপ অবস্থাপন্ন হউক না কেন, সকল অবস্থাতেই সে সাধু ব্যবহার করিতে পারে; এই কৃষকই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল!

———

"এক গ্লাস জল।"

ফরাসি-বিপ্লবের প্রারম্ভে একদা কয়েকটী মহিলা রাজধানী পেরিস (Paris) নগরের কোন প্রান্তসীমায় ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অপরাপর সকলেই ফরাসী দেশীয়া ছিলেন, কেবল একজন মাত্র ইংলণ্ডীয় মহিলা ছিলেন। তখন ধন সম্পত্তি ও জীবন রক্ষার জন্য নগরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সৈন্যগণ প্রহরী নিযুক্ত থাকিত। সেই মহিলাগণ বেড়াইতে বেড়াইতে সেই সকল প্রহরীদের একজনের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন! তোমরা হয়ত জাননা যে, একজন প্রহরী যতক্ষণ পর্য্যন্ত আসিয়া অন্য প্রহরীর কার্য্য-ভার গ্রহণ না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীবন গেলেও তাহার স্থানান্তরিত হওয়ার হুকুম বা নিয়ম নাই। সে সেই মহিলাদিগকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের নিকট এক গ্লাস জল চাহিয়া বলিল, "আপনারা জানেন, আমি যদি আমার পাহারার স্থান ছাড়িয়া যাই, তবে আমার প্রাণদণ্ড হইবে; অথচ আমি এত পিপাসার্ত্ত হইয়াছি যে, যদি শীঘ্র একটু জল না পাই, তবে অল্পক্ষণ মধ্যেই আমার মৃত্যু হইবে।" ফরাসী মহিলাগণ এই সামান্য সৈনিকের কথায় কর্ণপাত না করিয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু ইংরেজ মহিলাটী সেরূপ করিতে পারিলেন না। তিনি সহানুভূতি পরবশ হইয়া তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না; তিনি তাঁহার সঙ্গিনীদিগের নিন্দা, কুৎসা ও উপহাস বিদ্রূপের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তাহাকে এক গ্লাস শীতল জল দিলেন। এই এক গ্লাস জল যদিও যৎসামান্য, তথাপি ইহা দ্বারা সেই প্রহরী সৈন্যের প্রাণ রক্ষিত হইল এবং তজ্জন্য সে সেই মহিলার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে, যখন ফরাসি বিপ্লবের ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল, তখন এক রাত্রিতে আমাদের এই মহিলাগণ যে বিদ্যালয়ের বাড়ীতে বাস করিতেন, হত্যাকারীগণ সেই বাড়ী আক্রমণ করিল, এবং একমাত্র সেই ইংরেজ মহিলাটী ব্যতীত আর সকলের প্রাণ বিনাশ করিল। সেই প্রহরী সৈন্য তাহার জীবন পণ করিয়া তাহার জীবন রক্ষয়িত্রী ইংরেজ মহিলাকে সেই হত্যাকাণ্ড হইতে উদ্ধার করিয়া, পেরিস নগরের বাহিরে রাখিয়া আসিল। বালক বালিকাগণ, এই গল্প হইতে তোমরা ইহা দেখিতে পাইতেছ যে, এই একটী অতি সামান্য দয়ার কার্য্য হইতে পরিণামে কি মহৎ ফল উৎপন্ন হইয়াছিল!

আশা করি তোমরা এই ইংরেজ মহিলার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে এবং সেই প্রহরীর দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিবে। মনুষ্য জাতির উপকার করিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইবে না। উপকারীর উপকারকে উপেক্ষা করিবে না, সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উপকারের প্রতিদান করিতে যত্নবান হইবে।

কংগ্রেস্।

(জাতীয় মহাসমিতি)।

একটা কথা লইয়া দেশে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং আসাম হইতে সিন্ধুদেশ, এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষেই শুধু নহে, কিন্তু সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, এ তরঙ্গ ইংলণ্ডেও গিয়া পৌঁছিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, মহারাষ্ট্রীয়, পারসী, শিখ প্রভৃতি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতীর মধ্যেই যে কেবল এই কংগ্রেস্ কোলাহল উঠিয়াছে তাহা নয়, কিন্তু ভারত ও বিলাতের ইংরাজদিগের মধ্যেও এই কংগ্রেস্ কথার আন্দোলন হইতেছে। দেশের এমন একটা ব্যাপার সম্বন্ধে তোমাদের অন্ধকারে থাকাটা ভাল নয়, তাই আমরা সংক্ষেপে কংগ্রেসের কথা বলিতেছি।

পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকেই কংগ্রেসের কথা শুনিয়া থাকিবে; তোমাদের অনেকের পিতা, খুড়া, দাদা প্রভৃতি কেহ না কেহ, এই চারি বৎসর পর্য্যন্ত যে কংগ্রেস্ হইতেছে, তাহার কোন না কোন কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেস্ কথাটা ইংরাজি। বাঙ্গলায় ইহার নাম হইয়াছে—জাতীয় মহাসমিতি।

১৮৮০ বা ৮১ সালে কলিকাতার ভারতসভায় শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু বন্ধুদের মধ্যে পরামর্শ করেন যে, দেশের শিক্ষিত এবং গণ্য মান্য ও দেশহিতৈষীগণের বৎসরের মধ্যে এক একবার মিলিত হইয়া দেশের হিতকর বিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ১৮৮৩-৮৪ সালের কলিকাতার মহামেলা উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে অনেকে কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন; এবং সেই সময় এই সভার অধিবেশন হইবে এইরূপ স্থির হয়। তদনুসারে ১৮৮৩ সনে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় এই সভার অধিবেশন হয়। তখনও এ সভার নাম কংগ্রেস্ হয় নাই—তখন নাম ছিল ন্যাসন্যাল কন্‌ফারেন্স;—অর্থাৎ জাতীয় সভা। সেই সভায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অনেক গণ্যমান্য দেশহিতৈষীগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সভায় স্থির হয় যে, এই সম্মিলনটী প্রতি বৎসরই হইবে; এবং এক এক বৎসর ভারতের এক এক প্রধান নগরে ইহার অধিবেশন হইবে। হিউম্ সাহেবের নাম বোধ হয় তোমরা কেহ কেহ শুনিয়া থাকিবে। ইনি গভর্ণমেণ্টের একজন খুব উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, গভর্ণমেণ্টে ইহাঁর অত্যন্ত সুখ্যাতি ছিল; এবং ইহাকে ছোট লাটের পদ দিবার কথা হয়। কিন্তু তিনি তাহা লইতে স্বীকৃত হন নাই, এবং গভর্ণমেণ্টের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পেন্সন লইয়াছেন। ইনি এদেশের লোকের খুব হিতৈষী এবং এখন এই দেশের লোকের হিতের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। হিউম সাহেব এই দেশকেই তাঁহার ঘর বাড়ী করিয়াছেন। কলিকাতার জাতীয় সভার সংবাদ হিউম সাহেব যখন পান, তখন তিনি বিলাতে ছিলেন। তিনি পুনাতে তাঁহার বন্ধুদের নিকট লিখিয়া পাঠান যে, তাঁহারা ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে যত

প্রধান প্রধান সভা আছে, তাহার সভ্যদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া একটী জাতীয় মহাসমিতির (ন্যাসন্যাল কংগ্রেস) অনুষ্ঠান করেন। তদনুসারে এই জাতীয় মহাসমিতির প্রথম অধিবেশন পুনা নগরে হইবার কথা হয়; পুনাতে "পুনা সার্ব্বজনিক সভা" নামে দেশীয় একটী খুব বড় সভা আছে; এই সভাই সমস্ত আয়োজনের ভার গ্রহণ করেন। বোম্বাই, বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ এবং উত্তর পশ্চিম প্রভৃতি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের শিক্ষিত এবং রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে লইয়া এই সভা হইবে এই প্রকার স্থির হয়। এবং তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হয়। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরস্পর পরিচয় এবং দেশ শাসন-নীতি সম্বন্ধে আলোচনা ও সে সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে দেশের লোকের অভিপ্রায় ও আকাঙ্ক্ষা অবগত করা, এই উদ্দেশ্য লইয়া এই জাতীয় মহাসমিতির জন্ম হয়। সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, এমন সময় পুনা নগরে ওলাউঠা রোগ দেখা দিল। উদ্যোগীগণ তাহাতে হতাশ্বাস না হইয়া তৎক্ষণাৎ বোম্বাই নগরে এই সভার অধিবেশনের জন্য বন্দোবস্ত করিলেন। এবং ১৮৮৫ সনে ডিসেম্বর মাসের শেষে বোম্বাই নগরে মহাসমিতির প্রথম অধিবেশন হইল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ এই জাতীয় মহাসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এবৎসর এই প্রতিনিধিগণের সংখ্যা একশতেরও কম ছিল।

পর বৎসর আবার ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় এই মহাসমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে ৪৪০ জন প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। আমরা এই মহাসমিতির সভায় উপস্থিত ছিলাম। কলিকাতায় তিন দিন পর্য্যন্ত এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বিস্তীর্ণ ভারতের বিভিন্ন জাতিদিগের সে একত্র সম্মিলন কি সুন্দর দৃশ্য, তাহা না দেখিলে বুঝান যায় না! ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি দেশের কাজের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে আসিয়া একত্রিত হইয়াছেন, দেখিলে বড় আনন্দ হয়; তখন আর আপন পর মনে থাকে না;—মনে হয় যেন আমরা সকলেই এক।

জাতীয় মহাসমিতির তৃতীয় অধিবেশন মান্দ্রাজ নগরে হয়। এবৎসর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে ৬০৭ জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। গত বৎসর এই জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন এলাহাবাদে হইয়া গিয়াছে। এবার ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে ১৪০০ শত প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ইহাঁদের থাকিবার জন্য এবং সভার জন্য যে আয়োজন হইয়াছিল তাহার বিবরণ দিবার স্থান আমাদের নাই; অনেক বাঙ্গলা পত্রিকায় সে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তোমরা অনেকে পড়িয়া থাকিবে। এই সভার কার্য্যে যে কেবল ভারতবর্ষের লোকেই যোগ দেন তাহা নহে; এদেশের অনেক সদাশয় ও হিতৈষী ইংরাজ ও ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন।

প্রথমবারে বোম্বাই নগরে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক সমবেত হইলে, বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি সার উইলিয়াম ওয়েডারবরণ, বম্বে হাইকোর্টের জজ জার্ডিন প্রভৃতি বড় বড় লোক অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে অভ্যর্থনা করিতে আইসেন, এবং তাঁহারা যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তজ্জন্য অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই সভায় আমাদের প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী বারিষ্টার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি মনোনীত হয়েন। দ্বিতীয়বারে কলিকাতার সমস্ত বাঙ্গালীর

পক্ষ হইয়া জগদ্বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অভ্যাগত প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করেন। এই দেশ-হিতকর কার্য্যে উৎসাহান্বিত হইয়া অতিবৃদ্ধ পলিতকেশ, জরাগ্রস্ত, হীনদৃষ্টি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ হিন্দু জমিদার, শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াও প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা ও আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন। সে দৃষ্টি কি মনোহর! এই সভায় বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ পার্শি, অনরেবল্ শ্রীযুক্ত দাদাভাই নাওরোজী, যিনি বিলাতে থাকিয়া পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্য হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তিনি সভাপতি পদে বরিত হয়েন। মান্দ্রাজের অধিবেশনে মান্দ্রাজের পক্ষ হইয়া সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতি বিশারদ, অনরেবল্ রাজা সার টি মাধব রাও, প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করেন। বোম্বাই হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ মুসলমান বারিষ্টার শ্রীযুক্ত বদরুদ্দিন তায়বজী মহাশয় এই সভার সভাপতি নিযুক্ত হয়েন। এবার এলাহাবাদে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হইয়া, অনরেবল্ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অযোধ্যানাথ মহাশয়, সমাগত প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করেন, এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে কলিকাতার প্রসিদ্ধ বণিক শ্রীযুক্ত জর্জ ইউল সাহেব সভাপতি নির্দ্ধারিত হয়েন। দেশের শিক্ষিত লোক, প্রধান প্রধান রাজনীতিজ্ঞ, রাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী, সকল শ্রেণীর লোক; হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান, পার্শী সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোক; বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, দ্রাবিড়ী, কর্ণাটী, শিখ, হিন্দুস্থানী—সকল জাতির লোক; ইহাতে আছেন। দেশের হিত সাধনই ইহাঁদের উদ্দেশ্য। ইহাঁদিগের চেষ্টায় দেশের কল্যাণ হয় ইহাই প্রার্থনীয়। জাতীয় মহাসমিতির প্রতিনিধিদিগের মধ্যে অনেকেরই এই দেশ হিতের জন্য কত কষ্ট, কত অত্যাচার ভোগ করিতে হইতেছে—কত স্বার্থ-ত্যাগ করিতে হইতেছে! ভাবিলে কত আশা হয়! যদি ইহাঁরা ধীর ভাবে অবিচলিত চিত্তে কার্য্য করিয়া যাইতে পারেন, তবে ইহাঁদিগের দ্বারা দেশের অনেক উপকার হইবে।

এলিজাবেথ ফ্রাই।

কারা-সংস্কার কার্য্যে মহাত্মা হাউয়ার্ডের নাম জগতে চিরঃস্মরণীয় থাকিবে। হাউয়ার্ড নিজের ধন, সম্পত্তি, জীবন সমস্তই হতভাগ্য কারাবাসীদিগের দুঃখ মোচনের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মানুষের দুঃখ মোচনে যাঁহারা অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, হাউয়ার্ড তাঁহাদিগের মধ্যে অতিশয় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। মহাত্মা হাউয়ার্ড ৬৪ বৎসর জীবিত ছিলেন, আজীবন তিনি জগতের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া গিয়াছেন।

আজ একশত বৎসর হইয়াছে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। হাউয়ার্ডের মৃত্যুর দশ এগারো বৎসর পূর্ব্বে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের নরউইচ্ নামক স্থানে একটী বালিকার জন্ম হয়। সেই বালিকার জীবন আজ তোমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিব! এলিজাবেথের যখন জন্ম হয়, তখন কে বুঝিয়াছিল যে, এই ক্ষুদ্র বালিকার দ্বারা এত মহৎ কাজ হইবে; এই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র হস্ত, শত সহস্র

নরনারীর দুঃখ মোচনের জন্য নিয়োজিত হইবে; এই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়, অসহায় হতভাগ্য কারাবাসিনীদিগের দুঃখে বিগলিত হইবে!

এলিজাবেথের পিতামাতা কোয়েকার সম্প্রদায় ভুক্ত, এবং অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার মাতা অতিশয় ধর্ম্মশীলা ছিলেন। এলিজাবেথ বাল্যকাল হইতেই মাতার অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন; সর্ব্বদা মাতার নিকট থাকিতেই ভাল বাসিতেন; মাতাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চাহিতেন না। বাল্য বয়সে এলিজাবেথের বিশেষ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় নাই; বরং বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণতাতে, তাঁহাকে তাঁহার অন্যান্য ভাই ভগ্নীদিগের অপেক্ষা একটু হীন বলিয়াই বোধ হইত। বাল্যকালে এলিজাবেথ বড় রুগ্ন ছিলেন। এবং যে কারণেই হউক লেখা পড়ায় এলিজাবেথ বাল্য বয়সে বিশেষ অমনোযোগী ছিলেন। কিন্তু কোন একটা বিষয় বুঝিবার শক্তি ও সাধারণ বিবেচনা শক্তি তাঁহার কম ছিল না। বাল্য বয়স হইতে তাঁহার তর্ক করিবার প্রবৃত্তি বড় অধিক দেখা যাইত; একটা কোন বিষয়ে কথা উপস্থিত হইলে, অন্য সকলে সে সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিতেন, এলিজাবেথ প্রায়ই তাহার বিরুদ্ধে বলিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া যে তিনি অহঙ্কৃত ও গর্ব্বিত ছিলেন, তাহা নয়। তাঁহার স্বভাব খুব নম্র ছিল, এবং আপনাকে সর্ব্বদাই অতি সামান্য বলিয়া মনে করিতেন।

দুঃখী অসহায়দিগের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার যে ঐকান্তিক অনুরাগ পরে দেখা গিয়াছিল, এবং যে কার্য্যে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, বাল্যবয়সেই এলিজাবেথের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার যে সকল স্বাভাবিক সদ্গুণ ছিল, তাহার সহিত তাঁহার ধর্ম্মভীরু মাতার যত্ন ও শিক্ষা মিলিত হইয়া, এলিজাবেথকে পরে একটী আদর্শ-রমণী করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু বাল্য বয়সেই এলিজাবেথ মাতার সদৃষ্টান্ত এবং সৎশিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইলেন। বারো বৎসর বয়সে এলিজাবেথের মাতার মৃত্যু হইল। কিন্তু তাঁহার মাতার সৎশিক্ষা বিফলে যায় নাই! মাতার সদৃষ্টান্ত, শিক্ষা, এবং নিজ হৃদয়ের সৎপ্রবৃত্তিগুলি, ক্রমে বিকশিত হইতে লাগিল; এবং দুখীর দুঃখ মোচনের জন্য

যে প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে ক্রমে জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহা এক নূতন পথে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইল। মহাত্মা হাউয়ার্ড হতভাগ্য কারাবাসীদিগের দুঃখ মোচনের জন্য জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। এলিজাবেথও সেই কার্য্যে নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। জন্ হউয়ার্ডের পর কারাবাসীদের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচনের জন্য, আর কেহই এমন করিয়া আজীবন চেষ্টা করেন নাই। স্ত্রীজাতীর মধ্যে সারা মার্টীন ভিন্ন, এলিজাবেথের পূর্ব্বে এ কার্য্যে কেহ হস্তক্ষেপই করেন নাই। সারা মার্টীনের জীবনের কথা ভবিষ্যতে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

এলিজাবেথ দেখিতে সুন্দর ছিলেন। ১৮।১৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার অন্যান্য ভগ্নীদিগের সহিত প্রচলিত আমোদ প্রমোদে যোগ দিতেন; নৃত্য করিতে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন। কিন্তু তিনি নিজ জীবনের যে দৈনিক বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে দেখা যায় যে, চারিদিকের সেই আমোদ প্রমোদে তাঁহার হৃদয় তৃপ্ত হইত না; যেন কি একটা অভাব সর্ব্বদাই অনুভব করিতেন। আমোদ প্রমোদে তিনি যোগ দিতেন বটে; কিন্তু তাহাতে যেন তাঁহার হৃদয় তৃপ্ত হইত না; বরং তাহাতেই অনেক সময় তাঁহাকে অনুতপ্ত দেখা যাইত।

এই সময় উইলিয়ম সেভারী নামক আমেরিকা হইতে একজন কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্ম প্রচারক ইংলণ্ডে আগমন করেন। ইহাঁর আগমনেই এলিজাবেথের জীবনের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। ধর্ম্মসম্বন্ধে এলিজাবেথ এ পর্য্যন্ত কিছু উদাসীন ছিলেন। কিন্তু তাঁহার দয়া ও পরোপকারের প্রবৃত্তি ক্রমে বিকশিত ও বর্দ্ধিত হইতেছিল। অবসর পাইলেই তিনি দরিদ্রদের দুঃখ মোচন ও রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু যে জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এতদিন পর্য্যন্তও রীতিমত তাহা আরম্ভ করেন নাই। সেভারীর একদিনের বক্তৃতায় এলিজাবেথের জীবনে ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। সেই দিন হইতে এলিজাবেথ আমোদ প্রমোদে যোগ দেওয়া পরিত্যাগ করিলেন; এবং সেই দিন যেন তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্য স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

এলিজাবেথের মনে যখন এই প্রকার পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে,—হৃদয়ে যখন জীবনের কর্ত্তব্যের কথা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে; তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে লণ্ডন নগরে লইয়া গিয়া, তথায় তাঁহার এক বন্ধুর নিকট রাখিয়া আসিলেন। লণ্ডনে আসিয়া এলিজাবেথের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল এবং সংসার সম্বন্ধে তাঁহার যে অভিজ্ঞতার অভাব ছিল, তাহাও আর রহিল না। লণ্ডনে আসিয়া এলিজাবেথ, লণ্ডনের অসংখ্য প্রকার আমোদ প্রমোদ, বিলাস বিভব দেখিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রবৃত্তিও ছিল না, তিনি তাহাতে তৃপ্তও হন নাই। বরং লণ্ডন নগরের এই সকল আমোদ, প্রমোদ, বিলাস, বিভব তাঁহার মনে এইগুলির প্রতি একটা বিরাগই জন্মাইয়া দিয়াছিল। তিনি বলিতেন সেই সকল আমোদ প্রমোদ ও বিলাসিতায় মানুষকে প্রকৃত সুখ দিতে পারে না; ইহার সুখ ক্ষণস্থায়ী এবং অনেক সময় ইহাতে মানুষের অবনতি হয়।

এলিজাবেথ ক্রমে ক্রমে সকল প্রকার বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ভাল কাপড়, ভাল পোষাক, আর পরিধান করিতেন না; কোন প্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন না। অবসর সময়ে অনাথ দরিদ্র, দীন দুঃখী বালক বালিকাদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দিতেন; এবং এজন্য

একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে ৭০।৮০টী ছাত্র ছিল; একাকী কি প্রকারে এতগুলি বালক বালিকাকে শিক্ষা দিতেন ও শাসনে রাখিতেন, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি এই সময়ে লিখিয়াছিলেন যে, লোকে যাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে; যাহাদিগকে দেখিবার কেহ নাই—যত্ন করিবার স্নেহ নাই, যাহারা অসহায় দীন দুঃখী, তাহাদিগের জন্যই আমার হৃদয় অধিক ব্যাকুল হয়; আমি তাহাদিগের জন্যই অধিক স্নেহ অনুভব করি। আমার এই আকাঙ্ক্ষা, যেন দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করিতে পারি। এলিজাবেথের এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল; জগতের লোক ঘৃণায় যাহাদিগের দিকে ফিরিয়াও চাহে না; এলিজাবেথ সেই অসহায় কারাবাসিনীদের দুঃখমোচনের উপায় করিয়া, জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

এলিজাবেথের যখন কুড়ি বৎসর বয়স তখন লণ্ডনের যোসেফ ফ্রাইর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়; বিবাহের পর তিনি তাঁহার একান্ত যত্নের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট বিদায় লইয়া স্বামীর সহিত লণ্ডনে গমন করিলেন। এই খানে তাঁহার কয়েকটী সন্তান জন্মে। লণ্ডনে আসিয়া এলিজাবেথ ফ্রাই তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্যের কথা বিস্মৃত হন নাই। লণ্ডনে আসিয়া তথাকার দরিদ্র পল্লিতে ভ্রমণ করিতেন। যাহারা অসহায় ও দরিদ্র তাহাদিগকে সাহায্য করা, এবং যাহারা রোগগ্রস্থ তাহাদিগকে সেবা শুশ্রূষা করা, তাঁহার প্রতিদিনের একটী প্রধান কার্য্য ছিল। অনেকে এই সকল দরিদ্রদিগের বাসস্থানের নিকট দিয়া যাইতেও ঘৃণা বোধ করেন, কিন্তু তিনি এই সকল দরিদ্র, অনাথ, অসহায় লোকদিগের গৃহে গৃহে গমন করিয়া ইহাদিগের সেবা শুশ্রূষা ও সাহায্য করিতেন! দেশে যাহাতে উত্তম প্রণালীতে শিক্ষা প্রচলিত হয়, সে বিষয় তিনি এই সময় অনেক চেষ্টা করেন। এবং কোয়েকার সম্প্রদায়ের যে সমস্ত বিদ্যালয় আছে তাহা পরিদর্শন করিয়া, তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। এই সময় তাঁহার দুই ভগ্নীর বিবাহ হয়, এবং তাঁহার শ্বশুরের মৃত্যু হওয়াতে লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত প্লাসেট্ নামক স্থানে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।

ক্রমশঃ।

স্বার্থত্যাগ।

আমরা কংগ্রেসের কথা লিখিয়াছি। এই কংগ্রেসের কার্য্যে যোগ দিবার জন্য কতজনের কত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছে, কত স্বার্থত্যাগ করিতে হইয়াছে! আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল ঘোষ বাঙ্গালা দেশের কোন জেলার এক জন গভর্ণমেণ্ট উকীল। ইনি কংগ্রেসের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া, জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, তিনি কংগ্রেসে যাইতেছেন শুনিয়া কমিসনার সাহেব তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন; এবং এবিষয়ে পুনরায় বিবেচনা করিবার জন্য তাঁহাকে বলিলেন। পরদিন রামগোপাল বাবু মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এক পত্রে লিখিলেন যে, তিনি কংগ্রেসে যাইবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, এবং তাঁহার গভর্ণ-

মেণ্ট উকীলের পদ পরিত্যাগ করিতেছেন। ইহাতেই শেষ হয় নাই ; যাত্রা করিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র পুত্রের ওলাউঠা হইল, রামগোপাল বাবুর স্ত্রী নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। স্বামীকে কোন মতেই যাইতে দিতে চাহিলেন না ; অথচ তখন আর সময়ও নাই। রামগোপাল বাবু তখন পুত্রের ভার তাঁহার এক বন্ধু ডাক্তারের হস্তে এবং ঈশ্বরের কৃপার উপর রাখিয়া যাত্রা করিলেন। রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়াছেন, তখন আর এক বাধা। কোন জমিদারের একজন কর্ম্মচারী তাঁহাকে একটী মোকদ্দমা দিবার জন্য উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে বলিল যে, এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রত্যহ তাঁহাকে এজন্য ৩০০৲ শত টাকা দিতে প্রস্তুত আছে। রামগোপাল বাবু তাহাও গ্রাহ্য করিলেন না। পুত্রের জীবনের দিকে যিনি চাহেন নাই, সামান্য অর্থলোভ কেমন করিয়া তাঁহাকে বাধা দিবে ? সৎকার্য্যে এই প্রকার স্বার্থত্যাগ সকলেরই অনুকরণ যোগ্য।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

গত ডিসেম্বরের সংখ্যায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধিস্তম্ভের যে চিত্র দিবার কথা ছিল, তাহা এই সংখ্যায় দেওয়া গেল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, এই চিত্র দিতে আমাদের যার পর নাই লজ্জা বোধ হইতেছে। যে যে ব্যক্তিগণের চিত্র ইহাতে আছে তাহা ঠিক তাঁহাদের চেহারার মত হয় নাই। যে সকল লোককে আমরা শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি, যাঁহাদের আমরা দেখিয়াছি ও সর্ব্বদা দেখিতেছি তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি যদি চিত্রকর এরূপ বিকৃত করিয়া দেয় তবে ক্ষোভ ও লজ্জার আর সীমা থাকে না। ওরূপ বিকৃত প্রতিমূর্ত্তি যাহাতে প্রকাশিত না হয় ইহাই আমাদের ইচ্ছা। সমাধিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে আমরা যে ফটোগ্রাফ তুলিয়া দিয়াছিলাম, লিথোগ্রাফার চিত্রখানি তদনুরূপ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ স্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বে যে সকল ব্যক্তিগণ সেই সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের চিত্র না দিতে পারায়, চিত্রখানি অঙ্গহীন হইয়া গিয়াছে।

এখানকার কোন শ্রেষ্ঠ লিথোগ্রাফ প্রকাশকের নিকট হইতে তাহারা যত দাম চাহিয়াছে এবং যত সময় (দুই মাস) চাহিয়াছে তাহাই দিয়া আমরা এই ছবি করাইয়াছি। ছবি দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলাম বলিয়াই কেবল ছবি দিতেছি ; নতুবা এরূপ ছবি দিবার একেবারেই আমাদের ইচ্ছা ছিল না। যাহারা ভাল কারিকর বলিয়া আস্পর্দ্ধা করে তাহারাই যে চিত্রকার্য্যে এরূপ অনভিজ্ঞ,—ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

গত সংখ্যার "মধুসূদন দত্ত" প্রবন্ধে আমাদের অসাবধানতা বশতঃ কয়েকটী মুদ্রাকরের প্রমাদ সংশোধিত হয় নাই। আমাদের একজন হিতৈষী কোন স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় তাহা দর্শাইয়া দিয়াছেন। আমরা তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

১৮৪ পৃঃ ১ম স্তম্ভ, নিম্ন হইতে ৮ম পংক্তি, ১৮২৮ স্থানে ১৮২৩ হইবে।

১৮৭ পৃঃ ২য় স্তম্ভ, নিম্ন হইতে ৫ম পংক্তি, ২৩শে জুন স্থানে ২৯শে জুন হইবে।

ধাঁধা।

(১)

তিনাক্ষরে নাম মোর জগতে বিদিত,
সুগায়ক বলি সর্ব্ব দেশে পরিচিত।
প্রথম অক্ষর ত্যাগে সবে করে ভয়,
মধ্যম ছাড়িয়া দিলে শিশুর আশ্রয়।
শেষাক্ষর ত্যাগে করি ত্রিপুরায় বাস,
পাহাড়ে পাহাড়ে থাকি জন্মাই সন্ত্রাস।

সখা
সপ্তম ভাগ। দ্বিতীয় সংখ্যা।
ফেব্রুয়ারী। ১৮৮৯।

বিবিধ।

আমাদের দয়ালু ছোটলাট,স্যার ষ্টুয়ার্ট বেলি, গত বৎসর যখন ময়মনসিং জেলা পরিদর্শন করিতে যান, তখন একদিন একখানি নৌকা হঠাৎ তাঁহার ষ্টীমারের নীচে পড়িয়া যায়। ষ্টীমারের মধ্যে একটী ব্রাহ্মণ ও তাঁহার অল্পবয়স্ক এক পুত্র ছিল। নৌকা খানি জাহাজের নীচে পড়িবামাত্র জলমগ্ন হইয়া গেল, এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল। বালকটী ষ্টীমারের চাকার তলে পড়াতে, তাহার হস্ত পদ ভগ্ন হইয়া গেল। আমাদের ছোটলাট তৎক্ষণাৎ ষ্টীমার থামাইয়া বালকটীকে ষ্টীমারের নীচে হইতে তুলিতে আদেশ করিলেন। বালকটীর দুর্দ্দশা দেখিয়া দয়ালু ছোটলাট নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। নিজের ডাক্তার দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন ; এবং নিকটস্থ এক হাঁসপাতালে তাহাকে রাখিয়া গেলেন। বালকটী অধিক দিন জীবিত ছিল না, অল্পদিন পরেই তাহার মৃত্যু হইল। ছোটলাট সেই বালকের অনাথা মাতার ভরণ পোষণের জন্য নিজে একটী বাৎসরিক বৃত্তি দিতেছেন।

* *
*

গত ২৯শে জানুয়ারি কলিকাতার ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীটের নিকট ধুবুড়িয়া বাগানে ভয়ানক আগুন লাগিয়াছিল। একগল্লি খোলার ঘর পুড়িয়া গিয়া অনেক গরীব লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ডে একটী বালক নিজ জীবনের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া যেরূপ আশ্চর্য্য দয়া ও সাহসের কার্য্য করিয়াছে তাহা আমাদের সকলেরই অনুকরণ করিতে চেষ্টা করা উচিত। যে খোলার ঘরগুলি আগুনে হু হু করিয়া জ্বলিতেছিল তাহারই একখানি ঘরে একটী শিশু নিদ্রিত ছিল ; শিশুর মাতা ঘরে আগুন লাগিয়াছে দেখিয়া খুব চেঁচাইতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে চারিদিকে আগুন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ; ঘরে ঢুকিবার একটী মাত্র দ্বার, তাহাও আগুনে জ্বলিতে লাগিল। মাতা ভয়ে বিহ্বল ও সন্তানের জীবনে নিরাশ হইয়া, শোকে কেবল কাঁদিতেই লাগিল, শিশুর উদ্ধারের কোন চেষ্টাই করিতে পারিল না। অনেক লোক সেই খানে দাঁড়াইয়াছিল, কেহ মজাই দেখিতেছিল, কেহ বা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; কেননা নিজ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া শিশুটীকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে

অগ্রসর হওয়া সামান্য সাহসের কথা নহে। নিকটে জলও ছিল না; আর আগুনও তখন আর নিভাইবার যো নাই। এই সময়ে সেই মাতার ক্রন্দন "বয়েজ স্কুল" এর জোসেফ স্পেক্টর নামক একটী রুষবালকের কর্ণে প্রবেশ করিল। সে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বিপদের কথা অবগত হইল এবং মুহূর্ত্তে সেই জ্বলন্ত গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে দেখিয়াও ভয়ে পিছাইল না, সেই জ্বলন্ত দ্বার দিয়াই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সম্মুখে একটী পাত্রে খানিকটা জল দেখিতে পাইয়া তাহাতে নিজের গায়ের কোট ভিজাইয়া লইল। তারপরে সেই ধূমপূর্ণ ঘরে অতি কষ্টে শিশুকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইল। কিন্তু তখন আর বাহির হইবার পথ পায় না! বালক বুঝিল তাহারও মৃত্যু নিকটে। তথাপি হতাশ না হইয়া সেই গৃহের মৃত্তিকা প্রাচীরে সজোরে পদাঘাত করিতে লাগিল। সৌভাগ্য ক্রমে প্রাচীর সহজেই ভাঙ্গিয়া গেল। বালক তখন শিশুটীকে সেই অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার করিয়া মাতার ক্রোড়ে আনিয়া দিল। এই বালকের যত্নে এই দরিদ্র পরিবারের অনেক দ্রব্যাদিও রক্ষা পাই-য়াছে। ইন্স্পেক্টর মেরিমান, আমাদের কোন কোন বন্ধু ও অন্যান্য ভদ্রলোক এই ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের কোন ছাত্রা-বাসের ছাত্রেরা একদিন সন্ধ্যার সময়ে স্পেক্টারকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন এবং তাহাকে এই পরোপকার ও সৎ সাহসের জন্য সাধুবাদ করিয়া কতকগুলি পুস্তক উপহার দিয়াছেন।

* * *

মান্দ্রাজের লাটসাহেব একদিন মান্দ্রাজের কোন হাঁসপাতাল দেখিতে যান। সেখানে গিয়া দেখিলেন একটী ছোট বালিকা উৎকট রোগে শয্যাগত হইয়া রহিয়াছে। তাহার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া জানিতে পারিলেন তাহার পিতা জেলে আছে। পিতাকে দেখিবার জন্য বালিকার একান্ত ব্যগ্রতা দেখিয়া, তিনি সেই বালিকার সহিত তাহার পিতার সাক্ষাৎ করাইয়া দিবার জন্য, তক্ষণাৎ জেল রক্ষককে আজ্ঞা প্রদান করিয়া পাঠাইলেন।

* * *

ডাক্তার ফালবার্গ নামক একজন জর্ম্মন বৈজ্ঞা-নিক আল্‌কাত্‌রা হইতে চিনি তৈয়ার করিতেছেন। আমরা যে চিনি ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা অপেক্ষা এই চিনি এক শত গুণ মিষ্ট; অর্থাৎ আমাদের ১০০ ছটাক চিনিতে যত কলসি জল মিষ্ট করা যায়, এই আল্‌কাত্‌রার চিনিতে, এক ছটাকে তত কলসি জল ঠিক ততটা মিষ্ট করা যায়। এই চিনি ঔষধ রূপেও ব্যবহৃত হইতেছে।

বিড়াল।

আগে ঠাকুরমার কাছে বিড়া-লের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিলাম; দুঃখের বিষয় তাহার সবগুলি এখন মনে হইতেছে না। আজ যদি সেই বৃদ্ধা বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে তাঁহার কাছে আসিয়া বিড়াল সম্বন্ধে তোমাদের কত বৃহৎ কুসংস্কার দূর করিতে পারিতে। অতি শৈশবকালে, যখন প্রথম জানিতে পারিলাম যে, আমার একজন ঠাকুরমা আছেন, তখন হইতেই জানিয়াছিলাম যে, তাঁহার একটী বিড়ালীও আছে। ঠাকুরমা বলিলেই আমার মনে হয়, এক বুড়ী দরজার ধারে কুশাসন বিছাইয়া নামাবলী মাথায় দিয়া জপ করিতেছেন, আর এক বিড়ালী তাঁহার অঞ্চলে গা ঢাকিয়া হাত পা গুটাইয়া চক্ষু মুদিয়া ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছে।

ঠাকুরমা বিড়ালীকে আদর করিতেন, কিন্তু হুলো বেড়াল দুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। বিড়ালীর ছানাগুলি যখন বড় হইত তখনই হুলো গুলিকে ধরিয়া থ'লের ভিতরে পূরিয়া গ্রামান্তরে নির্ব্বাসিত করা হইত।

কি করিয়া বাঘের মাসী বোন্‌পোয়ের সঙ্গে বিবাদ করিয়া, মানুষের বাড়ীতে আসিয়া বিড়াল রূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিল; তদবধি কি প্রকারে বাঘ তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য ক্রমাগত খুঁজিয়া বেড়াইতেছে; এবং সেই ভয়ে বিড়াল কি প্রকারে নিজ অস্তিত্বের চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ করিবার জন্য গর্ত্ত খুঁড়িয়া মলত্যাগ করিয়া তাহা আবার যত্ন পূর্ব্বক মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদন করে; ইত্যাদি সকল কথাই ঠাকুরমা আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই সকল বিষয়ে মাথা ঘূরাইয়া অদ্যাপিও কোন মীমাংসায় আসিতে পারেন নাই। তাঁহারা যদি আমার ঠাকুরমার নাতি হইতেন, তাহাহইলে শৈশব কালেই এসকল প্রশ্নের অতি সন্তোষজনক উত্তর পাইতেন।

বিড়াল মানুষের ঘরের জন্তু, মানুষ তাহার নিকটে অনেক উপকারও পাইয়া থাকে; কিন্তু তথাপি বেচারীকে—কেন জানি না, কেহই দেখিতে পারে না। কুকুর এ বিষয়ে ভাগ্যবান্। ঠাকুরমা বলিতেন—"কুকুরটী ইচ্ছা করে, বাড়ীর কর্ত্তার ছেলে হউক, তবেই তাহার খাবার সময় সে পেট ভরিয়া ভাল ভাল জিনিস খাইতে পাইবে। আর বেড়াল ইচ্ছা করেন গিন্নির চোখ্ কাণা হউক, তবেই সে অলক্ষিতে মাছ ভাজা মুখে লইয়া চম্পট দিতে পারিবে।"

এদেশে যেমন, অন্যান্য দেশেও তেমনি কতকটা দেখা যায়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের অজ্ঞ লোকেরা বিড়ালকে ভূত পেত্নীর চর বলিয়া মনে করিত। পূর্ব্বে সেখানকার লোকদের এবিষয়ে অনেক কুসংস্কার ছিল। যাদুকর স্ত্রীলোকদের প্রত্যেকের এক একটী করিয়া বিড়াল থাকিত। এরূপ গল্প আছে যে, একবার এই শ্রেণীর কতগুলি স্ত্রীলোক একটা বিড়ালের নামকরণ করিয়া* রাত্রিযোগে

* এই সকল লোকের বিড়ালের এক একটা নাম থাকিত। বিড়ালের নাম রাখিবার সময় অনেক প্রকারের মন্ত্রপাঠ এবং ক্রিয়া কাণ্ড করা হইত। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল যে, এইরূপ নামকরণ হইলে সে বিড়াল অসাধারণ ক্ষমতাশালী হইয়া দাঁড়ায়। তখন তাহার সাহায্যে যাদুকর নানারূপ আশ্চর্য্য ও অলৌকিক কার্য্য করিতে পারে।

তাহাকে লীথ্ নগরের সাম্নে রাখিয়া আসিল। এরপর সেই নগরে এমন এক ঝড় হইল যে, তেমন ঝড় সেখানকার কেহ কখনও দেখে নাই। সাধারণ লোকের এই প্রকার কুসংস্কার থাকাতে অনেক সময় অনেক ভয়ানক ভয়ানক ঘটনা হইত। কোন স্থানে হয়ত ক্রমাগত কতগুলি দুর্ঘটনা হইল; হয়ত মহামারী উপস্থিত হইয়া অনেকগুলি গরু বাছুর মরিয়া গেল; অমনি সকলে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিল যে নিশ্চয়ই কেহ যাদু করিয়াছে। গ্রামের এক কোণে এক গরীব বুড়ী বাস করে, সংসারে তাহার কেহ নাই। হয়ত তাহার মনটা একটু হিংসুকে; হয়ত গ্রামের একজন একদিন তাহাকে আপন মনে বকিতে দেখিয়াছে; আর একজন হয়ত বুড়ীকে একদিন লাঠি হাতে করিয়া কাক তাড়াইতে দেখিয়াছে। গ্রামের লোকের বুড়ীর উপর ভারি সন্দেহ হইতে লাগিল। এরপর যদি বুড়ীর একটা কাল বিড়াল থাকে, তবেই সর্ব্বনাশ! বুড়ী নিশ্চয়ই ডাইনী! এমন সময় গ্রামের একজন চাষার মনে হইল যে, একদিন তাহার গরু বুড়ীর শসা গাছ খাইয়া ফেলিয়াছিল, সেই জন্য গরুকে বুড়ী "তোর মুনিব উচ্ছন্ন যাউক" বলিয়া গালি দিয়াছিল, তারপর হইতে সেই চাষার ক্ষেতে ইন্দুর আসিয়াছে। আর রক্ষা নাই—বুড়ি ডাইনী; বুড়ীর বিচার হইবে।

বিচারটা আবার কিরূপ জান? বুড়ীর হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে পুকুরে ফেলিয়া দেওয়া হইবে; ইহাতে যদি সে ডুবিয়া মরে, তবে সে নির্দ্দোষী, আর যদি তাহা না হয়, তবে সে দোষী, তাহাকে পোড়াইয়া ফেলা হইবে।

যাউক, আমরা বিড়ালের কথা ভুলিয়া যাইতেছি। আমি বলিতেছিলাম, বিড়ালকে কেহই দেখিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া বিড়ালের কোন সদ্গুণ নাই, এমন কথা বলা উচিত নয়। প্রথমে দেখ, বিড়ালের যদি কোন গুণই না থাকিবে তবে এত লোকে বিড়াল পোষে কেন? চেহারার জন্য?—ঠিক্ তাহা নহে। ইন্দুর মারে বলিয়া? তাহাই বা কেমন করিয়া বলি। অনেক বড় লোক এক একটা বিড়ালকে যারপর নাই ভাল বাসিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার জন্‌সনের 'হজ্' নামে একটা বিড়াল ছিল। 'হজ্' জন্‌সনের বাড়ীতে থাকিয়া ক্রমে বৃদ্ধ হইল, তাহার শেষকাল আসিল। এই সময়ে জন্‌সন্ হজের যে প্রকার শুশ্রূষা করিতেন, অনেক বাপ—ছেলের জন্য তেমন করে না। জন্‌সন্ স্বয়ং বাজারে গিয়া হজের আহারের জন্য ঝিনুক কিনিয়া আনিতেন।

ইটালীর একজন খুব বিখ্যাত পাদ্রীর তিনটা এঙ্গোরা বিড়াল ছিল। খানার সময় টেবিলের পাশে পাদ্রী সাহেবের জন্য যেমন চেয়ার দেওয়া হইত, তেমনি বিড়ালগুলির জন্যও চেয়ার থাকিত। হাজার বড় লোক পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে খানা খাইতে আসুন না কেন, তাঁহাকেও সেই বিড়ালগুলির সঙ্গে এক টেবিলে বসিয়া খানা খাইতে হইত।

বিলাতের আর একজন বড় লোকের কথা শুনিয়াছি। তিনি অবিবাহিত ছিলেন, একটী বিড়ালী বই তাঁহার আর সঙ্গী ছিল না। এই বিড়ালীও সাহেবের সঙ্গে এক টেবিলে বসিয়া খানা খাইত। এমন কি, একটা খাবার জিনিস আসিলে তাহার এক টুক্রা আগে বিড়ালীর পাতে দেওয়া হইত, তার পর সাহেব অবশিষ্টটুকু আহার করিতেন। এই সাহেবের একজন বন্ধু একবার তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইলেন। খানার সময় সাহেব মাংসের টুক্রা কাটিয়া প্রথমে বন্ধুর পাতে

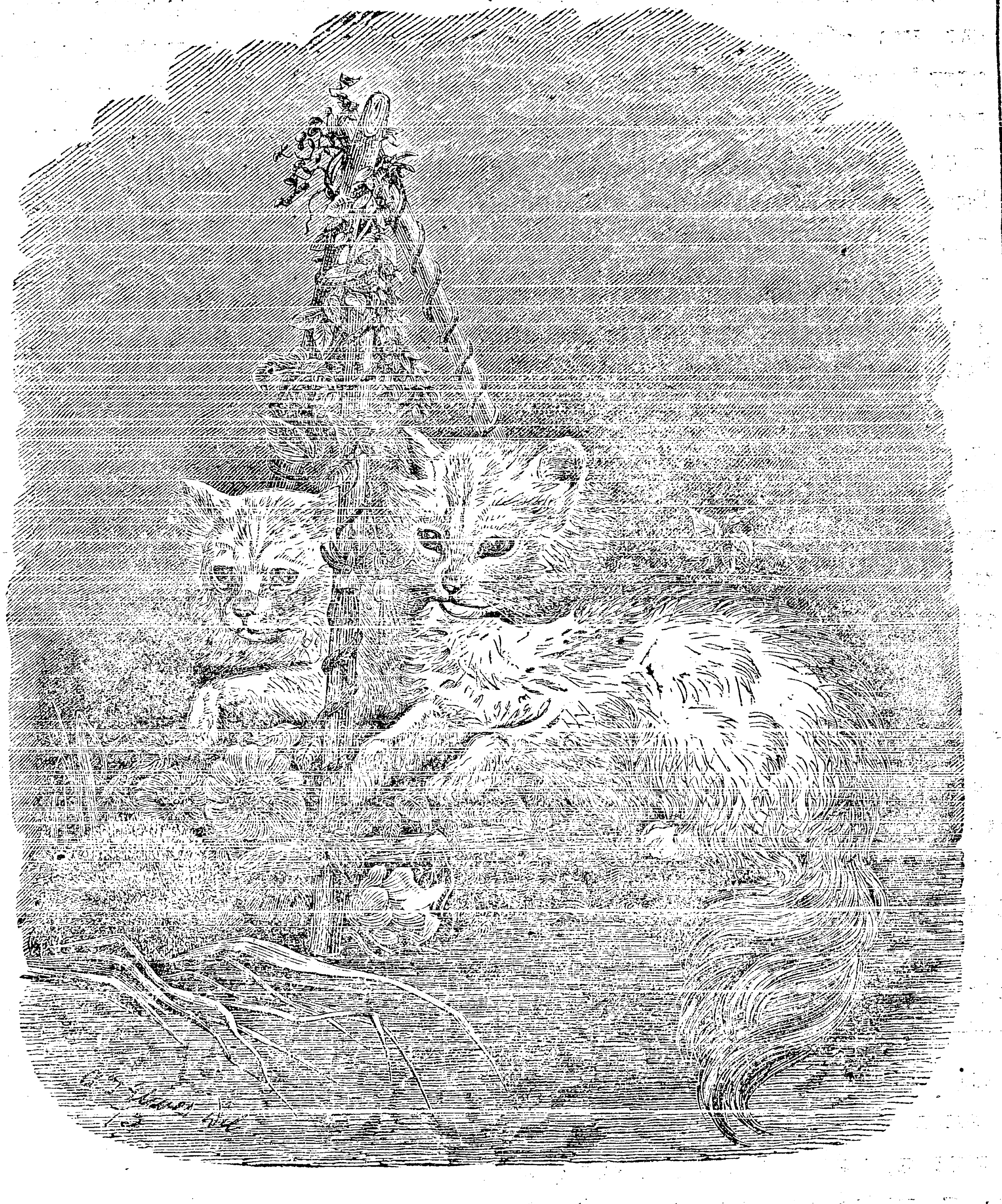

দিলেন। এই সম্মানটুকু এতদিন বিড়ালীর ছিল। আজ তাহার অন্যথা হওয়াতে সে এতদূর অপমানিত বোধ করিল যে, এক লাফে টেবিলের উপরে উঠিয়া সাহেবের নাক মুখ আঁচড়াইয়া দিল। এই আঁচড়ের দাগ সাহেব এ জীবনে আর দূর করিতে পারিলেন না।

তোমাদের অনেকেই বিখ্যাত হুইটিংটন্ সাহেবের কথা পড়িয়াছ। হুইটিংটন বাল্যকালেই পথের ভিখারী হইয়াছিলেন। হুইটিংটনের অনেক সদ্‌গুণ ছিল, এবং একটী অতি প্রিয় বিড়ালও ছিল। এই সকল সদ্‌গুণের জোরে এবং বিড়ালের বিশেষ সাহায্যে (এরূপ গল্প আছে) হুইটিংটন্ শেষে বড় লোক হইয়াছিলেন, হুইটিংটন্ এবং তাঁহার বিড়ালের গল্প অতিশয় আমোদজনক; এবং যদিও ইহার সমুদয় অংশ সত্য নহে, তথাপি ইহার ভিতরে সুন্দর উপদেশ আছে।

এই সকল গল্প পড়িয়া তোমরা ইহাই বুঝিবে যে, অনেক বড় লোক বিড়ালকে ভাল বাসিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বিড়ালের যে বিশেষ কোন সদ্‌গুণ আছে, এ সকল হইতে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু এরূপ প্রমাণেরও কোন অভাব নাই। নিম্নে এ সম্বন্ধে দুই তিনটী গল্প বলিয়া শেষ করিতেছি।

১. কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটা বিড়ালী ছিল। বিড়ালীকে সকলেই বিশেষ ভালবাসিত। একদিন রাত্রিতে বৈঠকখানার ঘরে ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া সকলেরই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাড়ীতে চোর ঢুকিয়াছে মনে করিয়া সকলেই সশস্ত্র হইয়া বৈঠকখানার দিকে ছুটিলেন। দেখা গেল যে, বৈঠকখানার দরজা যেরূপ ভাবে বাহিরের দিক হইতে অর্গল দিয়া রাখা হইয়াছিল ঠিক তেমনি আছে, কিন্তু ভিতর হইতে ঘণ্টার শব্দ আসিতেছে। দরজা খুলিয়া দেখা গেল যে, বিড়ালী চাকরদের ডাকিবার ঘণ্টার কাছে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত তাহা নাড়িতেছে। ঘণ্টাটী এমন স্থানে ছিল যে, তাহাকে বাজাইতে হইলে একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। সন্ধ্যার সময় বিড়ালী ঐ ঘরে অজ্ঞাতসারে আট্‌কা পড়িয়াছিল। বাহির হইবার উপারান্তর না দেখিয়া অগত্যা সে এই কষ্ট টুকু স্বীকার করিয়াছে। অন্যান্য দিন ঐ ঘণ্টা বাজিলেই ঘরে লোক আসে, তাহা সে দেখিয়াছে। সুতরাং সে চেয়ারের উপরে উঠিয়া, পেছনের দুই পায়ে দাঁড়াইয়া, এক হাতে ঘণ্টা বাজাইতে আরম্ভ করিল। ইহার ফল কি হইল, প্রথমেই শুনিয়াছ। বিড়ালী যে কেবল ঐ দিন এরূপ করিয়াছিল, তাহা নহে। যখনই ঐ ঘরে সে আট্‌কা পড়িত, তখনই ঐ উপায় অবলম্বন করিয়া বাহিরে আসিত।

একবার এক বৃদ্ধা উইল করিয়া তাহার সমস্ত বিষয় তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে দিল। ইহার কিছুদিন পরেই বৃদ্ধার মৃত্যু হইল। ভ্রাতুষ্পুত্র উকীল, বৃদ্ধার অন্তোষ্টির পরেই সে তাহার ঘরে আসিয়া তাহার উইল পড়িতে লাগিল। বৃদ্ধার একটী প্রিয় বিড়াল ছিল। এই বিড়াল বৃদ্ধাকে এত ভালবাসিত যে, একবারও তাহার কাছ ছাড়া হইত না। এমন কি, মৃত্যুর পরেও সেই মৃত শরীরের কাছে বসিয়া রহিল। বৃদ্ধার ভাইপো যখন বৃদ্ধার ঘরে বসিয়া উইল পড়িতেছিল, সেই সময়ে বিড়ালটী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতের ন্যায় সেই ঘরের দরজার বাহিরে ছুটাছুটি করিতেছিল। কিছুকাল পরে যেই দরজা খোলা হইল, অমনি বিড়াল ছুটিয়া আসিয়া উকীল ভাইপোর গলা কামড়াইয়া ধরিল—অনেক কষ্টে তাহাকে ছাড়ান গেল। এই ঘটনার আঠার মাস পরে ভাইপোর মৃত্যু হইল। মৃত্যু শয্যায় সে স্বীকার করিল যে, বৃদ্ধার টাকাগুলি শীঘ্র শীঘ্র পাইবার জন্য সে তাহাকে খুন করিয়াছিল।

৩. এক পরিবারে একটী অতি সুন্দর বিড়াল পালিত হইয়াছিল। সেই পরিবারের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সন্তানটীকে সে বড় ভালবাসিত। সেই ছেলেটীর

সঙ্গে সে খেলা করিত, এবং তাহার সকল প্রকার অত্যাচার সে অতিশয় ভাল মানুষের ন্যায় সহ্য করিত। এইরূপে অনেকদিন চলিয়া গেল। অবশেষে ছেলেটীর বসন্ত রোগ হইল। প্রথম কয়েকদিন বিড়ালটী কিছুতেই তাহার বিছানার পাশ ছাড়িয়া যাইতে চাহিল না। ব্যারাম যখন বাড়িয়া চলিল, তখন বিড়ালটীকে স্থানান্তরিত করিয়া এক ঘরে তালা দিয়া রাখিতে হইল। ছেলেটী মারা গেল। বিড়ালকে ছাড়িয়া দিবামাত্র সে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া তাহার খেলার সঙ্গীকে দেখিতে আসিল—কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই তাহার মৃত শরীর সে ঘর হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। তাহার পর সে বাড়ীময় ছুটাছুটি করিয়া অবশেষে যে ঘরে মৃতদেহ রাখা হইয়াছিল সেই ঘরে আসিল। এই স্থানে সে শোকে অধীর হইয়া শুইয়া রহিল। তাহাকে আবার তালা দিয়া রাখিবার দরকার হইল। ছেলেটীকে গোর দেওয়ার পরে বিড়ালটীকে দেখা গেল না। পোনের দিন পরে নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ হইয়া সেই বালকটী যে ঘরে মারা গিয়াছিল, সেই ঘরে বিড়াল ফিরিয়া আসিল। এরূপ অবস্থায়ও তাহাকে কিছু খাওয়ান গেল না। তাহার সঙ্গীকে না দেখিয়া সে করুণস্বরে চীৎকার করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। অবশেষে যখন ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হইল, তখন খাইবার সময় কোন প্রকারে ঘরে আসিত, কিছু আহার করিয়াই আবার চলিয়া যাইত। অন্য সময় সে কোথায় থাকিত কেহই জানিত না। অবশেষে একদিন তাহার পশ্চাৎ যাইয়া দেখা গেল যে, সে সেই বালকটীর গোরের পাশে পড়িয়া থাকে। এই পরিবারটী ঐ স্থানে পাঁচ বৎসর কাল ছিলেন। এই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সেই বিড়ালটীকে সেই বালকের গোরের পাশে দিনরাত পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতে ঐ বিড়ালটীর উপরে সকলেরই অতিশয় ভালবাসা জন্মিয়া গিয়াছিল; এমন কি, তাহাকে এক প্রকার ভক্তির ভাবে দেখা হইত।

সীতাকুণ্ড।

সখার অনেক পাঠক সীতাকুণ্ডের নাম শুনিয়া থাকিবে। মুঙ্গের ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে যাঁহাদের বাস, তাঁহারা নিশ্চয়ই উহার বিষয় কিছু না কিছু অবগত আছেন। অন্যান্য পাঠক পাঠিকাদিগের জন্য সীতাকুণ্ড ও ভারতের অন্যান্য কতিপয় প্রস্রবণ সম্বন্ধে এখানে লিখিত হইতেছে।

প্রস্রবণকে সাধারণ কথায় ঝরণা বলা যায়। ভূ-গর্ভ হইতে ভূ-পৃষ্ঠে জল উঠিতেছে। এইরূপ জল উত্থিত হইলে, উহাকে ঝরণা বলে। স্থানে স্থানে ঐরূপ প্রস্রবণ আছে, লোকে প্রত্যেক প্রস্রবণেরই এক নাম দিয়া থাকে। সীতাকুণ্ড একটী প্রস্রবণের নাম মাত্র।

কি কারণে মৃত্তিকার নিম্ন হইতে উপরে জল উঠিতেছে, ঐ জলই বা কোথা হইতে আসিতেছে এবং উঠিয়া কোথায় যাইতেছে, তদ্বিষয় মোটামুটি এখানে বলা যাইতেছে। কেন না, প্রস্রবণের অবস্থা বুঝিতে হইলে তাহার কারণ জানা আবশ্যক।

দেখ, তোমার গ্রামের পার্শ্ব দিয়া যে নদী প্রবাহিত হইতেছে, উহা ত অবিশ্রান্ত জল বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। কি দিবা কি রাত্র, কি শীতকাল, কি গ্রীষ্মকাল, উহার জল বহনের বিরাম নাই। এত জল কোথায় পাইতেছে? যদি বল বৃষ্টি, বৃষ্টি ত সদা সর্ব্বদা হয় না; অথচ পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মহানদী, তোমার গ্রামের পার্শ্বের নদী, প্রভৃতি সমস্ত নদী অবিশ্রান্ত জল বহিয়া সমুদ্রে ঢালিতেছে। বর্ষাকালে বৃষ্টির সময় ঐসকল নদীর কলেবর বর্দ্ধিত হয় মাত্র, কিন্তু কি শীতকাল আর কি গ্রীষ্মকাল, সকল সময়ই অল্পাধিক পরিমাণে জলরাশি সমুদ্রে গিয়া পতিত হইতেছে। এত জল উহারা কোথা হইতে পাইতেছে?

বৃষ্টির জল ভূমিতে পতিত হয়। উহার কিয়দংশ মাত্র গড়াইয়া গড়াইয়া খাল, নালা, নদ, নদী দ্বারা সমুদ্রে চলিয়া যায়, কিয়দংশ বৃক্ষাদি উদ্ভিদ ও মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গ দ্বারা ব্যবহৃত হয়, কিয়দংশ বাষ্প হইয়া পুনর্ব্বার বায়ুতে মিশ্রিত হয় এবং অবশিষ্ট ভাগ ভূমির নীচে চলিয়া যায়। বালুকাময় স্থানে জল ঢাল, বালুকার নীচে চলিয়া যাইবে। বৃষ্টির জল মাটির নীচে যায় বলিয়াই পুষ্করিণী কিম্বা কূপ খনন করিলে, তাহাতে জল পাওয়া যায়। কোন মৃত্তিকার উপরিভাগ শুষ্ক দেখাইলেও তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে মৃত্তিকা ভিজা দেখা যায়।

কোন ভূ-পৃষ্ঠ কঠিন শিলাময় হইলে, বৃষ্টিজল হয়ত উহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। সেইরূপ আটাল বা এঁটেল মাটীর উপরও বৃষ্টি পড়িলে, তাহার ভিতর দিয়া জল যাইতে পারে না। যে সকল মৃত্তিকাস্তরের ভিতর দিয়া জল যাইতে পারে না, তাহাদিগকে জলের 'দুষ্প্রবেশ্য স্তর' বলে। আর বালুকা, বালুকাময় প্রস্তরাদি, যাহাদের ভিতর দিয়া জল যাইতে পারে, তাহাদিগকে জলের 'প্রবেশ্য স্তর' বলে।

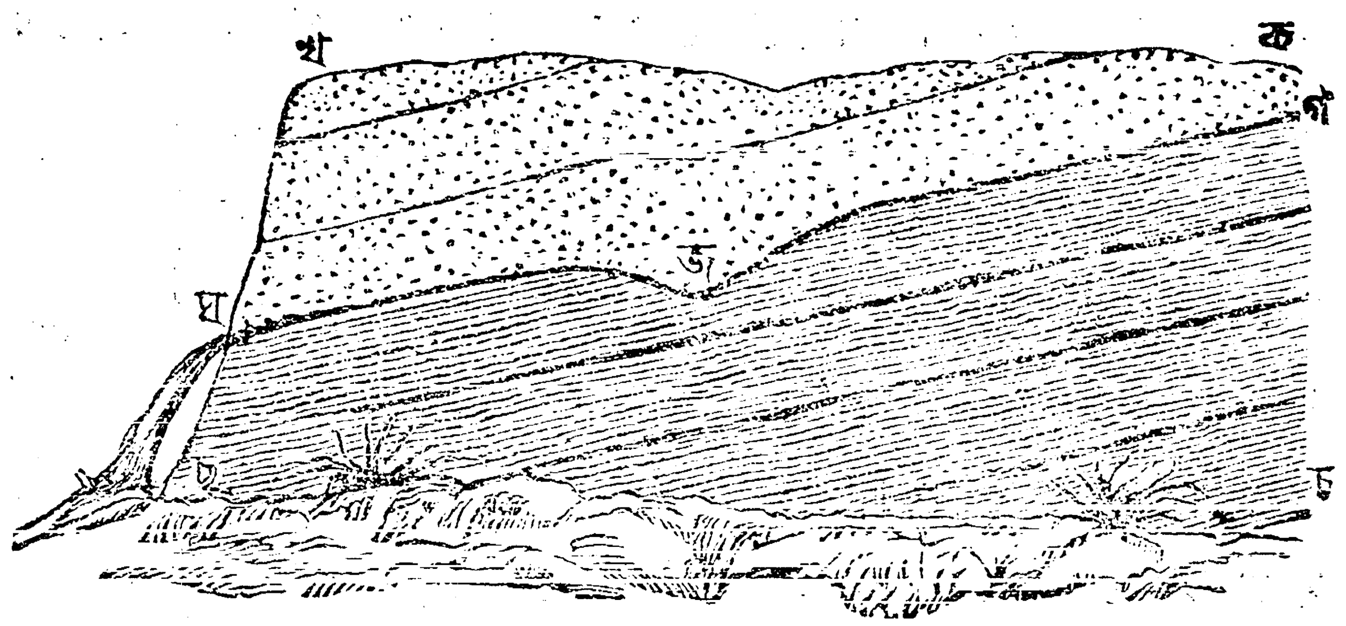

এখানে একটি চিত্র দ্বারা প্রস্রবণের উৎপত্তি দেখান যাইতেছে। ক খ ঘ গ কয়েকটি বালুকাময় স্তর। আর গ ঘ ছ চ কয়েকটি এঁটেল মৃত্তিকা বা অপর কোন প্রকার জলের দুষ্প্রবেশ্য স্তর। এই চিত্রের অনুরূপ কোন স্থানের স্তর-বিন্যাস হইলে, তথাকার বৃষ্টিজল বালুকা প্রভৃতি প্রবেশ্য স্তর সমুদয়ের মধ্য দিয়া গিয়া গ জ ঘ প্রভৃতি আটাল মৃত্তিকার স্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া তথায় সঞ্চিত হইবে। ক্রমে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে ঐ জল ঘ স্থান ঢালু ও নিম্ন পাইয়া তথা দিয়া বহির্গত হইবে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাই যে প্রস্রবণের একমাত্র কারণ, তাহা নহে। কোন কারণে নিম্নে জল সঞ্চিত হইয়া পড়িলে তাহা ঊর্দ্ধদিকে বহির্গমনের পথ পাইলে, উদ্গত হইয়া থাকে। মোটামুটি সমুদয় স্থলের স্তর-বিন্যাস বর্ণনা করা সহজ নহে।

যাহা হউক বৃষ্টিজল নানা স্থলে সঞ্চিত হইয়া প্রস্রবণ রূপে পুনর্ব্বার নিঃসৃত হয়। ঐ প্রস্রবণ সকলই নদী হ্রদ প্রভৃতির জীবন।

বিভিন্ন প্রস্রবণ হইতে বিভিন্ন প্রকার জল নিঃসৃত হইয়া থাকে। জল দেখিতে স্বচ্ছ হইলেই,

উহা বিশুদ্ধ হয় না, স্বচ্ছ পরিষ্কার জলে কিঞ্চিৎ লবণ কিম্বা শাদা চিনি মিশ্রিত কর, জল স্বচ্ছ দেখাইবে, অথচ উহাতে লবণ কিম্বা চিনি মিশ্রিত থাকিবে। চূণের জল দেখিতে স্বচ্ছ, কিন্তু ঐ জলে চূণ মিশ্রিত থাকে। শীতকালে অধিকাংশ নদীর জল স্বচ্ছ দেখায়, কিন্তু ঐ জলেও অল্পাধিক পরিমাণে ধাতব বা খনিজ পদার্থ বিমিশ্রিত থাকে। জলে অনেক প্রকার গ্যাস ও বাষ্প মিশ্রিত থাকিতে পারে। দেখ, জলে কত প্রকার মৎস্যাদি জীব জন্তু বাস করিতেছে। উহারাও আমাদিগের ন্যায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে। আমাদিগের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য যেরূপ বায়ুর আবশ্যক হয়, জলবাসি জীবদিগেরও ঐরূপ বায়ুর আবশ্যক হয়। জলে বায়ু মিশ্রিত না থাকিলে জলজীব কিছুতেই বাঁচিতে পারিত না। শম্বুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, চিংড়িমাছ প্রভৃতি অনেক জলজীবের শরীরের খোলা পোড়াইয়া চূণ প্রস্তুত হয়। অতএব আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, ঐ খোলায় চূণ আছে। ঐ সকল প্রাণী তাহাদের শরীরের জন্য ঐ চূণ জল হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে।

বৃষ্টির জল বিশুদ্ধ, আর নদী পুষ্করিণী প্রস্রবণের জল অবিশুদ্ধ। এই সমুদয় জলে নানা প্রকার খনিজ পদার্থ ও গ্যাস মিশ্রিত থাকে। ঐসমুদয় পদার্থ মৃত্তিকা হইতে জলে মিশিয়া থাকে। ভূ-গর্ভ হইতে জল উত্থিত হওয়াতে জলে কত প্রকার খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত হয়। এজন্য প্রায় যাবতীয় প্রস্রবণের জলে নানা প্রকার পদার্থ মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে ঔষধোপযোগী খনিজ পদার্থ জলে মিশ্রিত থাকাতে, ঐ জল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রামের লবণাখ্য ও সূর্য্যকুণ্ড নামক প্রস্রবণের জল নিতান্ত লবণাক্ত। ইহাদিগের ও উষ্ণ প্রস্রবণের বিষয় পরে সবিশেষ বলা যাইবে।

প্রকৃতির ছদ্মবেশ।

মানুষে ছদ্মবেশ ধারণ করে। দেবতারাও ছদ্মবেশে স্বকার্য্য উদ্ধার করিতেন। বহুরূপীরা গায়ে রং লেপিয়া ছাই মাখিয়া কালী, দুর্গা ও শিব সাজে। অনেক জুয়াচোরও সাধুবেশ ধারণ করে। দেবতারা বরাহ, মৎস্য প্রভৃতি রূপ ধারণ করিতেন। বলিরাজার দানশীলতার পরীক্ষার জন্য বিষ্ণু বামন রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। হনুমান রাবণের গৃহ হইতে মহাদেবের ধনুক অপহরণের জন্য গণক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়াছিল।

মানুষ দেবতার কথা ছাড়িয়া দি। ভান করা ও ঠকান'র প্রবৃত্তি নিকৃষ্ট জীবদিগের মধ্যেও দেখা যায়। আবার শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে যে, উদ্ভিদেরও এ প্রকৃতিটী আছে। শৃগালকে ফাঁদে ফেলিয়া যদি খুব প্রহার করা যায়, তবে সে মড়ার মত স্পন্দহীন হইয়া পড়িয়া থাকে; মনে করে মৃতের ভান করিলে মড়া ভাবিয়া কেহ তাহাকে আর প্রহার করিবে না। ভেককে প্রহার কর সে হাত পা ছড়াইয়া পেট ফুলাইয়া চিৎ হইয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিবে; একটু সরিয়া দাঁড়াও দেখিবে অমনি দশ হাত করিয়া লাফ মারিতেছে। কেন্নাইকে স্পর্শ করিলেই গুঁড়ি বাঁধিয়া পয়সার মত গোল হইয়া থাকে, নড়ে চড়ে না।

এই গেল প্রকৃত জুয়াচুরির কথা। এখন আমরা অন্য প্রকার জুয়াচুরির কথা বলিব।

অর্কিড নামক পরগাছা ফুল তোমরা অনেকেই দেখিয়া থাকিবে। এই পরগাছা অন্য গাছের

উপর জন্মায়। আম, কদম, বট, অশ্বথ প্রভৃতি গাছেই অধিক দেখা যায়। ইহাদের ফুলগুলি বড় সুন্দর, দেখিতে ঠিক প্রজাপতি বোলতা বা অন্যান্য সুন্দর কীটের ন্যায়। দূর হইতে কীট বলিয়া ভ্রম হয়। এই জাতীয় এক প্রকার কয়েকটী ফুল লইয়া একটী ছোট বাক্সে তুলার মধ্যে রাখিয়া কোন বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌-বেত্তা তাঁহার কয়জন বন্ধুকে দেখাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেইগুলির সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন ওরূপ সুন্দর পোকা তাঁহারা পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। আম বা কদম গাছের ডালে যখন পাঁচ ছটা এই ফুল সরু এক ডাঁটে সার সার হইয়া ফুটিয়া বাতাসে দুলিতে থাকে তখন বোধ হয় যেন একদল প্রজাপতি উড়িতেছে।

আবার অনেক প্রজাপতি এবং অনেক পোকা আছে যাহারা দেখিতে ঠিক এই সব ফুলের মত। এই এক থোপ ফুটন্ত ফুলের মধ্যে যদি ঐরূপ একটা প্রজাপতি বসিয়া থাকে, তবে আর চিনিবার যো থাকে না।

এক জাতীয় ফড়িং আছে, সেগুলি খুব সরু ও লম্বা লম্বা হয়, গায়ের রং শুষ্ক ঘাসের মত। এই ফড়িং যখন নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকে, তখন বোধ হয় যেন একটা শুক্‌না ঘাস বা খড় পড়িয়া রহিয়াছে।

কয়েক জাতীয় ফড়িং আর প্রজাপতি আছে সেগুলি আবার দেখিতে ঠিক গাছের পাতার মত। তাহারা যখন পাখা দুটী একত্র করিয়া একটা পাতার কাছে বসে, কার সাধ্য তাহাদের উভয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারে। এই যে ছবি দিলাম,—

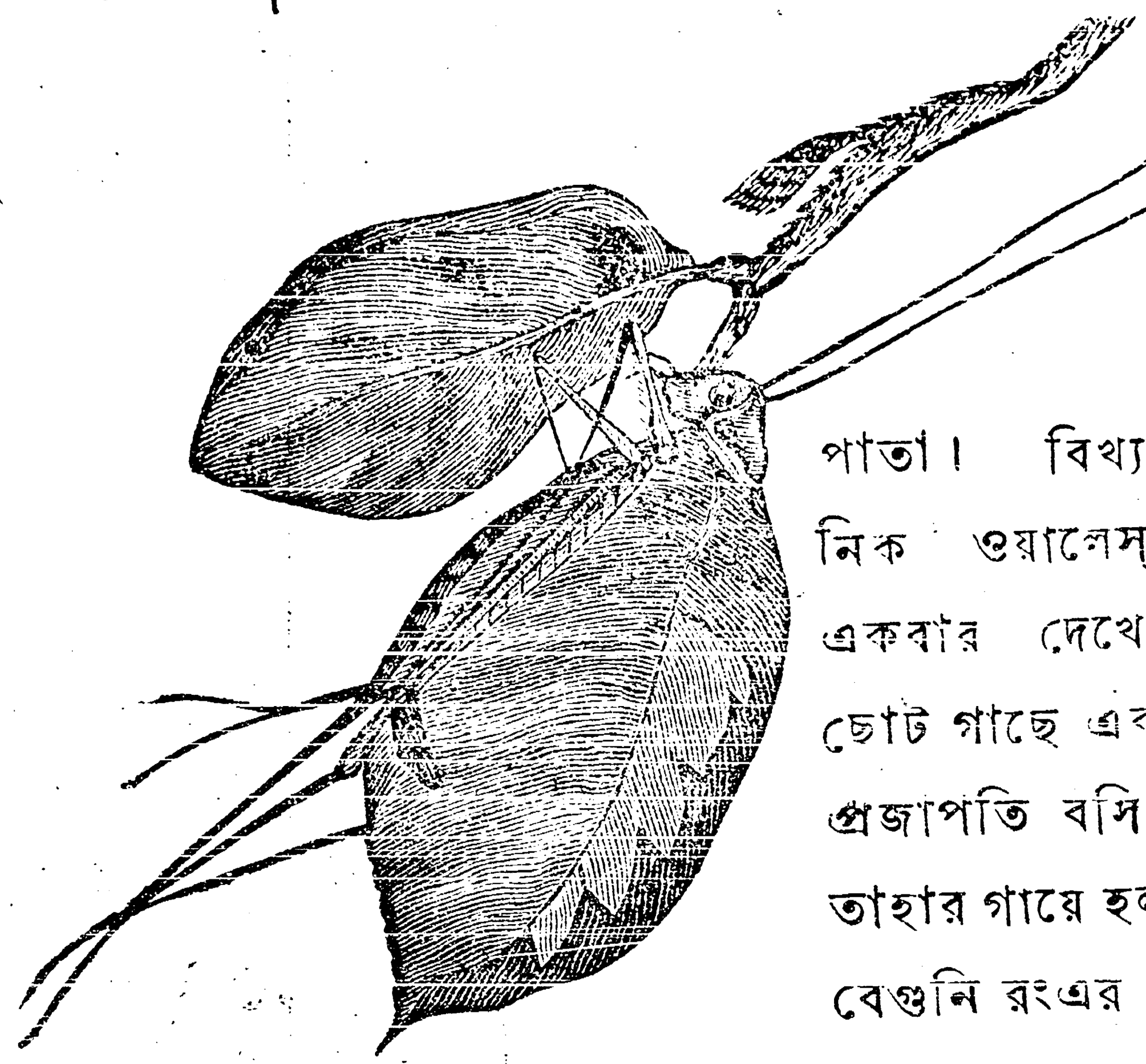

একটা পাতার পাশে একটা প্রজাপতি বসিয়া আছে;—দেখিলে হঠাৎ বোধ হয় যেন দুটা গাছের পাতা। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ওয়ালেস্‌ সাহেব একবার দেখেন একটা ছোট গাছে একটা সুন্দর প্রজাপতি বসিয়া আছে। তাহার গায়ে হল্‌দের উপর বেগুনি রংএর কাজ করা, দেখিতে বড় সুন্দর। তাঁহার বড় লোভ হইল, তিনি প্রজাপতিটীকে ধরিবার জন্য আস্তে আস্তে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু যেই নিকটে গিয়াছেন অমনি প্রজাপতিটী হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনি হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। খানিক পরে আবার প্রজাপতিটীকে সেইখানে দেখিতে পাইলেন; আবার ধরিতে গেলেন, আবার প্রজাপতি অদৃশ্য হইয়া গেল, তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি এই রূপে চারিবার বিফল হইয়া প্রজাপতিটী যে স্থানে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছিল সেই স্থানটীতে খুব মনোযোগ পূর্ব্বক তাকাইয়া রহিলেন; কিছু ক্ষণ পরে দেখিলেন প্রজাপতিটী তাঁহার চক্ষের সম্মুখেই রহিয়াছে, এতক্ষণ দেখিয়াও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। প্রজাপতিটীকে তিনি একটী পাতা মনে করিতেছিলেন। গাছের পাতায় আর প্রজাপতিতে কোন প্রভেদই লক্ষিত হয় নাই। এই প্রজাপতির পাখার উপর দিক্‌টার রং হল্‌দে আর বেগুনে কিন্তু তলার দিক্‌টা পাতার মত সবুজ এবং দেখিতেও ঠিক পাতার ন্যায়। যখন

পাখা দুখানি একত্রিত করিয়া বসে, তখনই পাতার মত হইয়া যায় আর চেনা যায় না। পাখা দুখানি ছড়াইলেই প্রজাপতির মত দেখায়। সাহেব যেই নিকটে যাইতেছিলেন প্রজাপতি অমনি পাখা গুটাইয়া পাতার মত হইয়া সাহেবের ভ্রম জন্মাইতে ছিল, কাজেই সাহেব কিছু বুঝিতে পারেন নাই। বসিবার সময়ে, যে সকল পাতার রং এবং আকৃতি ইহাদের মত, ইহারা বাছিয়া বাছিয়া সেই সকল পাতার কাছে বসে। এই ছদ্মবেশের জন্য ইহাদের শত্রু পাখিরা হঠাৎ ইহাদিগের চিনিতে পারে না, চিনিতে পারিলেই খাইয়া ফেলে।

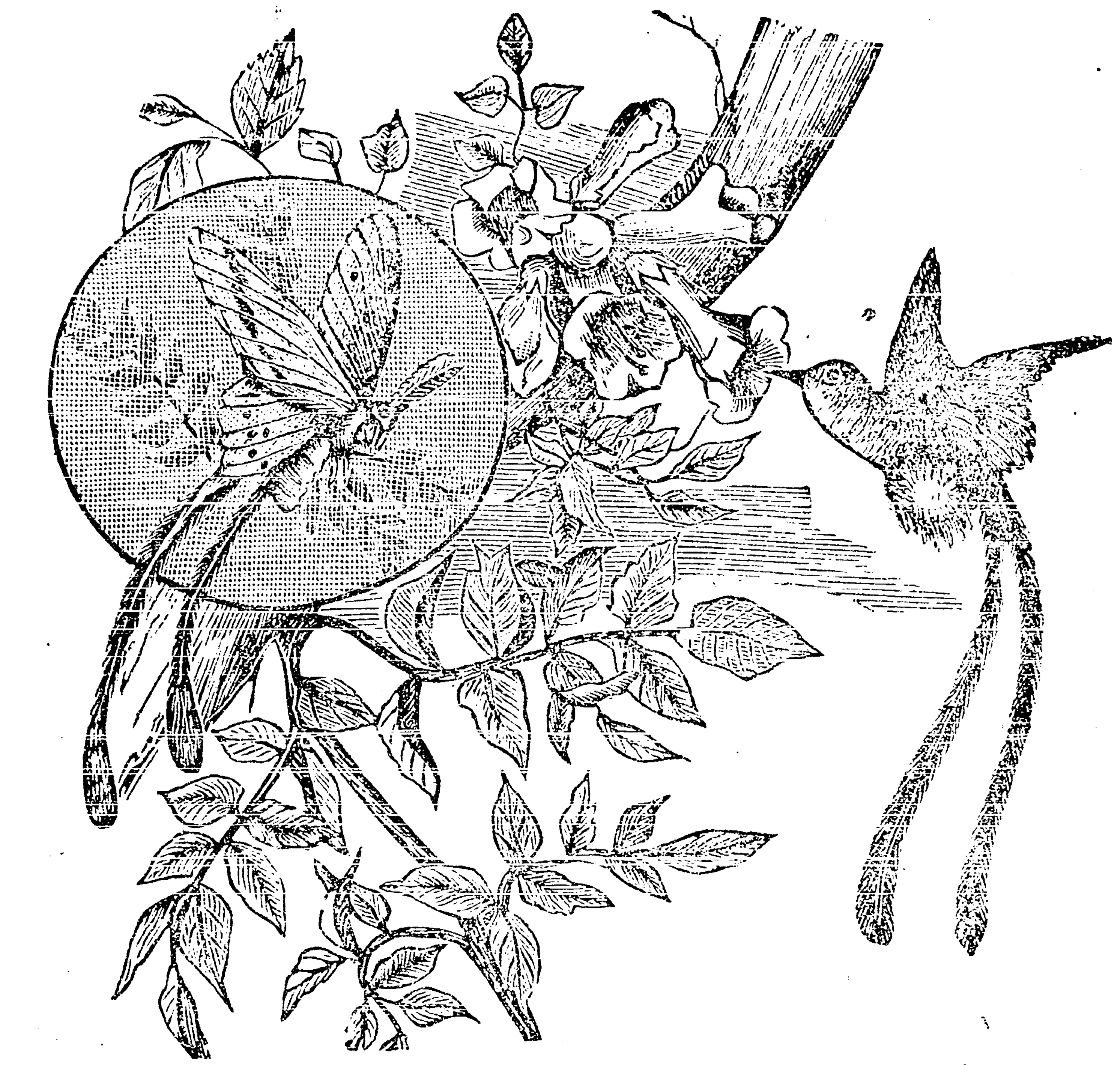

ফুল পোকার ভান করে। আবার পোকাও ফুল এবং পাতার নকল করে। জলে অনেক প্রকার কীট থাকে তাহারা দেখিতে গাছের মত। প্রবাল আর স্পঞ্জ দেখিতে উদ্ভিদের ন্যায় কিন্তু তাহারা কীট। অনেক পোকা আবার দেখিতে শেওলার মত।

উদ্ভিদ, প্রাণীর রূপ ধারণ করে, প্রাণী উদ্ভিদের রূপ ধারণ করে। আবার এক প্রাণী অপর প্রাণীর রূপ ধারণ করে।

হামিংবার্ড্‌ পাখিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। আমাদের টুনি পাখি আর মধুচুষকি হামিংবার্ড্‌ জাতীয়। হামিংবার্ড্‌ নানা জাতীয় এবং নানা রকমের আছে। ইহারা দেখিতে অতি মনোহর, যেমন ছোট তেমনি সুন্দর। উপরের ছবিটীর দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে একটী ফুলের গোছায় দুটি পাখি মধু খাইতে বসিয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইহার ডান্‌ দিকেরটা পাখি এবং বাম দিকেরটা প্রজাপতি। পাখির যেখানে দুটী চোখ প্রজাপতিরও সেইখানে দুটী চোখ। মস্তকের গঠনও উভয়ের দেখিতে এক। পাখির ডানায় পালক আছে, প্রজাপতির তাহা নাই, কিন্তু একের ডানা দেখিতে অপরের ডানার মত। প্রজাপতির লেজের সোঁয়া এত বড় ও এরূপে সাজান যেন ঠিক পাখির লেজের মত। প্রজাপতির শুঁড় ঠিক পাখির ঠোঁটের মত লম্বা। এই প্রজাপতিকে ঠিক হামিংবার্ড্‌ বলিয়া ভ্রম হয়। বেট্‌স্‌ সাহেব বলেন তিনি অনেকবার এই প্রজাপতিকে হামিংবার্ড্‌ ভাবিয়া গুলি করিয়াছেন।

এক জাতীয় হামিংবার্ড্‌ আছে তাদের খুব লম্বা দুটা লেজ থাকে। এক রকম প্রজাপতি আছে তাদেরও ঐ রকম লম্বা লেজের মত আছে; দেখিতে অনেকটা এই পাখির মত। শরীরের

বর্ণে ও আকৃতিতে এত সাদৃশ্য আছে যে, একটু দূর হইতে একেক অপর বলিয়া ভ্রম হয়। ইহাদের উভয়েরই বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকায়। তথাকার আদিম অধিবাসীরা বলে, ইহারা (প্রজাপতি আর পাখি) উভয়ই এক জাতীয়। তাহারা বলে ইহা-

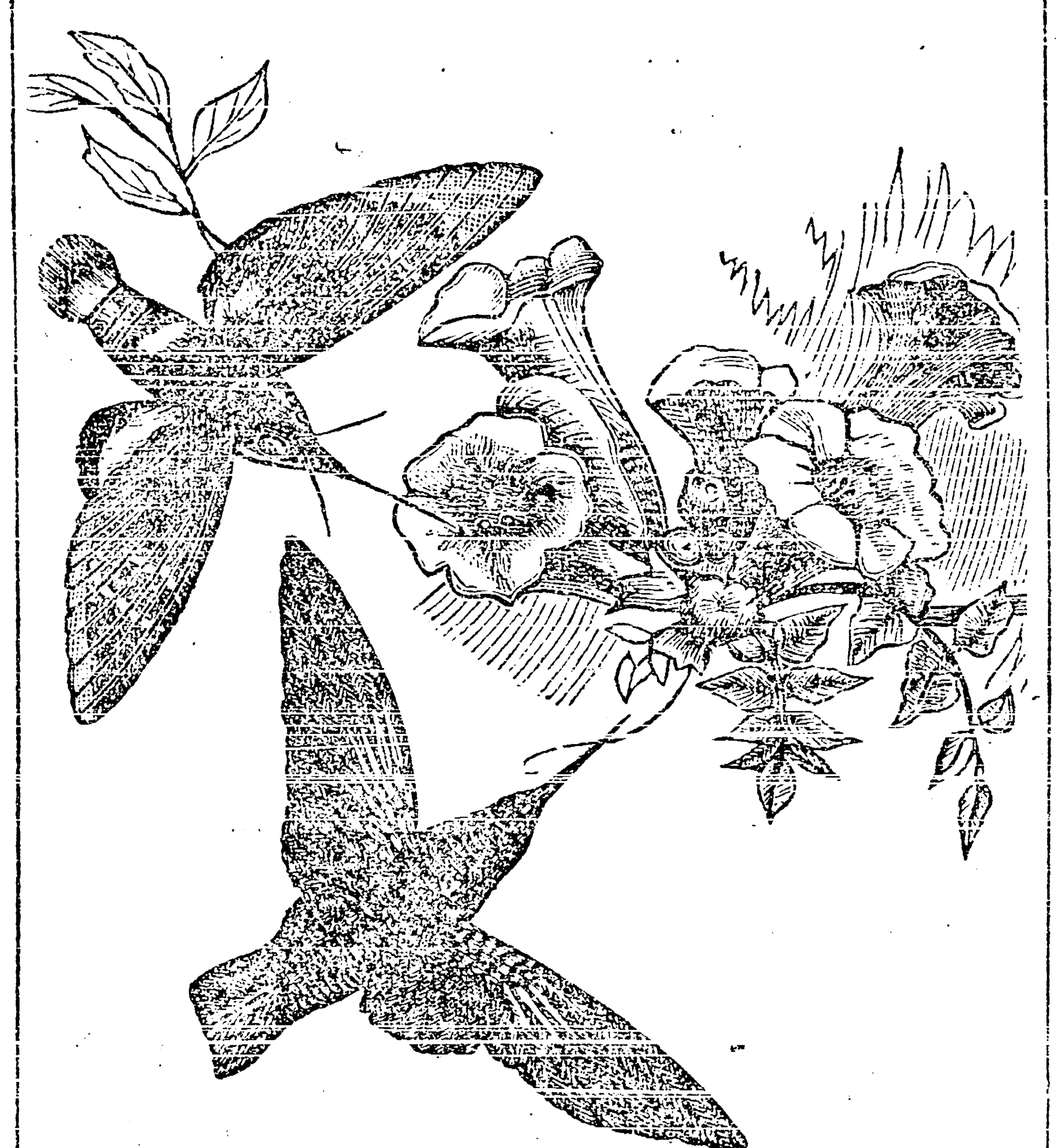

দের চোখ দেখ, লেজ দেখ, পালক দেখ, সবই এক প্রকারের। এই প্রজাপতি আর ঐ জাতীয় পাখি যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাহাদের কিছুতেই তাহা বুঝান যায় না। আমেরিকার আদিমবাসীদের বিশ্বাস এই যে, প্রজাপতিই সময়ে সময়ে ঐ পাখি হইয়া যায়; একই জীব কখন প্রজাপতি, কখন বা পাখি হইতেছে। তাহারা বলে ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। যদি শুয়ো পোকা থেকে প্রজাপতি হইতে পারে, তবে প্রজাপতি পাখি হইবে আর আশ্চর্য্য কি!

এলিজাবেথ ফ্রাই।

প্লাসেট-স্থানটী অতিশয় রমণীয় ছিল। এলিজাবেথ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এখানে আসিয়া তাঁহার সেই সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা চরিতার্থ হইয়াছিল। এলিজাবেথ এই সময় আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, যৌবনের আরম্ভে তাঁহার হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছিল,—দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করিবার যে সংকল্প করিয়াছিলেন, কার্য্যে তাহা বিশেষ কিছুই হইতেছে না, দিন দিন সংসারে লিপ্ত হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু এলিজাবেথ তখন বুঝিতে পারেন নাই যে, যে কার্য্যে তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন, সন্তানদিগের লালন পালন ও শিক্ষাদান এবং সংসারের সুখ দুঃখের অভিজ্ঞতা, তাহাতে কত প্রয়োজন। দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য এলিজাবেথ পরে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহাকে তাহারই জন্য প্রস্তুত করিতেছিল।

১৮০৯ সনে এলিজাবেথের পিতার মৃত্যু হইল। এলিজাবেথ বাল্যকালে মাতৃহীন হইয়াও পিতার স্নেহে মাতার শোক ভুলিয়াছিলেন; এখন পিতার মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। কিন্তু

ধীরভাবে সমস্তই সহ্য করিলেন। এক একটা দুঃখের ঘটনায় মানুষের নিদ্রিত আকাঙ্ক্ষাগুলিকে যেন জাগ্রত করিয়া দেয়; বহুদিন হইতে যে সংকল্প মনের মধ্যে রহিয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য হঠাৎ একটা ঐকান্তিক একাগ্রতা উপস্থিত হয়। পিতার মৃত্যুতে এলিজাবেথের জীবনেও আমরা ইহা দেখিতে পাই। দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য তাঁহার যে সংকল্প ছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। এই সময় তিনি মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচার করিতেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। দরিদ্র, অসহায়, অনাথদিগের গৃহে গৃহে যাইয়া, তাহাদের দুঃখ মোচনের জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলেন। নিজ গৃহ দরিদ্রদিগের জন্য সদাই উন্মুক্ত রাখিতেন। বাড়ীর বাহিরের দিকের একটী গৃহে, ক্ষুধার্ত্তদিগের জন্য খাদ্য দ্রব্য রাখিতেন, বস্ত্রহীনদিগের জন্য সর্ব্বদাই সকল প্রকারের বস্ত্র প্রস্তুত থাকিত, রোগীদিগের চিকিৎসার জন্য সর্ব্বদাই ঔষধ প্রস্তুত রাখিতেন। ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা নিবারণ করিয়া, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করিয়া এবং রোগীকে ঔষধ দান করিয়াই যে তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন তাহা নহে; যাহাতে তাহারা বিপথে না যায়, সৎপথে থাকিয়া সুখে জীবন যাপন করিতে পারে এমন উপদেশও দিতেন। যেখানে দারিদ্র, যেখানে অভাব, যেখানে রোগ ও শোক, এলিজাবেথ সেইখানেই উপস্থিত থাকিয়া, দরিদ্রের—অভাব মোচন করিতেছেন, রোগে—সেবা করিতেছেন, শোকে—সান্ত্বনা দিতেছেন।

কিন্তু যে মহৎকার্য্যে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এ সমস্ত তাহার সূচনা মাত্র। মহাত্মা হাউয়ার্ড কারাসংস্কারের জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়া অনেক কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু কারাবাসিনীদিগের অবস্থা অনেক স্থলেই যার পর নাই শোচনীয় ছিল। অনেকদিন হইতেই পর-দুঃখকাতর এলিজাবেথের দৃষ্টি এই দিকে পতিত হইয়াছিল; তাঁহার স্বাভাবিক কোমল হৃদয়, হতভাগিণী কারাবাসিণীদিগের জন্য ব্যথিত হইয়াছিল; ইহাদিগের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য তাঁহার এক ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল; কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত সে আকাঙ্ক্ষা ও সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

১৮১৩ সনে এলিজাবেথ ফ্রাই এই মহৎ কার্য্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করিলেন। নিউগেট্ নামক কারাগারের সংস্কারেই তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং তাহাতেই তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। এই স্থানে আমরা সেই সময়ের কারাগারের এবং বিশেষতঃ নিউগেট কারাগারের অবস্থা সংক্ষেপে লিখিতেছি। বর্ত্তমান সময়ের কারাগারের সহিত তুলনা করিলে সে সময়ের কারাগারের অবস্থা কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অপরাধীদিগের চরিত্র সংশোধন করাই শাস্তির উদ্দেশ্য, এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাহাদিগকে কারাবদ্ধ করা হইয়া থাকে। মহাত্মা হাউয়ার্ড এবং এলিজাবেথ ফ্রাই, যখন কারাগারের সংস্কারের জন্য প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন এ প্রকার ছিল না। হতভাগ্য কারাবাসী ও কারাবাসিনীদিগকে সে সময় বিন্দুমাত্র কৃপার যোগ্য বলিয়া কেহ মনে করিত না। তাহাদিগের চরিত্র সংশোধনের দিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না, কেহ সে বিষয় চিন্তাও করিতেন না। অপরাধ করিলেই শাস্তি পাইবে,—কিন্তু সে শাস্তির উদ্দেশ্য যে চরিত্র সংশোধন, তাহা কেহ চিন্তাও করিতেন না। সুতরাং দুষ্কার্য্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং অপরাধীর সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি

হইতে লাগিল। অপরাধীদিগের উপর তখন কেবল নিষ্ঠুর আচরণ করা হইত; তাহারা শত প্রকার অত্যাচার সহ্য করিত, সহস্র প্রকারে নিপীড়িত হইত। বর্ত্তমান সময়ে কারাবাসীদিগকে নানা প্রকার কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে;—অল্প-বয়স্ক অপরাধীদিগকে অন্যান্য কার্য্যের সহিত লেখা পড়া পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, ইহারা যখন অপরাধমুক্ত হইয়া গৃহে ফিরিবে, তখন ইহা দ্বারা সৎপথে থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে; পেটের দায়ে, একমুঠা অন্নের জন্য, আর অসৎপথে যাইতে হইবে না। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে এসকল কিছুই ছিল না; তখন অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া—শত প্রকারে নিপীড়িত করাই দেশের আইন ছিল। এখন যেমন প্রাণ হত্যা করিলে এবং তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে, হত্যাকারীকে ফাঁসি দেওয়া হয়, সে সময় তাহা ছিল না। তখন চুরী প্রভৃতি সামান্য অপরাধেও ফাঁসি দেওয়া হইত। এখন বিশেষ গুরুতর অপরাধ না করিলে দ্বিপান্তর করা হয় না; সে সময় অতি সামান্য অপরাধেও মাতার ক্রোড় হইতে সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, পিতার নিকট হইতে পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, স্ত্রীর নিকট হইতে স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, চিরজীবনের মত সাগর পারে নির্ব্বাসিত করা হইত। তখন কোন বিচারই ছিল না। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ সকলকেই সমান ভাবে, সেই সময়ের সেই কঠোর আইনের নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। যাহারা একবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইত, তাহাদের একেবারে সর্ব্বনাশ হইত। শত অত্যাচারে—সহস্র নিপীড়নে এবং কারাগারের সেই পাপ-সংসর্গে, তাহাদের হৃদয়ের কোমলতা, সৎভাব ও সৎপ্রবৃত্তি একবারে নির্ম্মূল হইয়া যাইত। চিরজীবনের মত তাহারা ঘোর পাপে ডুবিয়া যাইত; সৎপথে থাকিয়া সুখে জীবন যাপন করিবার আর তাহাদের কোন আশাই থাকিত না।

কারাগারে তাহারা কি প্রকারে নিপীড়িত হইত, কত অত্যাচার—কত যন্ত্রণা ভোগ করিত; তাহা পাঠ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই কারাবাসী এবং কারাবাসিনীদিগের বাসের উপযোগী গৃহ কোথাও ছিল না; ভগ্ন, পরিত্যক্ত এবং বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত স্থানেই এই হতভাগ্য ও হতভাগিনীদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। ইহারা রীতিমত আহার করিতে পাইত না, দুবেলা পেট ভরিয়া আহার করা ইহাদের ভাগ্যে কখনই ঘটিত না—অনেক সময় উপবাসী থাকিতে হইত! শীত নিবারণের জন্য ইহাদিগকে বস্ত্র দেওয়া হইত না এবং ভূমিতলই ইহাদিগের একমাত্র শয্যা ছিল। অনাহারে, অত্যাচারে এবং রক্ষকদিগের নির্দ্দয় প্রহারে অবসন্ন হইয়া, হতভাগ্য ও হতভাগিনীগণ ভূমিতলে নিদ্রিত হইয়া পড়িত; এবং যতক্ষণ এই নিদ্রিত অবস্থায় থাকিত, ততক্ষণই একটু শান্তি অনুভব করিত, ক্ষণকালের জন্য সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইত। কখন কখনও ভিক্ষা করিবার জন্য ইহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া পথে বাহির করা হইত; দয়া করিয়া কেহ কিছু দিলে, তাহাদ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিত, নতুবা উপবাসী থাকিয়াই দিন কাটাইতে হইত। অপরাধীগণ পলায়ন না করে, এই জন্য কোন কোন স্থানে ইহাদিগের অনেকগুলিকে একত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ভূতলে ফেলিয়া রাখা হইত; নিষ্ঠুর রক্ষকগণ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইত না, সামান্য পশুর ন্যায় এই হতভাগ্য ও হতভাগিনীদিগের গলদেশ

শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিত। এই ভয়ঙ্কর অত্যাচার, উৎপীড়ন, ও রক্ষকদিগের নিষ্ঠুর প্রহারে এবং অনাহারে, কত অপরাধী এবং কত নিরপরাধী, কত পুরুষ ও স্ত্রী, কত বালক ও বালিকা যে অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইত তাহার সংখ্যা ছিল না!

ক্রমশঃ—

সৎ-সাহস।

বিগত ১৮ই জানুয়ারী উত্তরপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল মুখোপাধ্যায় একটী প্রকৃত বীরত্বের কার্য্য করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সদ্দৃষ্টান্ত সখার পাঠক পাঠিকাদিগের সম্মুখে ধরিতেছি,—আশা করি রামলাল বাবুর এই বীরত্বের কথা পড়িয়া তোমরা অনেকে শিখিবে। বিগত ১৮ই জানুয়ারী সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রামলাল বাবু কলিকাতা হইতে আফিসের পর বাড়ী যাইতেছিলেন; ইঁহার বাড়ী উত্তরপাড়া। উত্তরপাড়া স্কুল লেন, নামক রাস্তা দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, একটা পুষ্করিণীর ধারে কতকগুলি লোক জমা হইয়াছে এবং একজন স্ত্রীলোক চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। অগ্রসর হইয়া দেখিলেন ৩৷৪ বৎসরের একটী শিশু পুষ্করিণীর উচ্চ তীর হইতে জলে পতিত হইয়া জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। লোকগুলি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কিন্তু শিশুটীকে বাঁচাইবার জন্য কেহই অগ্রসর হইতেছে না। শিশুটীর মাতা চীৎকার করিয়া সকলের নিকট সাহায্য চাহিতেছে, কিন্তু কেহই একপদও নড়িতেছে না। রামলাল বাবু এই ব্যাপার দেখিয়া মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব করিলেন না, এবং নিজ জীবনের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, সেই আফিসের কাপড়েই জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন; এবং শিশুটীকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া, তাহার মাতার ক্রোড়ে দিয়া তাহাকে শান্ত করিলেন। রামলাল বাবুর এই দৃষ্টান্ত সকলেরই অনুকরণ যোগ্য। তিনি নিজ জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া যে শিশুটীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, সেজন্য ঈশ্বরের নিকট তিনি পুরস্কার লাভ করিবেন।

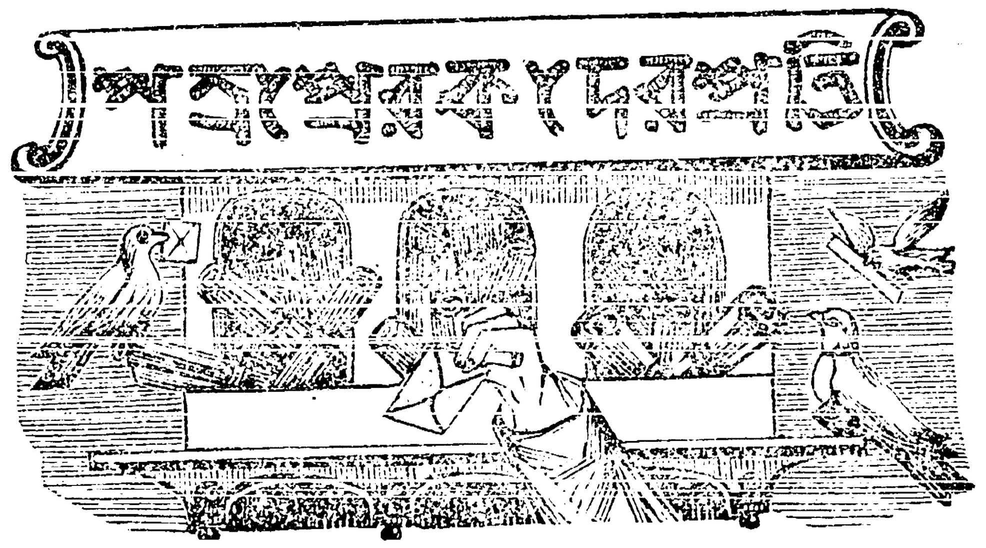

শ্রীমতী জ্ঞানদা সুন্দরী দেবী। আপনার প্রেরিত ক্ষুদ্র গল্পটী পাইয়াছি। "সখায়" প্রকাশিত হইল না বলিয়া দুঃখিত হইবেন না। একটী গল্প লিখিতে গেলে তাহার বিশেষ একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই,—গল্পটির মধ্যে উপদেশ থাকা চাই, ঘটনার বৈচিত্র থাকা চাই। এমন ভাবে লিখিতে হয় যে, সখার পাঠক পাঠিকারা তাহা পড়িয়া উপকার লাভ করিতে পারেন। আপনি মধ্যে মধ্যে রচনা লিখিবেন, এবং লিখিতে লিখিতেই শেষে ভাল লিখিতে পারিবেন। ভাল করিয়া লিখিয়া রচনা পাঠাইলে আমরা অবশ্য প্রকাশ করিব।

শ্রীসতীশ চন্দ্র সেন। "ব্যবহার" বিষয়ে একটা প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন। কাহার সহিত আমাদের কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত; পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, আত্মীয় বান্ধব, প্রতিবাসী এবং দীন দুঃখী, অন্ধ আতুর সকলের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত, তাহাই লিখিয়াছেন। রচনার শেষ কথা "আমাদের সকলের সহিত সদ্ভাব এবং সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করা উচিত।" প্রবন্ধটী পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি; লেখা মন্দ হয় নাই, ভাষাও বেশ। বড় দীর্ঘ হইয়াছে; খুব ছোট করিয়া লিখিলে আমরা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতে পারিতাম। যাহা হউক প্রকাশ করা গেল না বলিয়া লেখকের নিরাশ হইবার কারণ নাই। তাঁহার লিখিবার শক্তি আছে; অভ্যাস রাখিলে পরে ভাল লেখক হইতে পারিবেন।

শ্রী * * *, কলিকাতা। আমাদের একজন গ্রাহক, ইহাঁর নাম আমরা প্রকাশ করিলাম না। ইনি একখানি পোষ্ট-কার্ডে আমাদিগকে কিছু তিরস্কার উপহার দিয়াছেন। প্রথমতঃ "সখা" ভেলু পেয়েবলে পাঠাইতে নিষেধ করিয়াছেন, এবং লিখিয়াছেন যে, যদি আমাকে আপনার বিশ্বাস হয়, তবে নিয়মিত মত "সখা" পাঠাইবেন, আমি পরে টাকা দিব।" আমরা সখার কোন গ্রাহককেই অবিশ্বাস করি না; বিশেষ সখার গ্রাহকগণ অল্প বয়স্ক, তাঁহারা যে ইহারই মধ্যে প্রতারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে চাই না। ভেলুপেয়েবল নিয়ম করিবার অন্য উদ্দেশ্য আছে। তারপর ইনিলিখিয়াছেন যে, "নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে গত বৎসরের সখার মধ্যে এমন একটী প্রবন্ধও নাই, যাহা পড়িয়া গ্রাহকদের কোন উপকার হইতে পারে।" আমাদের গ্রাহকটী যদি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা ও উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে আর আমাদের কোন কথাই নাই; কারণ "সখা" তাঁহার জন্য নহে। সহজ কথায় বিজ্ঞানের কথা, উপদেশপূর্ণ জীবন চরিত, ঐতিহাসিক ঘটনা, নীতিপূর্ণ গল্প ও পদ্য সখায় গত বৎসর প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রাহকগণ সেগুলি পাঠ করিয় কোন, উপকার পাইয়াছেন কিনা, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। তাহাদেরই উপকারে আসিবে, সেই আশা করিয়াই আমরা পরিশ্রম ও যত্নের সহিত সেগুলি সংগ্রহ করিয়া সখায় প্রকাশ করিয়াছি। অবশ্য যিনি মনে করেন, সখা পড়িয়া কোন লাভ হইতেছে না, তাঁহাকে আমরা একটী করিয়া টাকা জলে ফেলিতে নিষেধ করি, অন্য প্রকারে সদ্ব্যয় করাই উচিত। আমরা উক্ত গ্রাহকটীকে সখা আর পাঠাই নাই। তাহার কারণ অবিশ্বাস নয়। "সখা" পড়িয়া যখন তাঁহার কোন উপকার হয় না, তখন একটী করিয়া টাকা কেন আমরা তাঁহার দণ্ড করিব?

ধাঁধাঁ।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।*

১। কোকিল।

নূতন।

(১)

নাম তিনাক্ষরে বটে সম্পর্কে প্রধান,
যথা তথা করে লোকে আমার সম্মান।
অক্ষর কাটিলে থাকি দোকানীর ঘরে,
আমার আশ্রয়ে বাঁচে যত নারী নরে।
আদ্যক্ষর ছেড়ে দিলে পরিমাণ করি,
মধ্যম ছাড়িলে বসি পাল্লার উপরি।
একাই মধ্যম করে অব্যয়ের কাজ,
নানা ভাবে নানা স্থানে করে সে বিরাজ।

---

* নিম্নলিখিত গ্রাহকগণ গত বারের ধাঁধার ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

শ্রীমতী লবঙ্গলতা চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা; নগেন্দ্রনাথ দাস, ভাগলপুর; অনাদিনাথ সেন, বগুড়া; রমারঞ্জন ঘোষ, রায়গঞ্জ; সৌরেন্দ্রনাথ দে চৌধুরি, রাণাঘাট; যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কুষ্টিয়া; শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, গোলাঘাট; সতীশচন্দ্র সেন, গোলাঘাট; অশ্বিণীকুমার সেন গুপ্ত, মাথাভাঙ্গা; শ্রীমতী কুমুদেন্দু দেবী, কোচবিহার।

সখা

সপ্তম ভাগ। তৃতীয় সংখ্যা।

মার্চ্চ, ১৮৮৯।

বিবিধ।

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৩রা মার্চ্চ পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদে শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের একটী প্রদর্শণী হইয়া গিয়াছে। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর এবং মুর্শিদাবাদের কালেক্টর ক্যাল্‌টন সাহেবের যত্নেই এই প্রদর্শণীটি হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ বাঙ্গালার নবাবদিগের রাজধানী ছিল, এবং ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে এবং আরম্ভ সময়ে এস্থান অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। এ জেলার শিল্পজাত দ্রব্য, বিশেষতঃ রেশম ও হস্তিদন্ত নির্ম্মিত দ্রব্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধ। নবাব বাহাদুরের প্রশস্ত সুন্দর বাগান বাড়ীতে প্রদর্শণী বসিয়াছিল। প্রদর্শণীতে নবাব বাহাদুর নিজ গৃহের অনেক বহুমূল্য শিল্পজাত দ্রব্য পাঠাইয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন বল্লভিপুর এবং আজিমগঞ্জের অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও অনেক দ্রব্য পাঠাইয়াছিলেন। শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে হস্তীদন্ত নির্ম্মিত নানা প্রকার দ্রব্য, রেশমের বস্ত্র পিতল, কাঁসা প্রভৃতি ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, কাগজ, মৃত্তিকা এবং মোম নির্ম্মিত নানা প্রকার দ্রব্যই প্রধান। এই সকল দ্রব্যের কারুকার্য্য অতিশয় মনোহর এবং শিল্প সম্বন্ধে মুর্শিদাবাদ জেলায় যে কত উন্নতি হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে নানা প্রকার ধান এবং চাউল, শাক সব্‌জি এবং ফুল ও ফল প্রদর্শিত হইয়াছিল। খাদ্য জিনিসেরও অভাব ছিল না। দুগ্ধ দ্বারা যত প্রকার খাদ্য দ্রব্য তৈয়ার হইতে পারে তাহা এবং অন্যান্য অনেক প্রকার মিষ্টান্নও প্রদর্শিত হইয়াছিল; মিষ্টান্নে অরুচি জন্মিলে আচারেও অভাব ছিল না, অসংখ্য প্রকার আচারও প্রদর্শিত হইয়াছিল। হস্তীদন্ত নির্ম্মিত জিনিসগুলি, রেশমের নানা প্রকার কারুকার্য্য-পূর্ণ বস্ত্র, মোম এবং ধাতুনির্ম্মিত পুতুলগুলি, এ সকলই—বিশেষতঃ একটী ভিক্ষুকের মূর্ত্তি অতিশয় সুন্দর হইয়াছিল। মিষ্টান্ন ডিপার্টমেণ্টে একটী ছানাবড়া দৃষ্ট হইয়াছিল, সেটী ওজনে দশ সের মাত্র! খৃষ্টানদের খৃষ্টম্যাস উপলক্ষে এক এক খানি খুব বড় কেক্ (পিঠা) তৈয়ার করে, তাহার নাম মন্‌ষ্টার কেক্; মন্‌ষ্টার—অর্থে রাক্ষস। আমাদের এই ক্ষুদ্র ছানাবড়াটীকেও মন্‌ষ্টার ছানাবড়া বলা যাইতে পারে। জঙ্গিপুরের এক জন কামার একটী লোহার সিন্দুক প্রদর্শণীতে পাঠাইয়া-

ছিল, এই সিন্ধুকটী সাধারণতঃ সিন্ধুক যে ভাবে খুলিতে হয়, সে ভাবে খোলা যায় না, এবং খুলিতে গেলে সিন্ধুক হইতে এমন একটা শোর গোল উঠে যে নিদ্রিত ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ জাগ্রত করিয়া দেয়; চোর মহাশয়দের মহা বিপদ! কতকগুলি ছুরি, কাঁচি, ছোরা ও তালা প্রদর্শিত হইয়াছিল, সেগুলি বিশেষ প্রশংসার উপযুক্ত। দেশে এমন ভাল ছুরি প্রভৃতি থাকিতেও আমরা বিলাতি ছুরি কাঁচি না কিনিয়া পারি না।

* *
*

পোর্টব্লেয়ারের একজন কর্ম্মচারীর উপদেশ মত ব্রহ্মদেশ ও আণ্ডামানের মধ্যে পায়রার ডাক বসান হইতেছে। পায়রাগুলিকে এমন শিক্ষিত করা হইয়াছে যে, তাহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চিঠিপত্র লইয়া যাইবে। আর এখন জাহাজে বা অন্য উপায়ে ডাক পাঠাইতে হইবে না, পায়রারাই সে কার্য্য করিবে। পায়রাদের এ কার্য্য নূতন নয়, ইহারা বহুদিন হইতে পিয়নের কার্য্য করিয়া আসিতেছে এবং একার্য্যে ইহাদের দক্ষতাও যথেষ্ট।

* *
*

অমূল্য সম্পত্তিঃ—কোন যুবকের এক ধনীর কন্যাকে বিবাহ করিবার অভিলাষ হয়। যুবক বিশেষ সঙ্গতিপন্ন ছিল না। কন্যার পিতার প্রভূত ধন, তিনি কন্যাকে কখনই নির্ধনের হস্তে সমর্পন করিবেন না। যুবকের সহিত কন্যার পিতার পরিচয় ছিল না; কিন্তু কোন উকিলের সাহায্যে যুবক কন্যার পিতার নিকট পরিচিত হইল। কিছুদিন পরেই কন্যার পিতা উকিলের নিকট যুবকের ধন সম্পত্তি ও পদমর্য্যাদা সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন। পর দিবস যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার ধন সম্পত্তি কিছু আছে কি" যুবক বলিল "আজ্ঞে কিছুই না" "আচ্ছা কেহ যদি আপনাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেয় তবে আপনি কি আপনার নাকটা কাটিয়া লইতে দিতে সম্মত আছেন" যুবক উত্তর করিল "সেকি মহাশয়! এরূপ প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসা করেন; সমস্ত পৃথিবী দিলেও নাক কাটিতে দিব না।" উকিল বলিলেন "বেশ কথা, আমার এটা জিজ্ঞাসা করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।" তৎপরে উকিল মহাশয় যাইয়া কন্যার পিতার নিকট গিয়া বলিলেন আমি যুবকের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তাহার হাতে সম্প্রতি নগদ এক টাকাও নাই তবে তাহার এক রত্ন আছে, পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইলেও বিক্রয় করিতে রাজি নহে। এই কথা শুনিয়া কন্যার পিতার আহ্লাদের আর সীমা রহিল না; যুবকের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। কিন্তু পরে যখনই সেই রত্নের বিষয় চিন্তা করিতেন তখনই বিষণ্ণ হইতেন।

* *
*

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিন্‌কল্‌নের নিকট কোন জর্ম্মন যুবক চাকরির প্রার্থী হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। লিন্‌কলন্ যুবককে সেনাপতির কার্য্যে নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হইলে যুবক আহ্লাদে লিন্‌কল্‌নকে বলিল "মহাশয়, জর্ম্মনদেশের কোন অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশে আমার জন্ম।" লিন্‌কল্‌ন অতি ধীরভাবে বলিলেন "তজ্জন্য আপনি কোন চিন্তা করিবেন না, সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম বলিয়া আপনার পদোন্নতির কোন বিঘ্ন হইবে না।"

* *
*

ধনকুবের ব্যারণ রথস্‌চাইল্ডের নিকট অন্য কোন ব্যারণ সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। রথস্‌চাইল্ড তখন লিখিতেছিলেন, আগন্তুকের দিকে না তাকাইয়া তাঁহাকে নিকটে একটি চেয়ারে বসিতে বলিলেন। অনেকক্ষণ হইয়া গেল তাঁহার লেখা আর শেষ হয় না। আগন্তুক মনে করিলেন তিনি যে একজন সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়াছেন তাহা বোধ হয় রথস্‌চাইল্ড টের পান নাই। তিনি আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন "মহাশয় আপনি বোধ হয় জানিতে পারেন নাই আমি আসিয়াছি। আমি ব্যারণ অমুক।" রথস্‌চাইল্ড লিখিতে লিখিতে (বোধ হয় অমনোযোগ হেতু) বলিলেন "ও, তবে আর একখানা চেয়ার গ্রহণ করুন।"

ধর্ম্মের প্রভাব।

পাণ্ডবেরা বার বৎসর বনবাস করিবে ও এক বৎসর নিভৃতবাস করিবে এইরূপ নিয়ম ছিল। বনবাসের বার বৎসর কাটিয়া গেলে পর তাঁহারা এক বৎসর কোথায় লুকাইয়াছিলেন কেহই জানিতে পারে নাই। এই নিভৃতবাসের বৎসর তাঁহারা কোথায় আছেন কেহ যদি সন্ধান পায় তবে তাঁহাদের আরও বার বৎসর বনবাস ভোগ করিতে হইবে। তাঁহাদের শত্রুপক্ষীয়েরা তাঁহাদের খোঁজ লইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। দুর্য্যোধন তাঁহাদের সন্ধান লইবার অনেক ফিকির করিয়াছিলেন, দেশে দেশে চর পাঠাইয়াছিলেন, কোথাও অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের ঠিকানা পাইলেন না। তৎপরে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান অমাত্যগণ লইয়া সভা করিয়া কিরূপে তাঁহাদের বাহির করা যায় সেই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, ভীষ্ম প্রভৃতিকে পাণ্ডবেরা কোন্ স্থানে গমন করিয়াছে তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিতে বলিলেন। কি উপায়ে তাঁহাদের অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনেকে অনেক উপায় বলিলেন। তন্মধ্যে মহাত্মা ভীষ্ম এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। "পাণ্ডবেরা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন সত্যবাদী, ও ধার্ম্মিক। তাঁহারা সতত সৎপথে বিচরণ করিতেছেন এবং ধর্ম্ম ও নিজ বলে সর্ব্বদা রক্ষিত আছেন তাঁহাদের কেহই অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা আমার মত লোকের কর্ত্তব্য নহে। তবে সত্যশীল, ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি সভামধ্যে যেরূপ ন্যায়ানুগত উপদেশ প্রদান করেন আমিও সেইরূপ সদুপদেশ দিতেছি। অন্যান্য সকলে তাঁহাদের নিবাস নিরূপণ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন আমি তাহা স্বীকার করি না। আমার এই মত যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির যে নগরে বা জনপদে আছেন তথাকার রাজারা অন্যায়াচরণ করিতে বিরত হইবেন, এবং তথাকার লোকেরা বদান্য, শান্ত, হৃষ্টপুষ্ট, প্রিয়বাদী ও লজ্জাশীল হইবে। তথায় অসূয়া, ঈর্ষা ও অভিমানের অধিকার থাকিবে না, সর্ব্বদা বেদধ্বনি শ্রুত হইবে, যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্ম সমুদায় সম্পাদিত হইবে। মেঘ প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষণ করিবে, পৃথিবী শস্যসম্পন্ন ও ভয় শূন্য হইবে, ফল সমুদায় রসাল ও ধান্য সকল সুগন্ধযুক্ত হইবে। সকলে সতত সদালাপ করিবে,

ভয়ের লেশমাত্রও থাকিবে না। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত প্রচুর এবং পানীয় ও ভোজনীয় দ্রব্য অতিশয় সুরস ও হিতজনক হইবে। লোকে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে ও সতত সন্তৃপ্ত থাকিবে; দেবপূজা, অতিথি সৎকার, অর্থদান ও ব্রতানুষ্ঠানে সবিশেষ আদর প্রদর্শন করিবে। অশুভ বিষয়ে বিদ্বেষ ও শুভ বিষয়ে আস্থা প্রদর্শন করিবে, কদাচ মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করিবে না এবং সর্ব্বদা সৎপথেই অগ্রসর হইবে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সত্য, দান, শান্তি, ক্ষমা, কীর্ত্তি, লজ্জা, শ্রী, অহিংসা ও সরলতা প্রভৃতি সদ্গুণের একমাত্র আধার, সামান্ত লোকের কথা দূরে থাকুক, বিদ্বান ও ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাকে সম্যক অবগত হইতে পারেন না। যদি আমার বাক্যে আস্থা হয় তবে এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর হয় তাহাই করুন।" ইহাতেই বুঝা যায় সাধু ব্যক্তিদিগের সংসর্গ কত হিতজনক!

টিয়া পাখী।

অনেকেই পাখী পুষিয়া থাকেন। বোধ হয় পাঠকবর্গের কাহারও কাহারও একটী টিয়া পাখীও আছে। ইহাদের সম্বন্ধে আজ আমরা কিছু বলিব। টিয়া পাখী অনেক জাতীয় আছে। ইহাদিগকে প্রধান চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। ১—কাকাতুয়া, ২—"টিয়া," ৩—লুরি, ৪—মক। উহাদের মধ্যে প্রথম তিন শ্রেণীর টিয়াই আমরা এদেশে সচরাচর দেখিয়া থাকি। চতুর্থ শ্রেণীর পাখীগুলির বাসস্থান আমেরিকা। এই সকল পাখী সাধারণতঃ খুব বড় এবং উজ্জ্বল রং বিশিষ্ট হয়, কিন্তু ইহাদের চেহারা তত সুন্দর নহে। আমরা সচরাচর যে সকল টিয়া দেখিতে পাই; তাহারাও আবার সকলে এদেশীয় নহে। অতিশয় সুন্দর পাখীগুলি প্রায়ই অষ্ট্রেলিয়া হইতে আসিয়া থাকে, জাহাজী গোরারা অনেক সময়ে অষ্ট্রেলিয়া হইয়া আসিবার সময় এক একটী পাখী কিনিয়া আনে, এবং কলিকাতা আসিয়া টিরেটীবাজারের পাখীওয়ালাদের নিকট অধিক মূল্য লইয়া বিক্রয় করে। পাখীওয়ালারা আবার অধিকতর লাভ করিয়া এখানকার সৌখীন লোকদিগকে সে সকল পাখী গছাইয়া দেয়। ভাল ভাল কাকাতুয়া এবং লুরিগুলি প্রায়ই অষ্ট্রেলিয়া হইতে আইসে। আমাদের দেশী যে সকল টিয়া, তাহার মধ্যে সাধারণতঃ সবুজ টিয়া, লাল গলাবন্দওয়ালা টিয়া, মদনা, চন্দনা, ফুলচুসী, কাজলী, ফরিদি ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। "হীরেমণ" "লালমন" ইত্যাদি আমীর গোছের পাখীগুলির অধিকাংশই বিদেশী।

বিদেশী পাখীগুলিকে অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি স্থান হইতে আনে; আর দেশী পাখীগুলিকে কি করিয়া পায় জান? দেশী পাখীর অনেকগুলিকে বাচ্চা অবস্থায়ই তাহাদের বাসা হইতে ধরিয়া আনা হয়। ইহা ছাড়া ধাড়ী পাখীগুলিকেও জাল দিয়া ধরে। এই সকল ধাড়ী পাখী কিছুতেই পোষ মানে না। ইহাদিগকে জলে ছোপাইয়া ধোঁয়া লাগাইয়া প্রয়োজন হইলে কিঞ্চিৎ আফিমের ব্যবস্থা করিয়া "ভাল মানুষ" করা হয়। অল্পবুদ্ধি খদ্দের খুব সন্তুষ্ট হইয়া ইহাদিগকে কিনে, কিন্তু বাড়ীতে আনিয়াই আপনার ভ্রম বুঝিতে পারে।

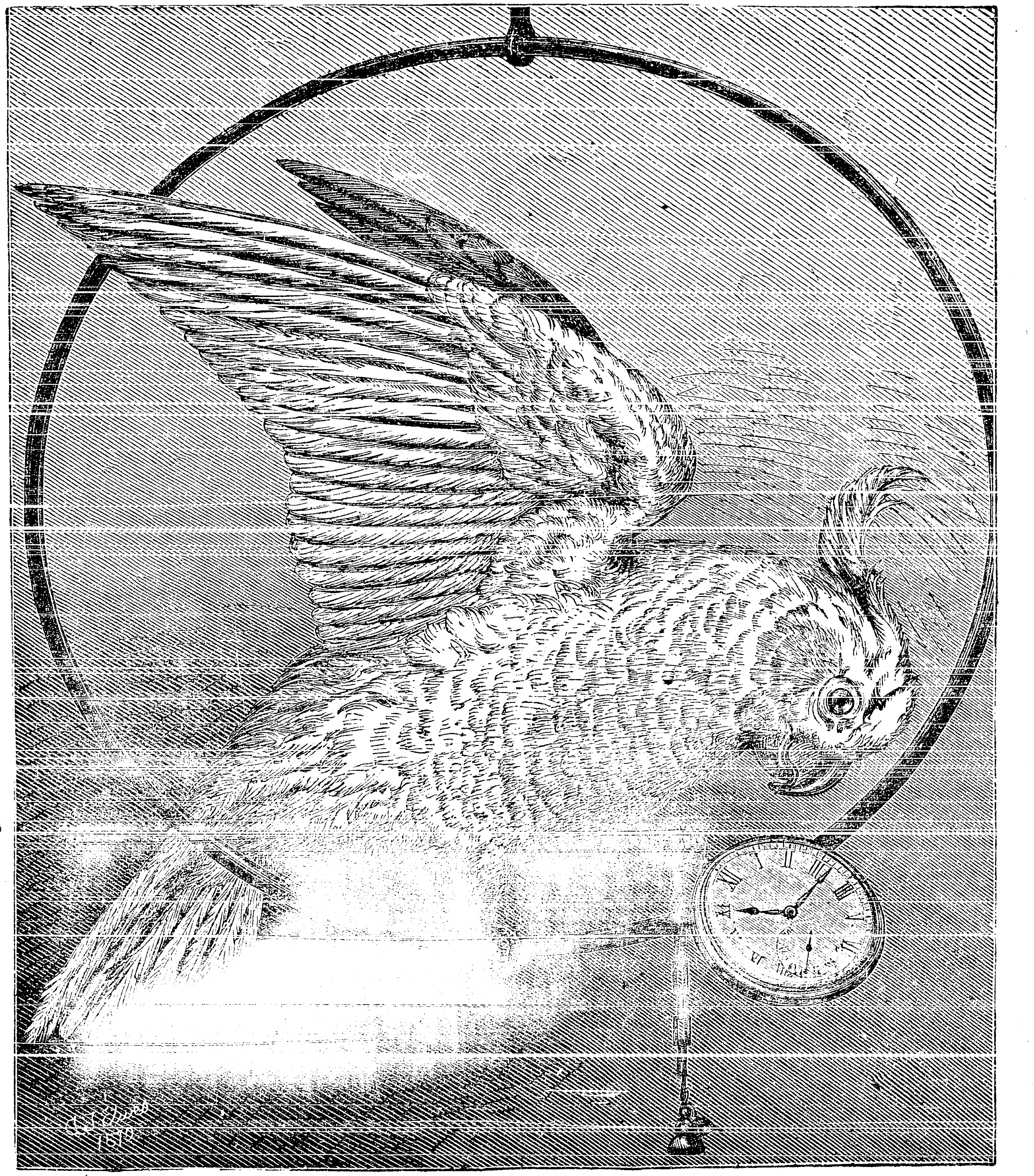

তোমাদের অনেকেই হয়ত নিম্নলিখিত গল্পটী পড়িয়াছ। এক ব্যক্তি একটা টিয়া পাখী পুষিয়াছিল; সেটা কেবলমাত্র একটী কথা বলিতে জানিত—"তাতে আর সন্দেহ কি?" পাখীটা আর কোন কথা কহিতে পারে না দেখিয়া সেই ব্যক্তি তাহাকে বিক্রী করিবার জন্য বাজারে

লইয়া গেল। একজন সৌখীন লোক আসিয়া পাখীর দাম জিজ্ঞাসা করিল ; উত্তর হইল "দুই-হাজার টাকা"। ক্রেতা কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "বটে! তোমার পাখীর এত দাম বলিতেছ, সে কি এত দামের উপযুক্ত ?" পাখী-ওয়ালা বলিল "পাখীকেই জিজ্ঞাসা কর।" শ্রোতা পাখীকে জিজ্ঞাসা করিল "কিরে, তুই কি এত দামের উপযুক্ত ?" পাখী বলিল "তাতে আর সন্দেহ কি ?" এই কথাগুলিতে সেই ব্যক্তি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া দুই হাজার টাকায় সেই পাখী কিনিল।

অল্পদিন পরেই পাখীর গুণ বাহির হইয়া পড়িল। তখন দুঃখিত হইয়া সেই ব্যক্তি বলিল "এত টাকায় এই পাখীটা কিনিয়া বড়ই নির্ব্বোধের কাজ করিয়াছি। এমন সময় পাখী বলিল "তাতে আর সন্দেহ কি ?"

টিয়া পাখীগুলি অনেক সময় অতিশয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া থাকে। তোমাদের প্রায় সকলেই সখাতে "মণিরামের" কথা পড়িয়াছ। আমাদের ছবির পাখীটী ঘড়ি দেখিতেছে। আমি একটা পুস্তকে পড়িয়াছি যে, একটী ভদ্রলোক (তিনি তোৎলা ছিলেন) একবার কোন বন্ধুর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সেই বন্ধুর বাড়ীতে "পলি" নামক একটা কাকাতুয়া ছিল। আমোদ দেখিবার জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "প-প্ প প পলি, ক-ক্-ক-কটা বেজেছে ?" পলি উত্তর করিল "চা-চ্-চ্ চা চারটে!"

আকবর সাহের মহানুভাবতা।

ভারতবর্ষে যত মুসলমান সম্রাট্ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহাত্মা আকবর সর্ব্বাপেক্ষ প্রজারঞ্জক, উদারচেতা, মহানুভব ও দয়ালু শাসনকর্ত্তা ছিলেন। হিন্দু রাজাদের মধ্যে যেমন যুধিষ্ঠির, মুসলমান সম্রাট্দের মধ্যে তেমনি আকবর। তাঁহার রাজত্ব কালে হিন্দু মুসলমান সকলে সমভাবে সুখ শান্তি সম্ভোগ করিয়াছেন। অপরাপর মুসলমান সম্রাট্দের সময় হিন্দুদিগের উপর যেরূপ উৎপীড়ন, নির্য্যাতন হইত, আকবর সাহের সময় তাহা ছিল না। উদারতাগুণে তিনি হিন্দুদের এমনি শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় হইয়াছিলেন যে, হিন্দুরা তাঁহাকে বাদসাহের পরিবর্ত্তে "মহারাজ" বলিয়া ডাকিত! আজ পর্য্যন্তও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ প্রয়াগ ধামে গমন কর, তথায় গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে যে সুন্দর এবং সুদৃঢ় দুর্গ দেখিতে পাইবে, তাহার নির্ম্মাতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, তীর্থপুরোহিত পাণ্ডাগণ একবাক্যে তোমাকে বলিবে,—"মহারাজ আকবর এই কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।" তাঁহার উদারতাগুণে হিন্দু মুসলমান জাতিবিদ্বেষ ভুলিয়া "ভাই ভাই" রূপে একত্র বাস করিয়াছে। মুসলমানগণ তাঁহার হিন্দুপত্নী যোধবাইর গর্ভজ সন্তান খস্রুকে "সুবার" পরিবর্ত্তে "কুমার" বলিয়া ডাকিত। এলাহাবাদ নগরে খস্রুবাগে তাঁহার যে সমাধি স্তম্ভ রহিয়াছে, তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে আজও মুসলমানগণ "কুমার খস্রুর গোর" বলিয়া থাকে। এই সাম্যবাদী উদারচেতা

শাসনকর্ত্তা মহাত্মা আকবর সাহের বদান্যতা ও মহানুভাবতা সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকা আছে, তোমাদিগকে আজ তাহার দুই একটী উপহার দিব।

থানেশ্বরে বা কুরুক্ষেত্রে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বীরাজ যে দিন মহম্মদ ঘোরির সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইলেন, সেই দিন হইতে ভারতে হিন্দুরাজত্ব একরূপ শেষ হইল, সেই দিন হইতে রাজা দুর্য্যোধনের হস্তিনাপুরী এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ মুসলমানের হস্তগত হইল, সেই দিন হইতে মহারাজ দিলীপের রাজধানী দিল্লী নগর, ভারতে মুসলমান-রাজত্বের রাজধানী হইল! ষোড়শ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে আকবর সাহ সেই দিল্লী হইতে তাঁহার রাজধানী উঠাইয়া আনিয়া আগ্রাতে স্থাপন করেন। তদবধি বাদসাহ সাহজাহানের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত আগ্রাতেই মুসলমান সম্রাটদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল, তারপর বাদসাহ আরঙ্গজিব আবার তাহা দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেন। মহাত্মা আকবরের সমাধি-স্তম্ভ আকাশভেদী চূড়া সেকেন্দ্রাবাদ, ও ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে রক্ত প্রস্তর নির্ম্মিত তাঁহার আগ্রা-দুর্গ, এবং নানাবিধ কারুকার্য্য সম্বলিত, শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত বাদসাহ সাহজাহানপত্নী তাজবিবির সমাধি মন্দির মমতাজমহল, ও মতিমস্জিদ, আগ্রা নগরে—সমস্ত ভারতে আকবর সাহ ও সাহজাহানের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

বাদসাহ আকবর সুবিশাল ভারত সাম্রাজ্যের প্রায় একছত্র রাজা হইয়াও, ছদ্মবেশে সামান্য লোকের ন্যায় তাঁহার রাজধানী আগ্রা নগরের পথে পথে ভ্রমণ করিয়া রাজধানীর লোকদের অবস্থা অবগত হইতেন। একদিন সামান্য লোকের বেশে নগর-পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, হঠাৎ প্রবল বেগে বৃষ্টি আসিল ; বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিকটস্থ এক দরজির দোকানে প্রবেশ করিলেন। দোকানে প্রবেশ করিয়া সেই দরজির সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন, তাহার সন্তান সন্ততির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যবসায়ের অবস্থা কি প্রকার তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। দোকানী তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া তাহারই মত এক জন সমান্য লোক মনে করিয়া, সব কথা খুলিয়া বলিতে লাগিল। তাহার বিস্তৃত পরিবার ও আয়ের অল্পতার কথা, এমন কি অর্থাভাবে যে, সে তাহার দোকানের খাজানা ও কর পর্য্যন্ত দিতে পারে না, তাহাও জানাইল। বাদসাহ তাহার অবস্থা অবগত হইয়া বৃষ্টির পর গৃহে ফিরিলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পর একজন ভদ্র লোক সেই দরজির দোকানে আসিয়া তাহাকে তাহার দোকানের একখানা নিষ্কর পাট্টা দিয়া গেলেন। কিন্তু দরজি তখন জানিতে পারিল না, কে তাহাকে সেই পাট্টা দান করিয়াছেন! অবশেষে কিছুকাল পরে সে জানিতে পারিল যে, সম্রাট্ স্বয়ং সে দিন জলে ভিজিতে ভিজিতে তাহার দোকানে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং তিনিই তাহার দুঃখ দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া তাহাকে সেই নিষ্কর পাট্টা পাঠাইয়া দিয়াছেন। তখন সে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার দয়ার কথা বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। মহানুভব আকবর এইরূপে রাজধানীর পথে পথে ভ্রমণ করিয়া নগরবাসীদের অবস্থা অবগত হইতেন, এবং তাহাদের কোন অভাব ও দুঃখ কষ্ট দূর করিতেন।

আর একদিন তিনি দিল্লী হইতে আগ্রা যাইতেছিলেন। পদব্রজে চলিতে তাঁহার বড়ই আমোদ হইত। তিনি সঙ্গীয় সৈন্য সামন্ত ও লোক জনদিগকে ধীরে ধীরে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে আদেশ

করিয়া, সামান্য সৈন্যের বেশে একাকী আগে আগে চলিতে লাগিলেন। কতকদূর আসিয়া দুই পথের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইলেন। তখন কোন্ পথে যাইবেন ঠিক করিতে না পারিয়া নিকটবর্ত্তী এক গৃহের নিকটে গেলেন। এক বৃদ্ধ সৈনিক সেই গৃহ-দ্বারে বসিয়া তামাকু পান করিতেছিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি বলিতে পারেন, কোন্ পথে গেলে আমি আগ্রাতে যাইতে পারিব?" একজন সামান্য মোসাফেরের (পরিব্রাজক) মুখে এই প্রশ্ন শুনিয়া সেই সৈনিক পুরুষ তাচ্ছিল্যের সহিত উত্তর করিলেন—"এই ডাইনের পথে যাও।"

বাদসাহ সৈনিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া বলিলেন,—আর একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

সৈনিক—"তুমি আর কি জানিতে চাও?

বাদসাহ—"সৈন্য বিভাগে আপনি কি কাজ করেন?"

সৈনিক—"তোমার কি অনুমান হয়?"

বাদসাহ—"বোধ হয়, আপনি নাইকের কাজ করেন?"

সৈনিক—"আরো উপরে উঠ।"

বাদসাহ—"তবে বোধ হয় জমাদার?"

সৈনিক—"আরো অনেক উপরে।"

বাদসাহ—"আপনি কি তবে হাবিলদার?',

তখন সৈনিক সন্তুষ্টি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "এতক্ষণে তুমি অনুমান করিতে পারিয়াছ বটে, কিন্তু আমার পদমর্য্যাদা বুঝিতে তোমার অনেক সময় লাগিয়াছে। আচ্ছা, তুমি কি কাজ কর?" তখন আকবরসাহ কৌতূহল পরবশ হইয়া বলিলেন, "আপনি অনুমান করুন দেখি?"

সৈনিক—"নাইক হবে আর কি?"

বাদসাহ—"আরো উপরে।"

সৈনিক—"তবে জমাদার?"

বাদসাহ—"এখনও হয় নাই, আরো উপরে।"

সৈনিক—"তবে বোধ হয়, হাবিলদার?"

বাদসাহ—"তাহারও অনেক উপরে।"

সৈনিক তখন হুকার নল মুখ হইতে ফেলিয়া দিয়া "তুমি" ছাড়িয়া "আপনি" ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয় কি তবে মনসবদার?"

বাদসাহ বলিলেন,—"না, বন্ধু, আপনাকে আরো উপরে উঠিতে হইবে।"

তখন বৃদ্ধ হাবিলদার দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে আপনি অবশ্য রাজপরিবারের কোন রাজকুমার হইবেন?''

বাদসাহ বলিলেন,—"এখনও হয় নাই, আবার চেষ্টা কর; তাহ'লে হয়ত আমার প্রকৃত পদ জানিতে পারিবে।"

তখন সৈনিক বিস্মিত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"তবে কি আমি রাজাধিরাজ স্বয়ং বাদসাহ বাহাদুরের সম্মুখে দণ্ডায়মান আছি।"

বাদসাহ বলিলেন,—হাঁ ভাই, এখন তুমি আমায় চিনিতে পারিয়াছ।''

বৃদ্ধ সৈনিক তখন ভয়ে ও ভক্তিতে জানু পাতিয়া বাদসাহ বাহাদুরের সম্মুখে প্রণত হইল। মহানুভব আকবর তাহাকে হাতে ধরিয়া উঠাইলেন এবং কথাবার্ত্তায় তাঁহাকে আশ্বস্ত ও পরিতুষ্ট করিয়া আগ্রাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, লোকে একটু সামান্য উচ্চপদ পাইলেই নিম্ন পদস্থ লোকদের সহিত কত দুর্ব্ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু মহাত্মা আকবর বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও প্রজাদের সহিত কি রূপ উদার ব্যবহার করিতেন, এই সৈনিক পুরুষের সহিত কি মহানুভব ব্যবহার

পার্সিভাল স্পেন্সার।

(সখা—মার্চ্চ, ১৮৮৯)

করিয়াছিলেন। তাঁহার মহৎ চরিত্রে আমাদের কত শিক্ষার বিষয় আছে! আশা করি, সখার পাঠক পাঠিকাগণ, মহাত্মা আকবরের মহানুভাবতা জীবনে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিবেন।

আকাশ-ভ্রমণ ও মেঘ হইতে লম্ফপ্রদান।

বেলুন।

চতুর্থ ভাগ সখায় বেলুন সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা লেখা হইয়াছে। তাহা পড়িলে তোমরা জানিতে পারিবে,বেলুনটা কি জিনিস,আর বেলুনে করিয়া কিরূপে লোক মাঝে মাঝে আকাশে উঠিয়া থাকে।

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ক্যাভেণ্ডিস্ সাহেব হাইড্রোজন গ্যাস আবিষ্কার করেন। তৎকালীন এডিনবরা নগরের ডাক্তার ব্লাক পাত্‌লা চামড়ার ব্যাগে হাইড্রোজন গ্যাস পূরিয়া উড়াইতে আরম্ভ করেন,সেই অবধি গ্যাসের বেলুনের সৃষ্টি হয়। ডাক্তার ব্লাক যখন তাঁহার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ব্যাগ আপনা আপনি উড়িয়া ছাতের কড়িকাঠে গিয়া লাগে এই তামাসা দেখান, তখন তাঁহারা সকলে বলিয়াছিলেন যে, ব্যাগে কাল সূতা বাঁধা আছে, তাহা ধরিয়া ছাতের উপরের কোন ছিদ্র দিয়া লোকেরা টানিয়া লইতেছে। বেলুন যে আপনা আপনি উঠিতেছে, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

একটা ভেঁড়া, একটা মুরগী আর একটা হাঁস বেলুনে চড়িয়া আকাশে সর্ব্ব প্রথমে ভ্রমণ করে। ইহারা তিন জনাই অনেকক্ষণ আকাশে ভ্রমণের পর নির্ব্বিঘ্নে ভূতলে অবতরণ করিলে পর পিলেটর ডি-রোজিয়ার নামক জনৈক ফরাসি সর্ব্ব প্রথমে বেলুনে উঠিয়া আকাশ পথে ভ্রমণ করা যে সম্ভব, তাহা দেখাইয়া দেন।

তৎপরে ক্রমে ক্রমে ইউরোপের নানা স্থান হইতে সাহসী পুরুষেরা বেলুনে করিয়া আকাশে বেড়াইতে আরম্ভ করেন। তদবধি যুদ্ধ সময়ে এবং অনেক উপরে আকাশের অবস্থা জানিবার ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার জন্য বেলুন ব্যবহৃত হইতেছে।

ক্রীড়া-বেলুনে ও আকাশে বেড়াইবার বেলুনে একটু প্রভেদ আছে। মানুষ যে বেলুনে চড়িয়া আকাশে উঠে, তাহা খুব বড় করিয়া তৈয়ার করা হয় মাত্র। রেসমের কাপড় কাটিয়া এরূপ ভাবে সেলাই করা হয় যে, একটা প্রকাণ্ড ফাঁপা গোল বল তৈয়ার হয়। ইহার চারি দিকই বন্ধ থাকে, কেবল গ্যাস পূরিবার জন্য একদিকে একটা মুখ খোলা থাকে। কাপড়ের ফাঁক দিয়া গ্যাস বাহির হইয়া না যাইতে পারে, এই জন্য মোম এবং অন্যান্য পদার্থ গলাইয়া বার্ণিসের মত করিয়া সমস্ত বেলুনের উপর মাখাইয়া দেওয়া হয়। তারপর সমস্ত বেলুনটাকে সরু দড়ির জাল দিয়া ঘেরিয়া মজবুত করা হয়। ইহাতে হাইড্রোজেন কিম্বা কোন গ্যাস পূরিয়া একটা ধামা, ডালা বা ছোট নৌকা বাঁধিয়া তাহাতে কাহাকেও বসাইয়া বেলুন ছাড়িয়া দিলে সব শুদ্ধ হুস করিয়া আকাশে উঠিতে থাকিবে; এবং যে দিকে বাতাস বহিতে থাকিবে, সেই দিকে উড়িয়া চলিয়া যাইতে থাকিবে।

আকাশে ভ্রমণের জন্য যে সকল বেলুন তৈয়ার হয়, তাহার উপরদিকে মাথায় "সেফ্‌টি ভ্যাল্‌ভ" অর্থাৎ এমন দরজা থাকে যে,তাহা ইচ্ছামত খুলিয়া

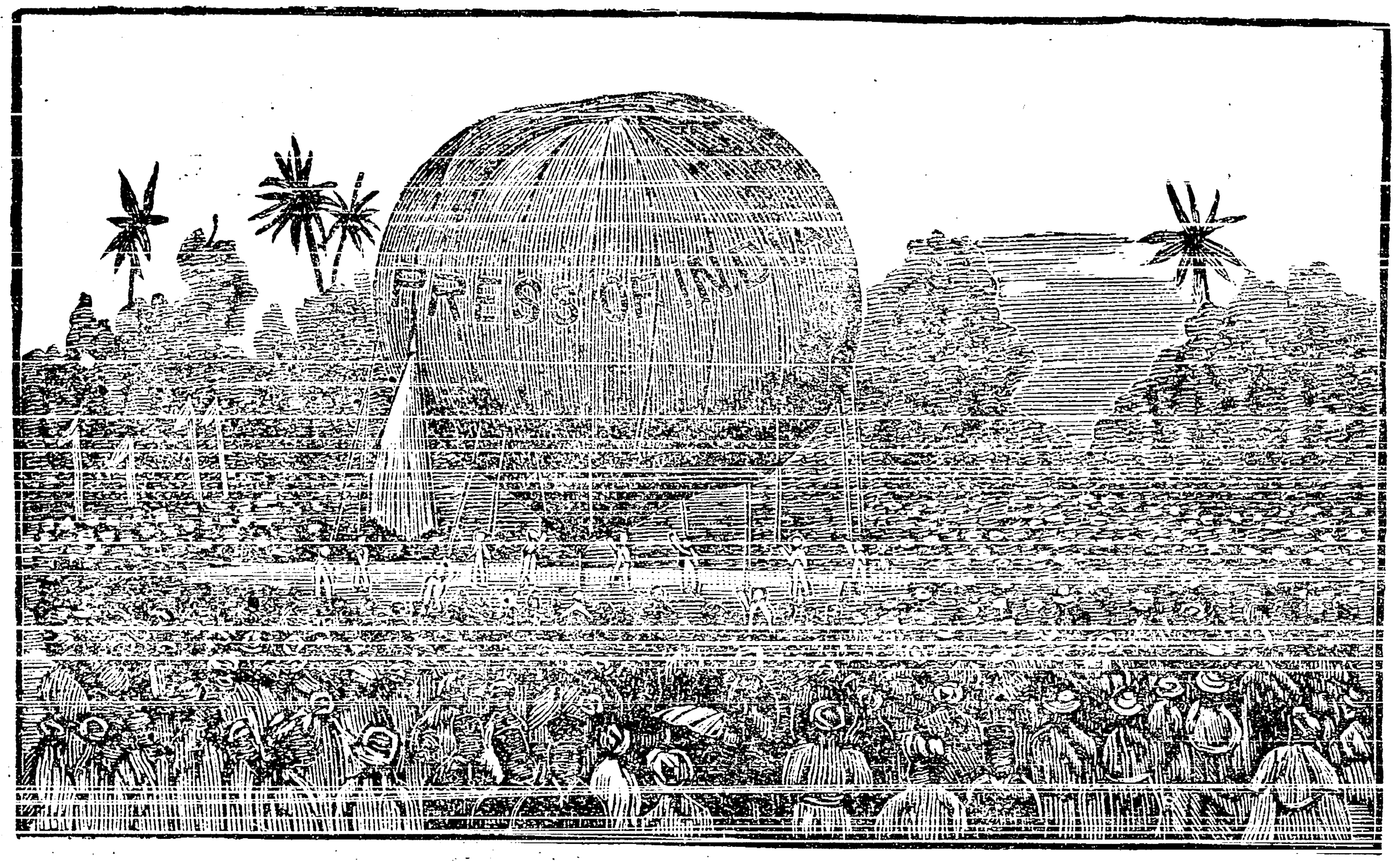

বেলুনে গ্যাস পূর্ণ করিবার সময়ে।

বেলুনের গ্যাস বাহির করিয়া দেওয়া যায়। বেলুনের উপরদিকে একটা বড় ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রের মুখে মুখে ঠিক আঁটিয়া বসিয়া যায় এমন একটা কপাট করা হয়, সেই কপাট স্প্রিংএর জোরে চাপিয়া ছিদ্রের মুখে আঁটিয়া থাকে। সেই কপাটের সঙ্গে একটা লম্বা দড়ি বাঁধা থাকে, বেলুনের নীচে যে লোক থাকে সে সেই দড়ি ধরিয়া থাকে। যখন বেলুনের গ্যাস বাহির করিয়া দিবার আবশ্যক হয়, তখন সে ঐ দড়ি ধরিয়া টানে। টানিলেই উপরের ভ্যাল্‌ভ অর্থাৎ কপাট ফাঁক হইয়া যায়, আর অমনি খানিকটা গ্যাস বাহির হইয়া যায়। বন্ধ করিবার সময় দড়ি ঢিল দিলেই হইল, স্প্রিংএর জোরে উপরের কবাট ছিদ্রের মুখে আঁটিয়া ছিদ্র বন্ধ করিয়া ফেলে।

আবার বেলুনে বালু পূর্ণ ছোট ছোট থলিয়া সঙ্গে করিয়া লইতে হয় বালুর বস্তা একটা দুটা ফেলিয়া দিলে বেলুন হাল্কা হইয়া যায়। তখন আরও উপরে উঠিতে থাকে।

এই কপাট ও বালুর বস্তার সাহয্যে বেলুনকে অনেকটা নিজের অধীনে রাখিয়া উপরে উঠাইতে বা নীচে নামাইতে পারা যায়। বেলুনের উপরে উঠার একটা সীমা থাকে। নীচের বাতাস যত ঘন উপরের বাতাস তত নহে। যত উপরে উঠা যায় বাতাস ততই আরো পাতলা হইয়া আইসে। নীচের বাতাস গ্যাস অপেক্ষা যত ভারি উপরের বাতাস তত নহে। কাযেই বাতাসের বেলুনকে উপরে উঠাইয়া রাখার ক্ষমতা এবং বেলুনের সর্ব্বসুদ্ধ ওজন এই উভয়ই যখন সমান হইয়া পড়ে তখন আর উপরে উঠিতে পারে না।

উপরে উঠিলে গ্যাসের আয়তন বাড়ে, এই জন্য যখন বেলুনে গ্যাস পূরা হয় তখন সম্পূর্ণ-রূপে পূর্ণ করা হয় না। বেলুন যখন আকাশে চলিতেছে তখন যদি তাহাতে গরম বাতাস লাগে বা সূর্য্যের প্রখর কিরণ পড়ে তবে ভিতরের গ্যাসের আয়তন বাড়িয়া যায়, বেলুন খুব ফুলিয়া উঠে, তখন বেলুন আরও উপরে উঠিতে থাকে। এই সময়ে

সেই কপাট খুলিয়া গ্যাস বাহির করিয়া দিলে বেলুন আর উপরে উঠে না। সময়ে সময়ে এমনও হয় যে গ্যাস বাহির করিয়া না দিলে বেলুন ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা। আবার গ্যাস কম হইয়া গেলে, অথবা বেলুনের গায় ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া গ্যাসের আয়তন কমিয়া গিয়া, অথবা মেঘের জলে ভিজিয়া ভারি হইয়া নামিতে থাকিলে, বেলুনের বালির বস্তা দু চারটা ফেলিয়া দিলে বেলুন হাল্কা করিলেই আবার বেলুন উপরে উঠিতে থাকে।

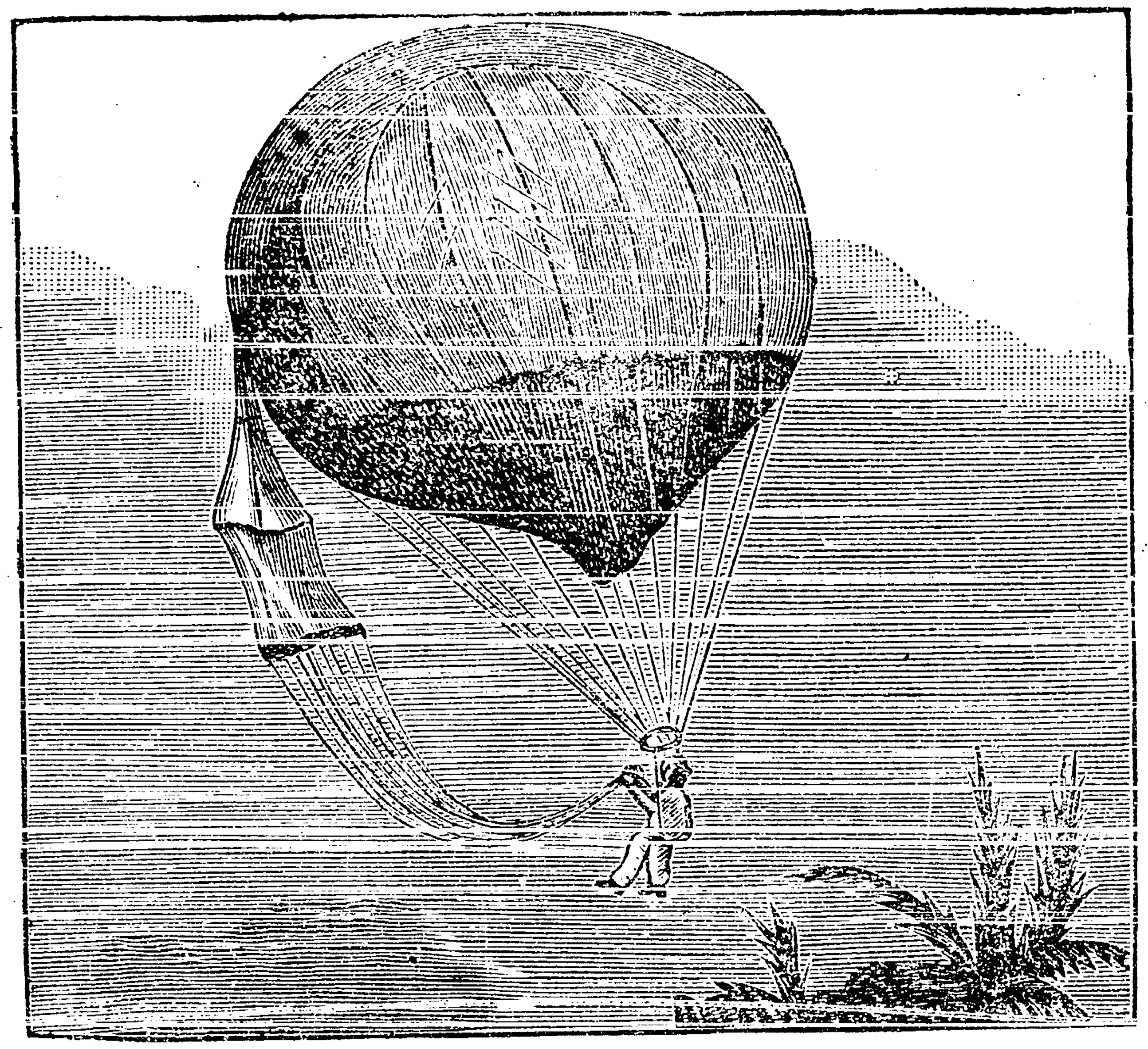

প্যারাসূট সহিত আরোহণ সময়ে।

বেলুনের ভারের প্রভেদ অতি অল্প হইলেও, গতির প্রভেদ অধিক হইয়া পড়ে। এক অঞ্জলি বালু ফেলিয়া দিলে বেলুন চার পাঁচ শত ফুট উপরে উঠিয়া যাইবে। একটা টাকা বেলুন হইতে ফেলিয়া দিলে ৬০ হাত উচ্চে বেলুন উঠিয়া যাইবে।

উপরের অবস্থা।

সচরাচর যাঁহারা বেলুনে উঠেন তাঁহারা দশহাজার হইতে চৌদ্দহাজার ফুট অর্থাৎ দুইমাইল হইতে তিন মাইলের মধ্যে উঠিয়া থাকেন। গেলুসাক ২২ হাজার ফুট অর্থাৎ প্রায় ৪৷৷০ মাইল উপরে উঠিয়াছিলেন। তিনি উঠিবার সময়ে নীচের উত্তাপ ৮২ ডিক্রি ছিল; ২২ হাজার ফুট উপরে ১৫ ডিক্রি মাত্র উত্তাপ ছিল। যত উপরে উঠা যায় ততই বেশী ঠাণ্ডা, কিন্তু হয়ত ১৬ হাজার ফুট উপরে যতটা গরম (অর্থাৎ ঠাণ্ডা) ১৮ হাজার ফুট উপরে তাহা অপেক্ষা অধিক গরম হইতে পারে। এই তারতম্যের কোন স্থিরতা নাই। কারণ আকাশের কোন স্থানে গরম বাতাস বহে কোন স্থানে ঠাণ্ডা বাতাস বহে। আবার মেঘ হইতেও সূর্য্যের উত্তাপ প্রতিঘাত হইয়া বেলুনে পড়িয়া তাহার উত্তাপ বৃদ্ধি করে। তবে মোটামুটী এই বলা যায় যে প্রত্যেক তিন শত ফুট উপরে এক ডিগ্রি করিয়া উত্তাপের হ্রাস হয়।

রবর্টসন এবং লোএষ্ট হ্যামবর্গ হইতে ২৫ হাজার ফুট অর্থাৎ পাঁচ ক্রোশ উপরে উঠিয়াছিলেন; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহ কক্সওয়েল ও গ্লেসিয়ারের মত অত উচ্চে উঠিতে পারেন নাই। ইহাঁরা ৩৭ হাজার ফুট অর্থাৎ সাত ক্রোশ উপরে, হিমালয়ের উচ্চতম শিখরের বহু উপরে উঠিয়াছিলেন। এত উপরে উঠিয়া ইহাঁরা অতি কষ্টে নিঃশ্বাস ফেলিতে ছিলেন। একজন অজ্ঞান হইয়া পড়েন, আর একজনের হাত পা অবশ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি ইহাঁরা নির্ব্বিঘ্নে পৃথিবীতে পৌঁছিয়াছিলেন। ৩৫ বা ৩৬ হাজার ফুট, প্রায় সাত মাইল, উপরে উঠা

যাইতে পারে। ইহার উপরে বেশী দূর উঠিলে মানুষ আর বাঁচিতে পারে না।

অবতরণ উপায়—প্যারাস্যুট।

বেলুন হইতে অবতরণ করাই কষ্টকর এবং যাহা কিছু বিপজ্জনক। ছাতার সাহায্যে লোকে অনায়াসে মেঘের নিকট, ৩ হাজার হইতে ৬ হাজার ফুট উপরে, বেলুন হইতে লাফাইয়া পড়িয়া নির্ব্বিঘ্নে ভূতলে অবতরণ করিয়াছে। এই ছাতা খুব শক্ত কাপড়ের তৈয়ার হয়। ইহার ডাঁট নাই। এবং যে যে স্থান হইতে ছাতার শীকের আগা বাহির হইয়া থাকে সেই সেই সকল স্থান হইতে লম্বা লম্বা দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দাও এবং সেই সব দড়ির আগাগুলি একত্র করিয়া বাঁধ এবং এই একত্রিত দড়ির আগায় এমন কোন জিনিস বাঁধিয়া দাও যাহাতে দাঁড়ান কিম্বা বসা যায়। তাহা হইলেই বেলুন হইতে নামিবার ছাতা হইল। এই ছাতার মাথায় একটা বড় ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্র না থাকিলেও কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না। বেলুন উঠিবার সময়ে এই ছাতাটী বন্ধ করিয়া ইহার মাথা বেলুনে আটকাইয়া দিয়া, উপরে লইয়া যাইতে হয়। তৎপরে নামিবার সময়ে ছাতাকে বেলুন হইতে খুলিয়া লইয়া সেই একত্রিত রজ্জুগুলির আগা ধরিয়া লাফাইয়া পড়িলে অথবা সেই বসিবার বা দাঁড়াইবার স্থানে গিয়া বসিয়া বা দাঁড়াইয়া বেলুনের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেই হইল।

এইরূপ ছাতাকে প্যারাস্যুট বলে। প্যারাস্যুটের সাহায্যে উচ্চ হইতে লাফাইয়া নীচে অবতরণ করা বহুকাল পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে। মঙ্ক মেসন সাহেব বলেন যে কোন ফরাসী ধর্ম্মপ্রচারক ব্রহ্মদেশের দক্ষিণে শায়াম বা শ্যাম রাজ্যে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে প্যারাস্যুট বহুলরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছিলেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে নর্ম্মাণ্ড সাহেব তাঁহার খুব উচ্চ বাড়ীর ছাতের উপর হইতে এই ছত্র অবলম্বন করিয়া লাফ দিয়া নির্ব্বিঘ্নে ভূমিতে অবতরণ করিয়াছিলেন। একটী বালিকা ছাদ হইতে পড়িয়া তাহার ঘাঘরার জন্য বাঁচিয়া গিয়াছিল।

প্যারাস্যুট কি নিয়মে কার্য্য করে।

জল বা বায়ুর মধ্যে যদি সমান ওজনের অথচ ভিন্ন আয়তনের দুটী বস্তুকে নাড়া যায় অথবা বেগে ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া যায় তবে যে জিনিসের আয়তন বেশী সেটা অধিক পরিমাণে জল বা বায়ু হইতে বাধা পাইবে। একখণ্ড বড় কাগজকে অনেকবার ভাঁজ করিয়া তাহার আকার ছোট করিয়া ফেলিয়া দিলে যত শীঘ্র পড়ে, ভাঁজ না করিয়া সেই কাগজ ফেলিয়া দিলে তত শীঘ্র পড়িবে না। ঝড়ের সময়ে ছাতা বন্ধ করিয়া ঝড়ের মুখে গেলে অনায়াসে যাওয়া যায়। কিন্তু ছাতা খুলিয়া ঝড়ের মুখে যাওয়া অতি কষ্টকর এবং সময়ে সময়ে অসম্ভব হইয়া উঠে। তাহার কারণ খোলা ছাতার ওজন সমান হইলেও বন্ধ ছাতা অপেক্ষা আয়তন অধিক, সেই জন্য অধিক বাধা পায়। একটা বন্ধ ছাতা উপর হইতে যত শীঘ্র পড়িবে খোলা ছাতা তত শীঘ্র পড়িবে না। প্যারাস্যুটও এই নিয়মে কার্য্য করে। প্যারাস্যুট গুটাইয়া (ছাতা বন্ধ করিয়া) উপরে উঠিতে হয়। পড়িবার সময়ে প্যারাস্যুট (ছাতা) খুলিয়া যায় তখন আর প্যারাস্যুট খুব বেগে পড়িতে পায় না। ধীরে ধীরে নামিয়া আইসে।

স্পেন্সার সাহেবের দুই হাজার ফুট উপর হইতে লম্ফ।

পার্সিভাল স্পেনসার অবিবাহিত ইংরাজ যুবক, বয়স অনুমান ২৬।২৭ বৎসর। ইহার মধ্যেই ইনি ৯১ বার বেলুনে উঠিয়াছেন, কিন্তু ৮ বার

ছাতার সাহায্যে বেলুন হইতে ভূতলে লাফাইয়া পড়িয়াছেন। ইহাঁর পিতাও একজন প্রসিদ্ধ বেলুনবাজ। বেলুন তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করা ইহাঁদের ব্যবসা। ইনি গত ২৭শে জানুয়ারি বোম্বাই নগরে, তাঁহার "এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া" নামক বেলুনে উঠিয়া প্রায় দুই হাজার ফুট উচ্চ হইতে প্যারাস্যুট লইয়া লাফাইয়া নির্ব্বিঘ্নে ভূতলে অবতরণ করেন। এরূপ কাণ্ড ভারতবর্ষে এই প্রথম। বোম্বাই নগরে বেলুনে উঠা ও ভূতলে অবতীর্ণ হওয়ার ছবি দিলাম। ছবি দেখিলেই সব বুঝিতে পারিবে। বেলুন ১৭৬০ ফুট উপরে উঠিলে তিনি প্যারাস্যুটের কড়া ধরিয়া লাফাইয়া পড়েন। ১৫০ ফুট পর্য্যন্ত খুব প্রচণ্ড বেগে পতিত হইয়াছিলেন। তখনও ছাতা খুলিয়া যায় নাই। তার পরক্ষণেই ছাতা খুলিয়া গেল এবং তিনি ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িলেন। ইহাঁর প্যারাস্যুটের ব্যাস ২৫ ফুট। খুব শক্ত ও পুরু রেসমের কাপড়ে নির্ম্মিত। ইহার ওজন ১৪ সের মাত্র। ইহা বেলুনে একটা সরু দড়ি দিয়া বাঁধা থাকে। সে দড়িতে একমণ ভার পড়িলেই দড়ী ছিঁড়িয়া যায়। স্পেন্সার সাহেবের ভার দুইমণ হইবে। কাযেই তিনি যখন বেলুন ছাড়িয়া প্যারাস্যুট ধরিয়া ঝুলিয়া পড়েন, তখন বাঁধের দড়ি ছিঁড়িয়া গিয়া বেলুন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া যায়। বেলুন উড়িয়া যাইতে থাকে। এ বেলুনে "সেফ্‌টী ভ্যাল্‌ভ" অর্থাৎ গ্যাস বাহির করিয়া দিবার দ্বার নাই। কিন্তু বেলুনের উপর দিকটা ভারি; স্পেনসার সাহেব যেই বেলুন ছাড়িয়া নামিয়া যান অমনি উপর দিক্‌টা আপন ভারে নীচের দিকে হইয়া যায়, ও বেলুনের মুখ ঘুরিয়া উপরদিকে উঠিয়া যায়। বেলুনের মুখ বাঁধা থাকে না। মুখ খোলা থাকিলেও যতক্ষণ নীচের দিকে থাকে ততক্ষণ গ্যাস বাহির হয় না, যেই মুখ উপরদিকে হইয়া যায় অমনি গ্যাস বাহির হইয়া যাইতে থাকে। খানিক পরেই বেলুন

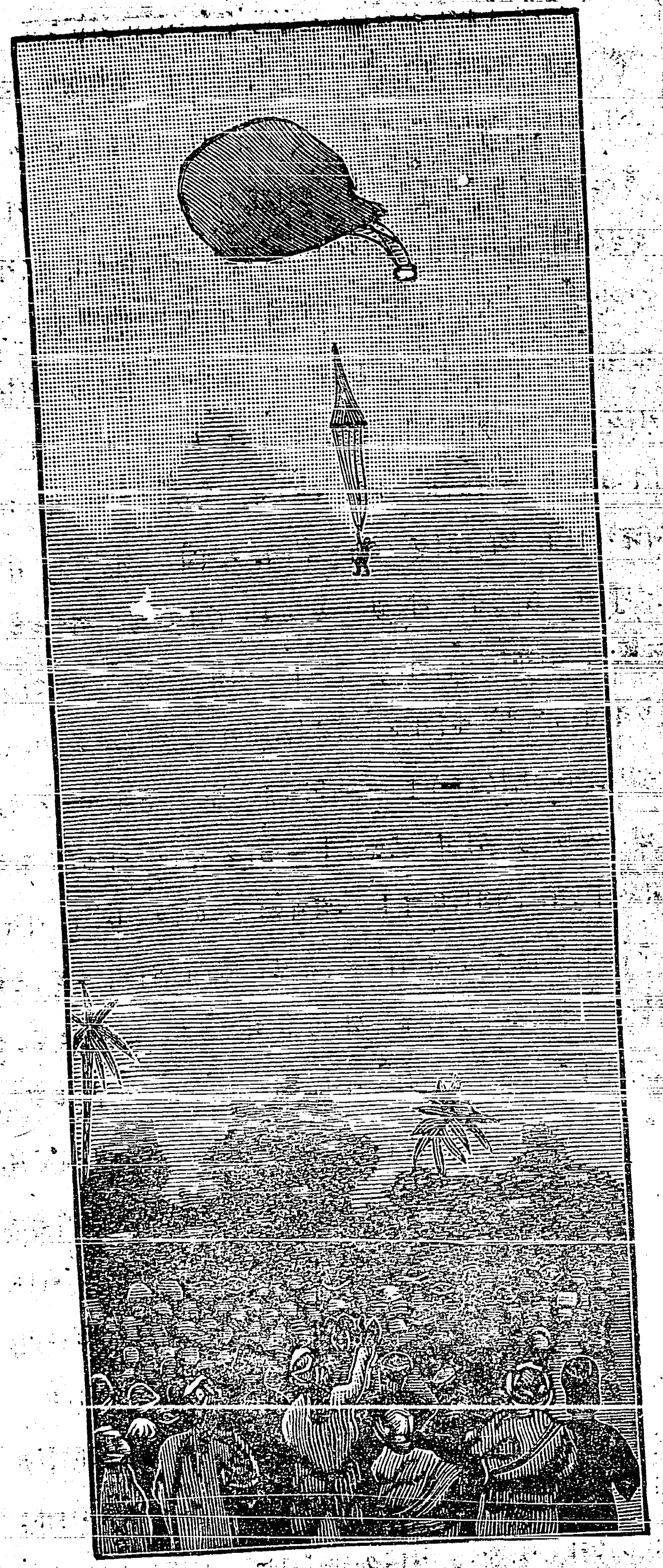

বেলুন হইতে পতন সময়ে।

মাটিতে পড়িয়া যায় তখন সেটা খুঁজিয়া কুড়াইয়া আনিতে হয়।

সেইথানে এই বাজী দেখাইয়া কলিকাতায় আইসেন।

প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে স্পেন্সার সাহেব কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বালীগঞ্জের মাঠে বেলুনে আরোহণ করিয়া প্যারাসুটের সাহায্যে ২,০০০ ফুট উচ্চ হইতে বেলুন পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। সেবার স্পেন্সার সাহেব উপযুক্ত গ্যাস অভাবে বহু চেষ্টা করিয়াও বেলুনে চড়িয়া আকাশে উঠিতে পারেন নাই। পার্শিভাল স্পেন্সার তারপর আবার এক বিজ্ঞাপন প্রচার করেন যে, তিনি ১৯এ মার্চ্চ মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৫॥০ টার সময় গড়ের মাঠে বেলুনে চড়িয়া শূন্যে উঠিয়া মেঘান্তরাল হইতে ভূতলে লাফাইয়া পড়িবেন। এই বিজ্ঞাপন প্রচার হইবার পর, কলিকাতার সকল লোকেই এবার স্পেন্সার সাহেবের উদ্যমের ফলাফল জানিবার জন্য, অত্যন্ত ব্যগ্র হয়েন। তাই কলিকাতায় মহা ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। অপরাহ্ন ৫॥০ টার সময় অকাশে উঠিবার কথা,—কিন্তু ১টার পূর্ব্ব হইতেই ঝাঁকে ঝাঁকে লোক গড়ের মাঠের জড় হইতে লাগিল। বড় রাস্তা সমুদায় লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া পাওয়া দুষ্কর হইল, ট্রামওয়ের গাড়ী লোকের ভারে ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল। যাঁহারা গড়ের মাঠে যাইতে পারেন নাই তাঁহারা আপন আপন গৃহের ছাদে দাঁড়াইয়া বেলুন দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া চাহিয়া রহিলেন! জাহাজের মাস্তুলে কত লোক, কেল্লার উপর কত লোক, মনুমেণ্টের উপর কত লোক, ঘরের চালে লোক, মাঠে হাজার হাজার লোক গিজগিজ করিতেছে। গড়ের মাঠে এক লক্ষের উপর লোক ছিল। ৫টা ১৫ মিনিটের সময় বড়লাট, তাঁহার স্ত্রীও দলবলসহ ময়দানে উপস্থিত হন। ৫ টার সময়ে উঠিবার কথা ৫॥০টা হইয়া গেল তথাপি বেলুন উঠিল না দর্শকগণ অধীর হইয়া উঠিল। সকলে তাঁহাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। কত লোকে কত প্রকার উপহাস করিতে লাগিল। ৬টার সময় তিনি প্যারাসুট লইয়া বেলুনে উঠিলেন। স্পেন্সার বেলুনে চড়িয়াই তাহা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। বেলুন কয়েক হাত উপরে উঠিয়াই হেলিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। তিনি সহকারীদিগকে দড়ি ধরিয়া বেলুন টানিয়া নামাইতে বলিলেন। তিনি দেখিলেন ছাতার ভারে বেলুন উঠিতে পারিতেছে না। তৎক্ষণাৎ ছাতা ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু ছাতা ফেলিয়া আকাশে উঠা যে বড় বিপজ্জনক তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। ছাতা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ব্যোমযান ছাড়িয়া দেও।" দড়ি ছাড়িবামাত্র বেলুনটী খাড়া হইয়া প্রবলবেগে হাউইর মত হুস করিয়া আকাশে উঠিয়া গেল। স্পেন্সার সাহেব নির্ভয়ে প্রফুল্ল চিত্তে মাথার টুপি খুলিয়া তাহা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সাধারণকে অভিবাদন করিতে করিতে বিদায় লইতে লাগিলেন।

চারিদিকে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। সমুদায় গড়ের মাঠের, কলিকাতা সহরের এক ধার হইতে অপর ধার পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানের লোক হাততালি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

বেলুন প্রথমে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে উঠিতেছিল, কিন্তু উর্দ্ধের বায়ুর গতি ভিন্ন দিকে হওয়ায় উত্তর পূর্ব্ব মুখে উঠিতে লাগিল। ৫।৬ মিনিটের মধ্যে বেলুনটী ৪।৫ হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিয়া একটা ক্ষুদ্র বলের মত দেখাইতে লাগিল। তারপর ক্রমে ২০।২৫ মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। যতক্ষণ দেখা গিয়াছিল তাহার মধ্যে তিনি ৬০০০ ফুট উপরে মেঘ ছাড়াইয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন।

স্পেন্সার সাহেব আর নামিলেন না। তিনি যে জীবিত অবস্থায় কখনও আর নামিতে পারিবেন সে বিষয়ে সকলেই সন্দেহ করিতে লাগিল। সক-

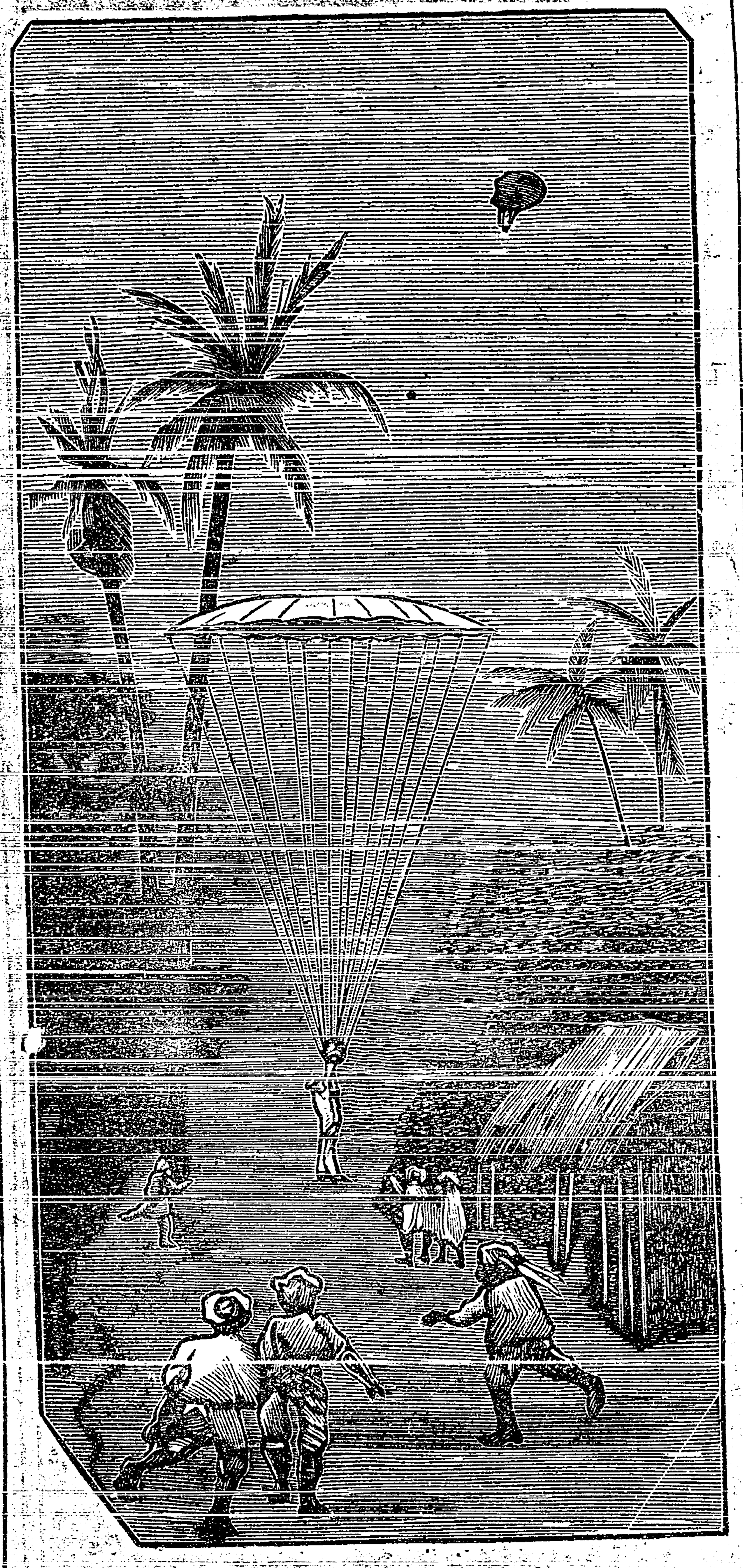

ভূমিতে অবতরণ সময়ে।

লেই মনে করিল তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার আর বাঁচিবার আশা নাই।

আকাশে যত উর্দ্ধে উঠা যায়, ততই শীত ভীষণতর হইয়া উঠে। শীতেই হয়ত তিনি বাঁচিবেন না। যদিও বা শীতে বাঁচেন, অনাহারে প্রাণ বাহির হইবে। হয়ত পড়িয়াই মরিয়া যাইবেন! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সকলের মন বিষাদে পূর্ণ হইল। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। চতুর্দ্দিকে সংবাদ প্রেরিত হইল জীবিত বা মৃত, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে অবস্থায় যেখানে তাঁহাকে পাওয়া যায় অমনি সে সংবাদ যেন কলিকাতায় তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হয়। মঙ্গলবার সমস্ত রাত্রে কোন সংবাদ পাওয়া গেল না; বুধবার সমস্ত দিনেও কোন ঠিক খবর পাওয়া গেল না; যাহা পাওয়া যায় তাহাও মিথ্যা হইয়া যায়। বুধবার রাত্রেও কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। সকলেই মনে করিল তিনি আর জীবিত নহেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোন ঠিক খবর নাই। সকলেই উদ্বিগ্ন, সকলেই নিরাশ। সন্ধ্যার পর খবর আসিল যে তিনি হোসেনাবাদ নামক স্থানে নিরাপদে অবতরণ করিয়াছেন। শুক্রবার প্রত্যুষে ৪॥০ ঘটিকার সময়ে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছেন।

আত্ম কাহিনী।

স্পেন্সার বলেন "ছাতা না লইয়া উঠিলেও আমার ভয়ের কোন কারণ ছিল না। আমি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়াই ছাতা না লইয়া উঠিয়াছিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্যোমযান আকাশে উঠিলে আমি উত্তর দিকে চলিতে লাগিলাম। মনুমেণ্ট পর্য্যন্ত পৌঁছিবামাত্র বাতাসের গতি ফিরিল। আমি বালীগঞ্জের দিকে চলিলাম; ব্যোমযান তাড়িৎ বেগে উর্দ্ধদিকে যাইতে লাগিল। যখন বালীগঞ্জ যাই, তখন ৬ হাজার ফিট উপরে উঠিয়াছিলাম। বেলুন ক্রমেই আরও উঠিতেছিল। তখন ঘন মেঘের মধ্যে গিয়া পৌঁছিলাম। চারিদিকে কিছুই

দেখিতে পাইলাম না। শীতে হাত পা অবসন্ন হইতে লাগিল। একবার দড়ীতে ভর করিয়া দাঁড়াইলাম, আবার বসিয়া দুই হাত ঘসিয়া গরম করিতে লাগিলাম। তার পর দেখিলাম বাঁ পা অসাড় হইয়া গিয়াছে, চারিদিকে পা ছুড়িতে লাগিলাম। তখনও উপরে যাইতেছি। তখন প্রায় ১৩ হাজার ফিট উপরে উঠিয়াছি। তখন দেখিলাম বেলুনের মুখ দিয়া গ্যাস বাহির হইতেছে। এবার বেলুন ক্রমাগত নিম্নদিকে যাইতেছে। তখন খুব অন্ধকার হইয়াছিল. কিন্তু জল ও স্থলে প্রভেদ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। ৭৷৷০ টার সময় আমি মাটির নিকট পৌছিলাম। তখন বেলুনের দড়ি ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িলাম। এবং মৃত্তিকা স্পর্শ করিবামাত্র মাটিতে দাঁড়াইলাম, ব্যোমযান অমনি আবার শূণ্যে উঠিয়া গেল।

আমি ভূতলে নামিয়া দেখি, এক ক্ষুদ্র দ্বীপে আসিয়া পড়িয়াছি; কিন্তু শরীরে একটী আঁচড়ও লাগে নাই। দূরে একটা আলো দেখিতে পাইলাম, সেই দিকে চলিলাম কিন্তু সম্মুখে জল দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। আর একটা আলো দেখিয়া সেই দিকে চলিলাম—সে. দিকেও জল রহিয়াছে দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। আবার একটা আলো দেখিয়া সেই দিকে চলিলাম। এদিকে জল ছিল না। এখানে এক বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। সকলেই হঠাৎ আমাকে দেখিয়া ভূত মনে করিয়াছিল। তাহারা আমাকে দুধচিড়া খাইতে দিল আমার তাহা ভাল লাগিল না। রাত্রে ঐখানে তাহাদের বাড়ীর বারান্দায় নিদ্রা গেলাম। পরদিন (বুধবার) প্রাতঃকালে রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময়ে হোসনাবাদ থানায় পৌছিলাম। সে রাত্রে থানায় নিদ্রা গিয়া বৃহস্পতিবার ১২ টার সময়ে তথা হইতে রওনা হইয়া ৪টার সময়ে বসীরহাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুর বাসায় পৌছি। তিনি আমায় অতি যত্ন করেন। রাত্র ৯টার সময়ে গাড়ী করিয়া বারাসত ষ্টেশনে আসিতেছিলাম পথিমধ্যে ষ্টেটসম্যানের সংবাদ পত্রের লোকের সহিত দেখা হয়। তৎপরে তাঁহাদের স্পেসাল ট্রেনে আসিলাম। দেড় ঘণ্টা মাত্র বেলুনে ছিলাম। খবর দিবার কোন সুবিধা ছিল না বলিয়া খবর দিতে পারি নাই।"

বেলুনে চড়িয়া আকাশে ভ্রমণ করা লোকে যতটা বিদজ্জনক মনে করে বাস্তবিক তাহা নহে। আজপর্য্যন্ত বেলুনে করিয়া যতবার যতলোক উঠিয়াছে তাহাদের মধ্যে বিপদ অতি অল্পই ঘটিয়াছে। এমন কি সমুদ্রে জাহাজেও ইহা অপেক্ষা অধিক বিপদ ঘটিয়া থাকে।

মার্কিনদেশের ওয়াইজ সাহেব আরও অদ্ভুত কাণ্ড দেখাইতেন। তিনি ছাতা লইয়া উঠিতেন না। বেলুন ১৩ হাজার ফুট উপরে উঠিলেই বেলুনটীকে ফাটাইয়া দিতেন। ফাটিয়া যাইবা মাত্র আরোহী সমেত বেলুন অতি বেগে পড়িয়া যাইতে থাকে, পড়িতে পড়িতে বেলুনে বাতাস লাগিয়া বেলুন একটী খোলা ছাতার আকার ধারণ করে। তখন বাতাসে বাধা পাইয়া আর বেগে নামিতে পারে না। ধীরে ধীরে নামিয়া আইসে। ওয়াইজ সাহেব এইরূপে অনেকবার নামিয়াছেন একবারও অকৃতকার্য্য হয়েন নাই। ইহাঁর কাণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত।

প্যারাসুট লইয়া যত উপর হইতে পড়া যায় ততই বিপদের কম আশঙ্কা, অতি নিকট হইতে পড়িলে ছাতা খুলিয়া যাইবার পূর্ব্বেই হয়ত মাটীতে পড়িয়া শরীর চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে।

আমেরিকাদেশে বেলুন তৈয়ার হইতেছে তাহাতে চাকা, কল, পাইল প্রভৃতি থাকে তাহাকে জাহাজের মত যে দিক ইচ্ছা সে দিকে চালান যাইতে পারে।

সখা।
সপ্তম ভাগ। চতুর্থ সংখ্যা।
এপ্রিল, ১৮৮৯।

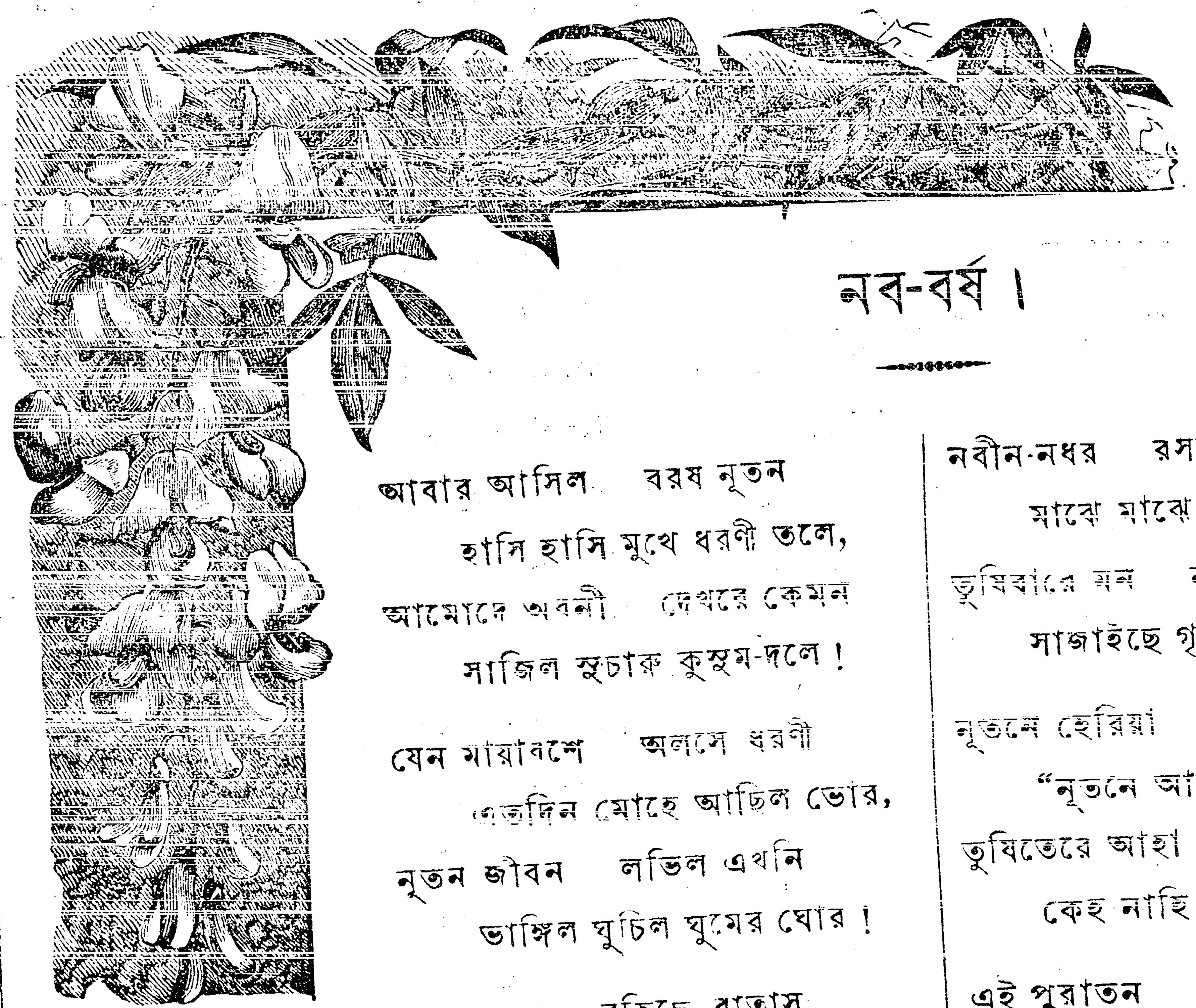

নব-বর্ষ।

আবার আসিল বরষ নূতন
হাসি হাসি মুখে ধরণী তলে,
আমোদে অবনী দেখরে কেমন
সাজিল সুচারু কুসুম-দলে!

যেন মায়াবশে অলসে ধরণী
এতদিন মোহে আছিল ভোর,
নূতন জীবন লভিল এখনি
ভাঙ্গিল ঘুচিল ঘুমের ঘোর!

মৃদুল-মধুর বহিছে বাতাস
পাখীগণে করে মধুর গান,
নূতনে হেরিয়া সবারি উল্লাস
নূতন আমোদে মাতিল প্রাণ!

নূতন কুসুম করিয়া চয়ন
যতনে ভরিয়া নূতন-ডালা,
সাদরে নূতনে করিতে বরণ
শিশুগুলি গাঁথে কুসুম-মালা!

নবীন-নধর রসাল-পাতার
মাঝে মাঝে গাঁথি নূতন ফুল,
তুষিবারে মন নূতন রাজার
সাজাইছে গৃহ মানব-কুল!

নূতনে হেরিয়া সবে হরষিত,
"নূতনে আদর সবাই করে"!
তুষিতেরে আহা পুরাতন চিত
কেহ নাহি ভাবে তিলের তরে!

এই পুরাতন ছিলত নূতন
এক দিন ভাই ইহার মত!
তবে হে বলনা কিহেতু এখন
হতাদর তারে করিছ এত?

আমরাত ভাই নব পুরাতন
সমানে, আদর করিব দান!
পুরাতন "সখা" শিখাল যেমন
নূতন "সখায়" বাড়াবে জ্ঞান!

করি এ কামনা—যেনরে সতত
নূতন বরষে হরষে রই !
পুরাতন বর্ষে শিখাইল যত
মনে গেঁথে রেখে অভিজ্ঞ হই !

বিবিধ ।

ফরাসী কবি মলিয়ার কোন ভিক্ষুককে ভ্রম ক্রমে একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। ভিক্ষুক স্বর্ণ মুদ্রাটী তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া কহিল,—"মহাশয় আপনার, বোধ হয়, ভ্রম হইয়া থাকিবে।" মলিয়ার আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাহাকে আর একটী রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিয়া কহিলেন,—"বন্ধু, উহার সহিত এটীও গ্রহণ কর।" জগতে এই রূপেই সাধুতার পুরস্কার হইয়া থাকে।

* *
*

জর্ম্মনির কোন রাজ দরবারেও এরূপ একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল।

এই রাজা বড় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। কোন দরিদ্র গায়কের মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা পত্নী তাহার কন্যার সহিত আসিয়া এই রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। রাজা মলিন মুখ ও চক্ষের জল দেখিয়া তাহার দারিদ্র্য বুঝিতে পারিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন কি পরিমাণ সাহায্য হইলে বিধবার অভাব মোচন হইতে পারে।

বিধবা কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া ভগ্ন স্বরে কহিল, "যুবরাজ, পাঁচটি মুদ্রা হইলেই আমাদিগের দুরবস্থা দূর হইতে পারে।"

রাজা তৎক্ষণাৎ কাগজে দানের কথা লিখিয়া বলিলেন ;—"এই কাগজ লইয়া ধনাধ্যক্ষের নিকট যাও তোমার প্রার্থিত ৫টী স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইবে।"

বিধবা ধনাধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইলে ধনাধ্যক্ষ ৫০টী মুদ্রা গণিয়া কহিলেন—"এই রসিদে নাম সই করিয়া তোমার প্রাপ্য গ্রহণ কর। বিধবা এত অধিক টাকা দেখিয়া কহিল—"মহাশয় বোধ হয় আপনার ভুল হইয়া থাকিবে; আমি পাঁচটী মাত্র মুদ্রা চাহিয়াছিলাম। ধনাধ্যক্ষ কাগজ পড়িয়া দেখিলেন কাগজে ৫০টী মুদ্রার কথাই লেখা আছে। তখন তিনি বিধবাকে কহিলেন,—"আমার ভুল হয় নাই, রাজা তোমাকে ৫০টী মুদ্রাই দান করিয়াছেন।" কিন্তু বিধবা ৫টী মুদ্রার অধিক লইতে কিছুতেই স্বীকার না করায় ধনাধ্যক্ষ রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন।

রাজা কাগজ পড়িয়া কহিলেন—"হাঁ আমার একটা শূন্য ভুল হইয়াছিল। আমার প্রচুর অর্থ থাকিলে আরও একটী শূন্য বসাইয়া দিতাম। আচ্ছা! তুমি বিধবাকে ১০০ মুদ্রা প্রদান কর! কিন্তু ইহাতে এরূপ ন্যায়পরতার উপযুক্ত পুরস্কার হইল না!"

বিধবা এই দান পাইয়া অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইল। এবং আপনার কন্যার সহিত একটী ক্ষুদ্র ব্যবসা আরম্ভ করিল। তাহার ব্যবসায় অচিরেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিল। বিধবা যেন এই অর্থের সহিত ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল।

* *
*

শ্যাম প্রদেশে এক ব্যক্তির সমস্ত দেহ বড় বড় লোমে আচ্ছাদিত ছিল। মুখে খুব দাড়ি গোঁফ ছিল; নাক, কান, কপালও লোমে ভরা ছিল।

কাপড় পরিয়া থাকিলে বোধ হইত যেন একটা খুব বড় বিলাতি কুকুর কাপড় পরিয়া ভদ্র হইয়া বসিয়া আছে। এই লোকটার শরীর পশুচর্ম্মে আচ্ছাদিত থাকিলেও ইহার বিদ্যা বুদ্ধি অন্যান্য মনুষ্য অপেক্ষা হীন ছিল না। ইহার কন্যার শরীরেও এই প্রকার বড় বড় লোম জন্মিয়াছিল। তাহারও সমস্ত মুখ লোমে একেবারে আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল। লোকের নির্য্যাতন ভয়ে ইহাদিগকে লুকাইয়া থাকিতে হইত। শ্যামের রাজা ইহাদিগের ভরণ-পোষণের সাহায্য করিতেন।

এ অনেক দিনের কথা,—এখন ইহাদের বংশের ঐরূপ কেহ জীবিত আছে কি না জানি না, কিন্তু ফরাশী দেশে আর একজন লোক আছে তাহার নাকে কপালে লোম না থাকিলেও তাহার যে দাড়ি-টুকু আছে তাহা শুনিলেই অবাক হইতে হয়! ইহার নাম লুই গূলঁ। শ্রমজীবীর কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সে যখন ১২ বৎসরের বালক তখন তাহার দাড়ি হন্ হন্ করিয়া গজাইয়া উঠে। দুই বৎসর পরেই এক ফুটের উপর লম্বা হইয়া পড়ে। এখন তাহার ৬২ বৎসর বয়স। দাড়ি ছয় হাত হইয়াছে এবং ক্রমেই বাড়িতেছে।

সে দাড়ি ছাঁটিবে না। কত বড় হইতে পারে তাহাই সে দেখিবে। এরূপ দাড়ি লইয়া হাঁটাই দুষ্কর। চলিবার সময়ে বাবুরা যেমন কাপড়ের কোঁচা হাতে ধরিয়া চলেন, সে নিজের দাড়িটিকেও তেমন করিয়া ধরিয়া চলে। বসিয়া থাকিলে বা কাজ কর্ম্মের সময়ে কম্ফর্টারের মত করিয়া দাড়িটীকে গলায় জড়াইয়া রাখে। আমরা এই দুই অবস্থারই ছবি দিলাম।

* *
*

দুইটী বালক মাঠে বেড়াইতেছিল।

একজন বলিল "পৃথিবীর সমুদায় মাঠ যদি আমার হইত তাহা হইলে কি সুখের হইত!"

অপর জন বলিল "পৃথিবীর যদি সমুদায় পশু-পাল আমার হইত তাহা হইলে ভারি মজা করিতাম?

১ম বা। তাহা হইলে কি করিতে ?
২য় বা। তোমার মাঠে চরাইতাম।
১ম বা। না, তা চরাবে কেন ?
২য় বা। চরাইব না কেন ?
১ম বা। আমি তোমাকে চরাইতে দিব না।
২য় বা। আমি সে জন্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব না।
১ম বা। তোমার এরূপ করা উচিত নয়।
২য় বা। এক শ বার উচিত।

১ম বা। আমি চরাতে দিলে তো!

২য় বা। আমি চ রা ই ব!

ইহার পরই উভয়ের হাতাহাতি আরম্ভ হইল। সংসারের অধিকাংশ বিবাদেরই এইরূপ সূত্রপাত হয়।

এলিজাবেথ ফ্রাই।

(৩১ পৃষ্ঠার পর)

(এলিজাবেথ ফ্রাইএর জীবনী আমরা এইবারেই শেষ করিয়া দিতাম। কিন্তু বিশেষ কারণে তাহা হইল না। জন-ব্রাইটের অল্পদিন হইল মৃত্যু হইয়াছে, এ সংখ্যায় তাঁহার জীবনী আমাদিগকে দিতে হইয়াছে। এলিজাবেথ ফ্রাই আগামীবারে শেষ হইবে।)

কারাগারের যখন এই প্রকার শোচনীয় দুর্দ্দশা তখন এলিজাবেথ ফ্রাই কারা-সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা হাউয়ার্ডের আজীবন চেষ্টা ও যত্নে, কারাবাসীদিগের দুর্দ্দশা কতক পরিমাণে দূর হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু সুশৃঙ্খলা ও সুবন্দোবস্তের অভাবে এবং কারাবাসী ও কারাবাসিনীদিগকে কোন প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত না রাখাতে, হাউয়ার্ডের জীবন-ব্যাপী চেষ্টায়ও আশানুরূপ ফল হয় নাই। হাউয়ার্ড কারাবাসীদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচনের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন; এলিজাবেথ ফ্রাই তাঁহারই প্রদর্শিত পথে চলিয়া, কারাবাসীদিগের শোচনীয় অবস্থার কতদূর উন্নতি করিয়াছিলেন, চিন্তা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

এলিজাবেথ ফ্রাই যখন নিউগেট্ কারাগারের সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, সেই সময়ে তাঁহার কয়েকটী আত্মীয়ের মৃত্যু হয়। তিনি নিজেও অনেক দিন পর্য্যন্ত রোগে শয্যাগত হইয়া থাকেন এবং আরও কতকগুলি দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু এই সকল দুর্ঘটনায় তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। এই সময়ে তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়স্কা কন্যাটীর মৃত্যু হয়; কন্যাটীর মৃত্যুতে এলিজাবেথ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মৃত্যুর পর, কুপথগামী অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদিগকে সুপথে আনিবার জন্য তাঁহার প্রাণ অধিকতর আকুল হইয়া উঠিল; তাহাদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য তাঁহার প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠিল।

শুভক্ষণে এলিজাবেথ ফ্রাই নিউগেট্ কারাগারে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এক জন স্ত্রীলোকের চেষ্টায় জগতের কত দুঃখ দুর্দ্দশা দূর হইয়াছিল, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এলিজাবেথ নিউগেট্ কারাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কারাগারের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। তিনি দেখিলেন কারাগারের মধ্যে বিন্দুমাত্র শৃঙ্খলা নাই; অনেক স্থলে স্ত্রী এবং পুরুষ কয়েদীদিগকে একত্রেই রাখা হইয়াছে, তাহাদের পৃথক থাকিবার স্থান নাই। স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, বৃদ্ধ যুবা, অল্প বয়স্ক অধিক বয়স্ক, সকলকেই একত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। যাহাদিগের অপরাধের বিচার হয় নাই, তাহাদিগকেও এই অপরাধীদিগের মধ্যে, অপরাধীর ন্যায় আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। যাহারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী তাহাদিগকেও যে স্থানে রাখা হইয়াছে, যাহারা অতি সামান্য অপরাধের জন্য জেলে গিয়াছে, তাহাদিগকেও সেই স্থানে রাখা হইয়াছে। অল্প

বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে, শত অপরাধে এবং সহস্র কুকার্য্যে যাহারা পশুর সমান হইয়া গিয়াছে তাহাদিগের মধ্যেই রাখা হইয়াছে। এই কোমলমতি বালক বালিকারা হয়ত অতি সামান্য অপরাধে জেলে গিয়াছিল; ইহাদিগের চরিত্র সংশোধন করিবার চেষ্টা করিলে, হয়ত ইহারা কারামুক্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া, সৎপথে থাকিয়া জীবন যাপন করিতে পারিত; কিন্তু এই সকল পশু প্রকৃতি লোকের সংসর্গে ইহাদিগের সমস্ত সৎ প্রবৃত্তি নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে, বালকের সরল ও কোমল প্রকৃতি, কুশিক্ষা এবং অসৎ দৃষ্টান্তে কঠিন ও পশুর সমান হইয়া গিয়াছে। কারামুক্ত হইয়া আবার গুরুতর অপরাধের জন্য কারাবদ্ধ হইতেছে। একবার যে অতি সামান্য অপরাধে কারাবদ্ধ হইতেছে, চিরজীবনের মত তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে। এলিজাবেথ হতভাগ্য কারাবাসী ও কারাবাসিনীদিগের এই শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া একান্ত ব্যথিত হইলেন। কি উপায়ে ইহাদিগের এই দুর্দ্দশা দূর করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোক হইয়া তিনি এ গুরুতর কার্য্য কি প্রকারে সম্পন্ন করিবেন, তাহা চিন্তা করিয়া সময় সময় নিরাশ হইতেন। যাহা হউক ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া এলিজাবেথ প্রথমতঃ স্ত্রী-কয়েদী এবং বালক বালিকাদিগের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি দেখিলেন সর্ব্ব প্রথমে ইহাদিগের পৃথক পৃথক থাকিবার বন্দোবস্ত করা নিতান্ত আবশ্যক। কারাগারের অধ্যক্ষগণ প্রথমতঃ তাঁহার কার্য্যে কোন প্রকার সহানুভূতি দেখান নাই; তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কারাগার সংস্কার করা অসম্ভব; উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা অপরাধীদিগকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করা বাতুলের কার্য্য। কারাধ্যক্ষগণ ইহাদিগকে পশুর ন্যায় দেখিতেন এবং ইহাদিগের সহিত পশুর ন্যায়ই ব্যবহার করিতেন। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, এলিজাবেথ ফ্রাই ইহাদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচনের জন্য, ইহাদিগকে পুনর্ব্বার সৎপথে আনিবার জন্য কৃত-সংকল্প হইয়াছেন, এবং সেইজন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তখন তাঁহারা ইহাঁর কার্য্যে আর কোন প্রকার বাধা দিলেন না। স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, বৃদ্ধ যুবা সকল প্রকার অপরাধীগণ একত্র থাকাতে কত কুফল ফলিতেছে, এলিজাবেথ কারাধ্যক্ষদিগকে তাহা বেশ বুঝাইয়া দিলেন; এবং এই সকল অপরাধীদিগের পৃথক পৃথক থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন। তারপর এলিজাবেথ দেখিলেন যে, হতভাগ্য এবং হতভাগিনীগণ অন্নবস্ত্রের জন্য একান্ত ক্লেশ পায়, কত হতভাগা হতভাগিনী, কত বালক বালিকা, অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে দিনপাত করিতেছে, শয্যা ও বস্ত্রের অভাবে কত ক্লেশ ভোগ করিতেছে, কত শিশু মাতার ক্রোড়ে অনাহারে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে! এই সকল দেখিয়া এলিজাবেথের পরদুঃখকাতর হৃদয় একান্ত ব্যথিত হইল। প্রথমতঃ তিনি নিজে অর্থ দ্বারা ইহাদিগের এই ক্লেশ অনেক পরিমাণে দূর করিতে লাগিলেন। যে বস্ত্রের অভাবে ক্লিষ্ট, তাহাকে এক খণ্ড বস্ত্র দান করা, যে অন্নাভাবে ক্ষুধার্ত্ত—তাহাকে এক মুষ্টি অন্নদান করার অপেক্ষা আর অধিক পুণ্য কি আছে, এবং অর্থেরই বা ইহা অপেক্ষা সদ্ব্যয় কি হইতে পারে? যদি আর কিছুও না পার, তবে যে পিপাসিত হইয়া তোমার দ্বারে যাইবে, তাহাকে এক বিন্দু জল দিও।

এলিজাবেথের চেষ্টায় কারাধ্যক্ষদিগের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হইল, এবং ইহাদিগের অন্ন বস্ত্রের

ক্লেশ কতক পরিমাণে হ্রাস হইল। একমুঠা অন্নের জন্য আর ইহাদিগকে ভিক্ষা করিতে হইত না অন্ন-বস্ত্রের জন্য আর কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইত না। ইহাদিগের ভরণপোষণের জন্য রাজকোষ হইতে অর্থ দেওয়া হইতে লাগিল। কারাবাসী ও কারাবাসিনীদিগের অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ দূর করিয়া, এলিজাবেথ ফ্রাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, কারাগারে অপরাধীদিগকে কেবল পীড়ন করাই শাস্তির উদ্দেশ্য; কিন্তু যাহাতে তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হইতে পারে, যাহাতে তাহারা কারামুক্ত হইয়া সৎপথে থাকিয়া জীবন যাপন করিতে পারে এমন কোন উপায় অবলম্বন করা হইতেছে না। তিনি দেখিলেন, অতি অল্প আয়াসে হয়ত তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হইতে পারিত, সামান্য চেষ্টাতে হয়ত যাহাদিগকে সৎপথে প্রতিনিবৃত্ত করা যাইত, শিক্ষা ও সদুপদেশের অভাবে তাহারা চিরজীবনের মত পাপ কার্য্যে ডুবিয়া যাইতেছে। এলিজাবেথ প্রথমতঃ অতি সামান্য ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। হতভাগিনী কারাবাসীদিগের জন্য তিনি সেই কারাগারের মধ্যেই একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এই বিদ্যালয়ে স্ত্রীলোক এবং অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণ লেখাপড়া শিখিত। তদ্ভিন্ন এলিজাবেথ ফ্রাই রীতিমত ইহাদিগের ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাঁর উপদেশে ও শিক্ষায় যে কি সুফল হইয়াছিল, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই খানেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। এলিজাবেথ দেখিলেন, ইহারা নিষ্কর্ম্মা থাকাতে অনেক কুফল ফলিতেছে।

মহাভারতের গল্প।

পূর্ব্বকালে উশীনর নামে এক অতি ধার্ম্মিক এবং দয়ালু রাজা ছিলেন। এক সময় উশীনর একটী যজ্ঞ করিতেছিলেন, এমন সময় ইন্দ্র এবং অগ্নি, তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্র—শ্যেন পক্ষী, এবং অগ্নি—পায়রার রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার সভায় উপস্থিত হইলেন। শ্যেন পক্ষীর ভয়ে, পায়রা রূপধারী অগ্নি উশীনর রাজার শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহার উরুমধ্যে লুকাইয়া রহিল। শ্যেন রূপধারী ইন্দ্র তাহা দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! অপনি অতিশয় ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত, আমি ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছি, অতএব আমার খাদ্য—ঐ যে পায়রাটী আপনার উরু মধ্যে লুকাইয়াছে, উহাকে দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করুন। রাজা কহিলেন, এই পায়রাটী তোমার ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার জন্য আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, ইহাকে আমি পরিত্যাগ করিলে মহা অধর্ম্ম হইবে। শ্যেন কহিল, মহারাজ! ক্ষুধায় আমার প্রাণ বাহির হইতেছে, আমি যদি এখনই আহার করিতে না পাই, তবে এই মুহূর্ত্তেই আমার মৃত্যু হইবে, এবং আমার মৃত্যু হইলে, আমার স্ত্রীপুত্র প্রভৃতিও সঙ্গে সঙ্গে অনাহারে মরিয়া যাইবে, কারণ আমি ভিন্ন তাহাদের আর সম্বল নাই! অতএব অপনি একটী জীবের প্রাণরক্ষা করিতে গিয়া, এতগুলি জীবের প্রাণ বধ করিবেন না। রাজা কহিলেন, সে কথা সত্য কিন্তু যে নিরুপায় হইয়া আমার আশ্রয় লইয়াছে, তাহাকে আমি কেমন করিয়া তোমার হাতে দিব; এই পায়রাটী ব্যতীত তুমি আর যাহা

চাও—গো, মহিষ, বরাহ, মৃগ, প্রভৃতি যে কোন পশু তুমি চাও, আমাকে বল, আমি এই মুহূর্ত্তেই সংগ্রহ করিয়া দিতেছি. শ্যেন কহিল মহারাজ! আমি বরাহ, গো, মহিষ, মৃগ কিছুই ভক্ষণ করি না। এই পায়রাটীকে দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করুন, ইহা ব্যতীত আমার অন্য কোন খাদ্যে প্রয়োজন নাই। রাজা আবার কহিলেন, যে অসহায় হইয়া আমার আশ্রয় লইয়াছে, তাহাকে আমি কোন মতে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কি করিলে তুমি ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পার, আমাকে বল, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। শ্যেন কহিল, মহারাজ! যদি ইহার প্রতি আপনার এতই স্নেহ হইয়া থাকে, তবে এই পায়রার সহিত ওজন করিয়া আপনার নিজের শরীর হইতে মাংস কাটিয়া দিন; তাহা হইলে আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিব। পরম দয়ালু উশীনর কহিলেন, শ্যেন তোমার প্রার্থনা শুনিয়া আমি অতিশয় অনুগৃহীত হইলাম। আমি সন্তুষ্ট চিত্তে এখনই তোমাকে নিজ শরীর হইতে মাংস কাটিয়া, তোমার আহারের জন্য দিতেছি। এই বলিয়া রাজা নিজ শরীর হইতে অকাতরে মাংস কাটিয়া তুলাযন্ত্রে পায়রার সহিত পরিমাণ করিতে গেলেন, পরিমাণ করিতে গিয়া দেখিলেন পায়রা অপেক্ষা মাংস অল্প হইয়াছে, তখন আবার মাংস কাটিয়া তাহাতে দিলেন, এবারও সমান হইল না। তখন রাজা আবার কতকখানি মাংস অকাতরে কাটিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেও সমান হইল না। ক্রমে ক্রমে সমুদয় মাংস কাটিয়া দিয়াও, পায়রার সমান হইল না। তখন ধার্ম্মিক উশীনর নিজেই সেই তুলা-যন্ত্রে আরোহণ করিলেন! সভাস্থ সকলে একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। তখন শ্যেন বলিল! মহারাজ! এই পায়রা অগ্নি, এবং আমি ইন্দ্র। তোমার ধর্ম্মশীলতা পরীক্ষা করিবার জন্যই আমরা ছদ্মবেশে এই যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তুমি যে নিজ শরীরের মাংসরাশি কাটিয়া দিয়া, এই নিরাশ্রয় পায়রাটীর জীবন রক্ষা করিলে ইহাতে আমরা পরম প্রীত হইলাম, এবং ইহাতে তোমার যশঃ ও কীর্ত্তি জগতে অক্ষয় হইয়া রহিল। এই বলিয়া সেই শ্যেন রূপধারী ইন্দ্র এবং পায়রা রূপধারী অগ্নি অন্তর্ধান হইলেন। রাজা উশীনরও নিজ ধর্ম্ম ও পুণ্যবলে স্বর্গে গমন করিলেন।

মহাভারতের এই গল্পটী হইতে আমরা কত উপদেশ পাই। যে অসহায়—নিরাশ্রয় তাহাকে আশ্রয় দান করিতেই হইবে; নিজের জীবন পর্য্যন্ত দিয়াও তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে, রাজা উশীনরের গল্পে আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে। যে ক্ষুধার্ত্ত তাহাকে এক মুঠা অন্ন দান কর, যে পিপাসার্ত্ত তাহাকে একবিন্দু জল দান কর, যে বস্ত্রহীন তাহাকে বস্ত্রদান কর, যে অসহায় নিরাশ্রয়, দীন, দরিদ্র, তাহাকে আশ্রয় দান কর,—ইহা অপেক্ষা অধিকতর পুণ্য আর কি আছে? আমাদের দ্বারে কত ভিখারী আসিয়া ফিরিয়া যায়; কত অসহায়, নিরাশ্রয়, অন্ধ, আতুর, দীন দরিদ্র একটু আশ্রয়ের জন্য লালায়িত হইয়া ফিরিতেছে, আমরা তাহাদিগের দিকে চাহিয়াও দেখি না! কোথায় নিজের জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াও তাহাদিগকে আশ্রয় দিব, না আমরা তাহাদিগের দিকে ফিরিয়াও চাহি না। জীবনে যদি একটী দীন দুঃখীকেও আশ্রয় দিয়া থাক, একটী অনাথেরও চক্ষের জল মুছাইয়া থাক, তবে তোমার জীবন ধন্য হইয়াছে। দীন দরিদ্রকে আশ্রয় দিও—কাঙ্গালের মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিও; ইহা অপেক্ষা আর অধিক পুণ্য কি আছে?

হেঁয়ালি গল্প ।

আমাদের বিস্তৃত পরিবার। ভাই বন্ধুরা দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আজকাল সভ্যতার দিনে চাকৃরি না যুটিলে পৃথিবীতে টেঁকা দায়, কাযেই এর চাকৃরি তার চাকৃরি করেই জীবনটা কাটাতে হচ্ছে। মনিবের ফরমাস খাট্‌তে খাট্‌তে শরীরটা রুগ্ন হ'য়ে যাচ্ছে। এক একটা মনিবের কেমনতর খেয়াল, আমাদের প্রতি এমনি তাঁদের স্নেহ যে আমাদের খাটাতে তাঁদের গায়ে ব্যথা লাগে, অতি যত্নে আদরে আমাদের রেখে দেন, শুধু তাই নয় পাছে আমরা চলে যাই বা কেউ জোর জবরদস্তি করে নিয়ে যায় বলে অনেক সময়ে আমাদের কারাবাসও সহ্য করিতে হয়। আবার এক একজনা এমন আছেন যে আমাদের প্রতি কিছু মায়া মমতা নাই। চাকর বলে কি বাপু তার প্রতি একটু তাকাতেও নাই? আমরা যেন তাঁদের কামড়াই, কাছে থাকৃলে যেন তাঁদের গা জ্বালা করে, আমাদের তাড়াতে পাল্লেই যেন তাঁরা বাঁচেন। আচ্ছা বাপু তাড়াও; বন্ধু চেনা বড় কঠিন ব্যাপার। যাঁরা আমাদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করেন তাঁদের সংসারে কখনও ভাল হয় না অবশেষে এই জন্য পরিতাপ করিতে হয়।

গোলামের জাত গোলামীই আমাদের ব্যবসা। যখন যার নুন খাই তখন তারই গুণ গাই। যতক্ষণ তোমার থাকিব তোমার হয়ে সব করিব। আবার যেই পরের চাকরি করিব তখন যদি আমার নূতন মনিব তোমার অপমান করিতেও বলেন তাহাও সচ্ছন্দে অম্লান বদনে করিতে পারি। চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের নিজের যে একটা কিছু বিশেষত্ব আছে তা নাই। আমাদের মুনিব বাবু যদি সৎলোক হন আমরা সর্ব্বদা সৎকাযেই ব্যস্ত থাকি, অসৎলোক হন অসৎকাযেই কালাতিপাত করি। এজন্য আমাদের কেহ দোষ দেয় না। আর দোষই বা আমাদের কি, প্রভুর আজ্ঞা সর্ব্বদা পালন করাই উচিত।

সভ্য সমাজের আমরা প্রধান অবলম্বন। আমরা না থাকৃলে লোকের হাঁড়ি চড়া দায় হয়। আমাদের মত সব কাযের চাকর আর নাই। তোমার রাঁধুনি ঘর ঝাঁট দেয় না, তোমার ধোপা তোমার ভাত রাঁধে না। আমরা সে রকম নই, আমরা সব করি। আমরা থাকিলেই জীবনের যত সুখ সচ্ছন্দ সব পাওয়া যায়। আমাদের খোঁজেই লোকে ঘুরে ঘুরে মরে। সৎ উপায়ে যদি আমাদের না পায়, তখন ফাঁকি জুয়াচুরি, ক'রে আমাদের আন্‌তে চেষ্টা করে। কখন কখন মাথা ফাটাফাটি কাটাকাটি করেও আমাদের হাত করে। তোমাদের রাজা কিন্তু এসব ভাল বাসেন না; যারা এরকম ক'রে আমাদের হাতাতে চেষ্টা ক'রে রাজা তাদের বড় শাস্তি দেন। লোকে আমাদের এমনি পছন্দ করে যে যখন আমাদের আসল জাতের লোক না পায় তখন কলিকাতায় বাগ্‌দির গলায় পৈতা দিয়ে বামুন সাজা গোছের করে, আমাদের বেশ ভূষা পরাইয়া ছোট লোককে আমাদের মত সাজাইয়া তাদের দ্বারা আমাদের করনীয় সমস্ত করাইয়া লইতে চেষ্টা করে। কিন্তু নকল বামুন যেমন গায়ত্রী বা বেদ পাঠের কিছুই জানে না, সেই রকম আমাদের নকলকারী ভায়ারাও মন্ত্রোচ্চাচরণ কালে ধরা পড়েন, অনেক দিন ফাঁকি চলে না, তখন যারা এই নকল কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁদের অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

আমরা পথিকের অতি প্রয়োজনীয় ও আবশ্যকীয় সঙ্গী। দেশ বিদেশে যুর্ত্তে হলে আমাদের সঙ্গে নিতে হয়, না হলে বড় বিপদে পড়িতে হয়। কিন্তু আমাদের নিয়ে যখন পথে ঘাটে, রেলে নৌকায় চলিবে তখন সাবধানে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। কারণ মানুষের মন বড় কুটিল, আমাদের দেখ্‌লে তারা লোভে অধীর হয়ে পড়ে, ফাঁক পেলেই আমাদের নিয়ে আস্তে আস্তে সরে পড়ে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সব দেশেই আমাদের জ্ঞাতি কুটুম্ব আছে। কিন্তু যে যে রাজার দেশে চাকৃরি করে সে অপর রাজার দেশে চাকৃরি করিতে চায় না। তুমি যদি নূতন রাজার দেশে যাও তবে সেখানে তোমার পুরাতন সঙ্গীর বিনিময়ে আমাদের জ্ঞাতির সেই দেশের লোক লইও। তাহারা সেই দেশের ভাষা, চাল চলন সব বিশেষ অবগত আছে, তাদের দিয়ে তোমার কায যেমন সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হবে এমন আর কাহারও দ্বারা নহে।

আমাদের চেহারা সকলের সমান নহে। দেশের গুণে চেহারা বদলাইয়া যায়। মানুষেরও ত চেহারা সকলের এক নয়, বাঙ্গালীর চেহারা এক, কাফ্রীর চেহারা আর এক, চীনের চেহারা অন্য প্রকার। আমাদেরও সেইরূপ। আমাদের জাতির কাহারও রং সাদা, কাহারও পীত বর্ণ, কাহারও ধূম বর্ণ দেখিবে। সুশ্রী আর সাদা সকলেই পছন্দ করে। কটা চাম্‌ড়ার এমনি গুণ, কালর দিকে কেহ তাকাতে চায় না। আমাদের মধ্যে যাদের গায়ের রঙ্গে একটু হল্‌দের আভা আছে তাদের বড় অহঙ্কার তারা সাদা ভাইয়ের দিকে তাকাতে চায় না, মেটে গুলির দিকে ত তাকায়ই না, তাদের কাছেও আসে না। এঁরা বড় লোকের না হলে চাকুরি করেন না। বাবু ভায়াদের সংসর্গেই বোধ হয় থাকেন। কখন কখন হঠাৎ ছোট লোকের সংসর্গে গিয়া পড়েন। সাদা রং যাদের তারা প্রায় সকলেরই প্রিয় সকলেরই কাছে থাকে। কেহ কেহ একটা হল্‌দে চাকর রাখ্‌তে অনেকগুলি সাদা চাকর বিদেয় দিতে রাজি হয়। আর আমাদের মধ্যে যাদের মেটে রং তারা এক একবারে অল্প স্বল্প কায করিতে পারে; একদম অনেক কায করিতে পারে না। এরা তোমার ফুট্ ফরমাস খাটিবে, তোমার মুড়ি, ছোলা ভাজা, জিলিপি, পানতোয়া কিনিয়া আনিবে; তোমার খেলিবার দুটা মার্ব্বেল, লিখিবার একটা পেন্‌সিল আনিয়া দিতে পারিবে। যদি বল পাঁচ সের ছানাবড়া আনিয়া দাও তবে তারা পারিবে না। দু চার্‌টে আন্‌তে পারে।

বাল্যকালে আমাদের আকৃতি অতি উজ্জ্বল হইলেও যৌবন কালে আমরা দেখিতে বড় সুন্দর। বার্দ্ধক্যে দিন রাত খাটিয়া খাটিয়া দেহ এমনি রুগ্ন এবং চেহারা এরূপ বিকৃত হইয়া যায় যে আমাদের চেনা যায় না। লোকে আমাদের গোল গাল আকার বড় ভাল বাসে; আমরা তালপাতার সিপাই বা ফড়িংএর মত হই এ তারা চায় না।

এদেশে অনেক লোক আছেন যাঁরা তাঁদের বয়স বলিতে চাহেন না। আমরা সে রকম নহি। আমরা সর্ব্বদা আমাদের বয়স বলিয়া থাকি। আমরা যে রাজার দেশে থাকি সে রাজার চেহারা ঘাড়ে করিয়া বেড়াই।

আমাদের তোমরা কি নাম রখিয়াছ ?

গরিবের কুটীর।

(বালকের রচনা।)

ভোর্ না হ'তে আঙ্গিনাতে পড়্ছে গোবর ছড়া
গিন্নী ঘরে ঘুমের ঘোরে থাক্‌বে সেকি মড়া!
লিপে পুঁছে ঘর্ দরজা কর্‌ছে ফুল ফুল
সিঁদুর প'লে তুল্‌বে নখে তার হবে না ভুল।
বাসন মেজে ঘরের মেঝে রাখ্‌ছে সারি সারি
ঝক্‌ঝক্ করে দেখ্‌লে পরে চোখ দুটী লয় কাড়ি!
একে একে বাসি কাজ সেরে ফেল্‌ছে সব
খেটে খুটে ঘাম ছুটেছে মুখে নেইকো রব!
হাত পা' ধুয়ে কাপড় ছেড়ে বাড়্‌ছে পান্তা ভাত
ছেলে পিলে ডাক্‌ছে সবে খানা এসে ভাত?
তাদের খা'য়ে ঠাণ্ডা হয়ে গালে দিচ্ছে পান
রাঁধ্‌তে হবে সকাল সকাল ভান্‌তে হবে ধান।
ব'সে থাক্‌লে চল্‌বে কেন তেল মাখিয়ে গায়
কলসী কাঁকে জল আনিতে স্নানের ঘাটে যায়।
নেয়ে ধুয়ে ভিজা গায়ে ফিরে এসে বাড়ী
কাপড় ছেড়ে উনন ধরিয়ে রাঁধ্‌ছে তাড়াতাড়ি।
খেয়ে দেয়ে তামাক সেজে লাঙ্গল নিয়ে কাঁধে
ক্ষেতে যাচ্ছেন্ কত্তা মোশাই খোকা খুকি কাঁদে।
হল জুড়িয়ে 'নেহাল দাস' ভুঁয়ে দিচ্ছে চাষ
হট হট্ করে গরু তাড়াচ্ছে খুঁড়্‌ছে মাটির রাশ!
দিন কাটিয়ে সাঁজের বেলা ফিরে এসে ঘরে
হাত পা' ধুয়ে ডাব্বা হুকায় তামাক টান্‌ছে জোরে।
খানিক পরে গরম ভাতে টাট্‌কা মাছের ঝোল
মেখে জুখে খাচ্ছে সুখে চুকিয়ে গণ্ডগোল।
দরমা পাতা ছেঁড়া কাঁথা বালিশ খড়ের আঁটি
নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে সে কেঁপে উঠছে মাটি!
গিন্নী বসে অবশেষে খাচ্ছে ঠাণ্ডা ভাত
ছোট খোকা ঘুমুচ্ছে না কচ্ছে কি উৎপাৎ!
খোকার কান্না থামে কি আর কোলের থেকে থুলে?
আগদাঁত দুটি ভাত দিচ্ছে মুখে তুলে
আধপেটা খেয়ে অমনি তাড়াতাড়ি চলে
ঘুম পাড়াতে গেল গিন্নী খোকা নিয়ে কোলে।
মাই খেয়ে সে ঠাণ্ডা হল চোখে এল ঘুম
গিন্নী বলে হাড় জুড়াল বাঁচ্‌লুম বাঁচ্‌লুম!
'বামী' ঘুমে স্বপন দেখে কি জানি কি কয়?
পুতুল বিয়ে দিব কাল মনে যেন রয়।
তোমার পুতুল কন্যা হবে আমার পুতুল বর
খড় কুটো কুড়িয়ে মোরা বেঁধে দিব ঘর।
ভাল ভাল কাপড় দিব কাণে দিব দুল
হাতে দিব হাত বালয় মাথায় দিব ফুল!
রান্নাবাড়ী খেল্‌ব নিয়ে ধূলা মাটি ছাই
দেখিস্ যেন এ কথাটী ভুলে যাস্‌নে ভাই?
নেমন্তন্ন দিয়ে মোরা তুষিব সবায়
পাড়াপর্শি হবে খুসি আয়না তোরা আয়?
বল্‌তে বল্‌তে ভেঙ্গে গেল সাধের স্বপন
গিন্নী বলে 'বামী' কিলো বক্‌লি এতক্ষণ?
অবাক্ হয়ে চেয়ে আছে সেই কথাটী মনে
পুতুল বিয়ে দিবে তারা মিলি দুই জনে।
গিন্নীপাণা ঘরকন্না দেখেছে যে জানে
চাষার ঘরে স্বয়ং লক্ষ্মী বিরাজে সেখানে!
ধরাতলে স্বর্গধাম দেখ্‌সে পাড়াগাঁয়
কিবা সুখে মূর্খ চাষার দিন্‌টি কেটে যায়!!!

জন্ ব্রাইট্।

প্রতিদিন কত শত লোক জন্মিতেছে, কত শত লোকের মৃত্যু হইতেছে, কে তাহার সংবাদ লয়! কিন্তু আমরা এক এক সময় দেখিতে পাই যে, এক ব্যক্তির জন্মে তাঁহার জন্ম-ভূমি ধন্য হইয়া যায়, এবং তাঁহার মৃত্যুতে

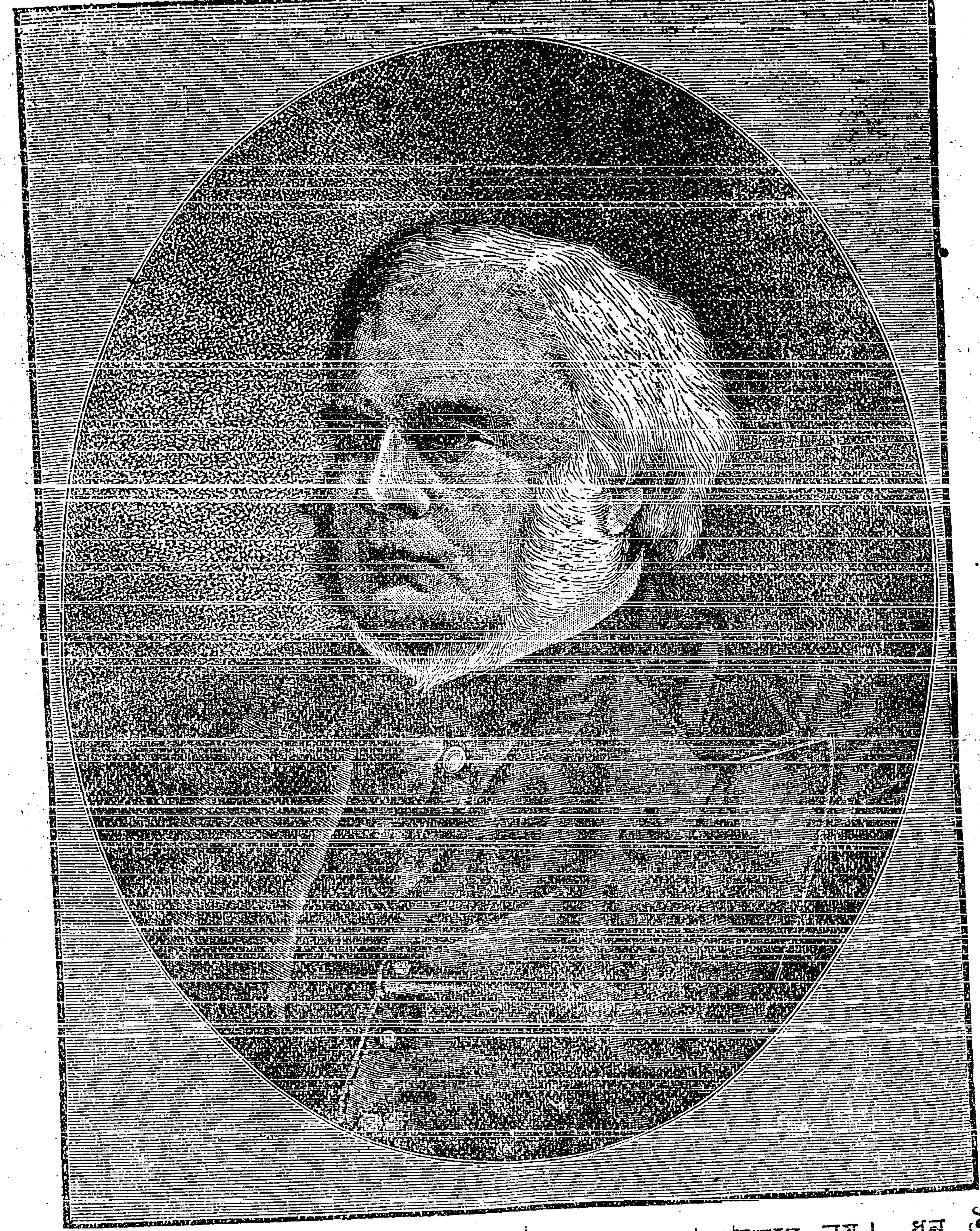

সমস্ত জগতের লোক অশ্রুপাত করে। এ প্রকার লোকের সংখ্যা খুব অল্প; এমন লোক অধিক থাকিলে, জগতের দুঃখ দুর্দ্দশার অনেক হ্রাস হইত, সর্ব্বত্র সুখ ও শান্তি বিরাজ করিত। ইহাঁরা ধনী বা ঐশ্বর্য্যশালী নন, প্রায়ই অতি সামান্য অবস্থাপন্ন লোক, কিন্তু কি আশ্চর্য্য সামান্য অবস্থাপন্ন হইলেও জগতে ইহাঁদের ক্ষমতা কি অসীম! এ শক্তি—এ ক্ষমতা, ধনের নয়, ঐশ্বর্য্যের নয়, পদের নয় বা রাজ্যের নয়। ধন, ঐশ্বর্য্য, পদ বা রাজ্যের শক্তি অপেক্ষা ইহা সহস্র গুণে অধিক। সামান্য প্রজা হইতে রাজ্যের ঈশ্বর রাজা পর্য্যন্ত এ শক্তির সম্মুখে অবনত হন;—জগতের লোক এ শক্তির পূজা করে।

উপরে যাঁহার ছবি দেওয়া হইয়াছে, তিনি একজন এই শ্রেণীর লোক। মহাত্মা জন ব্রাইটের জন্মে তাঁহার জন্ম-ভূমি ইংলণ্ড ধন্য হইয়া-

ছিল, তাঁহার মৃত্যুতে জগতের লোক আজ শোক করিতেছে। তাঁহার মৃত্যুতে ইংলণ্ড একটী উজ্জ্বল রত্ন হারাইয়াছেন, আমরাও একটী পরম হিতৈষী বন্ধু হারাইয়াছি। ব্রাইট চিরদিন বিপন্নের বন্ধু, অসহায়ের সহায়; যেখানে অত্যাচার, যেখানে পীড়ন, সেইখানেই ব্রাইটের কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। যাহা অন্যায় ব্রাইট প্রাণপণে তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রাণপণে ন্যায়ের পোষকতা করিয়াছেন এবং যাহাতে জগতে শান্তি বিরাজ করে আজীবন সে চেষ্টা করিয়াছেন। জন ব্রাইট আমাদের দেশের একজন বিশেষ হিতৈষী ছিলেন, ভারতবাসীকে অত্যাচার ও পীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। ভারতবর্ষ যখন কোম্পানীর রাজ্য ছিল, তখন এদেশীয়দের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইত। ছলে বলে ভারতবাসীর অর্থ-শোষণ করা হইত, ছলে বলে দেশীয় রাজাদিগের রাজ্য হরণ করা হইত। মহাত্মা জন ব্রাইট সেই সকল অত্যাচারের কথা পার্লিয়ামেণ্টের মহা-সভায় প্রচার করিয়া, ভারতবাসীকে তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। ভারতের কল্যাণের জন্য তিনি চিরদিনই যত্ন-বান ও সচেষ্ট ছিলেন। তাই আমরা আজ আমা-দের পরম-হিতৈষী ব্রাইটের জীবনের কথা সংক্ষেপে তোমাদিগকে বলিব।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে ১৬ই নবেম্বর রক্‌ডেল্ নামক স্থানে ব্রাইটের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতা জেকব ব্রাইট নিতান্ত সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। একজন তাঁতির বাড়ীতে কাজ করিয়া মাসে ১৪।১৫ টাকা উপার্জ্জন করিতেন, এবং তাহা-দ্বারাই কোনমতে দিনপাত করিতেন। কিন্তু দরিদ্র হইলেও এক গুণে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা-ভাজন হইয়াছিলেন। চরিত্রের সাধুতার জন্য সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিত। বন্ধু বান্ধবের সহায়তায় তিনি একটী পুরাতন কাপড়ের কল কিনিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। সাধুতা ও পরিশ্রমের গুণে তাঁহার আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং অবস্থা বেশ স্বচ্ছল হইয়া উঠিল। এই সময় জন ব্রাইটের বয়স দশ বৎসর। জেকব পুত্রকে এক গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠাইলেন। ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি বিদ্যালয়ে পড়িয়া-ছিলেন; এই অল্প সময়েই ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ দখল হয়। তার পর ব্রাইট পিতার কারখানায় কাজ কর্ম্ম শিখিতে আরম্ভ করেন। ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াও তিনি লেখা পড়া পরিত্যাগ করেন নাই; ইংরাজী ভিন্ন অপর কোন ভাষা ব্রাইট শিক্ষা করেন নাই।

রক্‌ডেলে সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনার জন্য এক সভা ছিল, ব্রাইট সেই সভার সভ্য হইয়া প্রায়ই বক্তৃতা করিতেন। যে বাগ্মীতায় তিনি লোককে পরে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, এইখানেই তাহার প্রথম শিক্ষা হয়। ১৯ বৎসর বয়সের সময় ব্রাইট মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে এক বক্তৃতা করিয়া-ছিলেন, তাহা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া-ছিলেন।

জেকব ব্রাইট ইংলণ্ডের রাজকীয় ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন না। বিশ্বাস না থাকিলেও দেশের আইন অনুসারে রাজ-ধর্ম্ম পোষণের জন্য কর দিতে হয়, কিন্তু জেকব এই কর দিতে চাহিতেন না। ইহাতে তাঁহার উপর অনেক অত্যাচার হইত, রাজকর্ম্ম-চারীরা বলপূর্ব্বক তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া সুতার গাঁট ও বস্ত্রাদি নিলাম করিয়া টেক্স আদায় করিত। এই সকল এবং অন্যান্য প্রকার অত্যাচার স্বচক্ষে দেখিয়া বাল্যকালেই জন ব্রাইটের মনে

দেশকে অত্যাচার ও পীড়ন হইতে রক্ষা করিবার আকাঙ্ক্ষা হইয়া উঠে।

বিদেশ হইতে যে সকল শস্য ইংলণ্ডে আম-দানি হইত, তাহার উপর অত্যন্ত অধিক মাশুল থাকাতে, সেই সকল শস্য অত্যন্ত অধিক মূল্যে বিক্রয় হইত। সুতরাং যাহারা গরিব তাহাদের যৎ-পরোনাস্তি ক্লেশ হইত। যাঁহারা ধনী তাঁহারা ইহাতে খুব লাভবান হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু গরিবদিগের গৃহে মহা হাহাকার ধ্বনি উঠিল। গভর্ণমেণ্ট এই হাহাকারের দিকে কর্ণপাতও করি-লেন না। দুঃখীর বন্ধু ব্রাইটের হৃদয় ইহাতে বিচলিত হইল। তিনি এই শস্যের মাশুল রহিত করিবার জন্য খুব চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রাই-টের বয়স এই সময় প্রায় ৩০ বৎসর। ১৮৪১ সনে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইল, ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুতে ব্রাইট একান্ত ব্যথিত হইলেন, এবং শোকে অবসন্ন হইয়া শয্যাগত হইলেন। ব্রাইটের সহযোগী কব-ডেন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পরদিন ব্রাইটের সহিত দেখা করিতে আসিয়া দেখিলেন, ব্রাইট নিতান্ত শোকাকুল হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া কবডেন বলিলেন, "এই দারুণ শোকে হৃদয়কে অবসন্ন হইতে দিও না; আই-নের অত্যাচারে দেশের সহস্র গৃহে কত স্ত্রী, কত সন্তান অনাহারে প্রাণ হারাইতেছে, তুমি আমার যদি সহায়তা কর, যতদিন এই আইন রহিত না হয়, ততদিন আর বিশ্রাম উপভোগ করিব না।" ব্রাইটের পরদুঃখ-কাতর হৃদয় বিচলিত হইল, স্ত্রীর মৃত্যু শোকে যেন ইহা তাঁহার আরও বাজিল। শস্য আইন যাহাতে রহিত হয় প্রাণপণে সে চেষ্টা করিবেন এই দৃঢ় সংকল্প করিলেন।

১৮৪৩ সনে ৩২ বৎসর বয়সে ব্রাইট পার্লিয়া-মেণ্টের সভ্য হন। পার্লিয়ামেণ্টে এবং দেশের নানা-স্থানে এই শস্য-আইনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে এ আইন রহিত হয় প্রাণপণে সে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আট বৎ-সরের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর ১৮৪৭ সনে এই অহিতকর আইন রহিত হইল।

জন ব্রাইট চিরদিনই শান্তির পক্ষপাতী এবং যুদ্ধের মহা বিরোধী ছিলেন। ১৮৫৪ সনে তুরস্কের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ড রুসিয়ার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ব্রাইট পার্লিয়ামেণ্টে এই যুদ্ধের ঘোর প্রতিবাদ করিলেন, মানুষ মানুষের রক্তপাত করিবে, ভাই ভাইয়ের রক্তে দেশ প্লাবিত করিবে, ইহা তিনি দেখিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার কথায় কোন ফল হইল না। ইংরেজেরা চীনবাসী-দিগের নিকট আফিং বিক্রয় করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। আফিংএ চীনের সর্ব্বনাশ হইতেছে। চীন গবর্ণমেণ্ট ইংরেজদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে আজ্ঞা দেন; ইহাতে ইংলণ্ডের প্রধান রাজ-মন্ত্রী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠেন এবং অবিলম্বে চীনদিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ব্রাইট চিরদিন অত্যাচারের ঘোর শত্রু। তিনি এই যুদ্ধের ঘোর প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কেহই কর্ণপাত করিল না।

১৮৫৩ সনে ভারতবর্ষ সুশাসনের জন্য পার্লিয়া-মেণ্টে এক আইন উপস্থিত করা হয়। ব্রাইট সেই উপলক্ষে বলিয়াছিলেন যে "বাঙ্গালা দেশের প্রজাগণের অবস্থা এমন শোচনীয় যে, তাহা চিন্তাও করা যায় না। তাহারা যে সকল কুটীরে বাস করে তাহা কুকুরের বাসেরও উপযুক্ত নহে। শত ছিন্ন বস্ত্রে কোন প্রকারে তাহারা শরীর আবৃত করিয়া রাখে, এবং অতি কষ্টে এক বেলা আহারের সংস্থান করিয়া তাহাতেই কোন মতে দিনপাত করে।

যে দেশে এত শস্য উৎপন্ন হয় তাহাদের এইরূপ অবস্থার কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোম্পানী এই দরিদ্র প্রজাদিগের অর্থ শোষণ করিয়া তাহা যুদ্ধ প্রভৃতিতে ব্যয় করিতেছেন।” ব্রাইট বলিতেন, “ভারতবর্ষে যে প্রকার অত্যাচার করা হইতেছে, তাহাতে সে দেশ দখলে রাখা অসম্ভব।” ব্রাইটের এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ সফল না হইলেও, সিপাহি বিদ্রোহে কতক পরিমাণে সফল হইয়াছিল। ১৮৫৭ সনে সিপাহীরা ক্ষেপিয়া উঠিল, ভারত ইংরাজের হাত হইতে যায় যায় হইয়াছিল। বিদ্রোহ শান্তি হইলে, কোম্পানির নিকট হইতে ভারত শাসনের ভার গভর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে লইলেন। সেই সময় ব্রাইট বলিয়াছিলেন, “যাহাতে ভারতবর্ষের কৃষকদিগের অবস্থা ভাল হয়, ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা হয়, রেলওয়ে, রাস্তা ও খাল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, গভর্ণমেণ্টের সেই দিকে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। এ পর্য্যন্ত ভারতে অনেক যুদ্ধ হইয়াছে, এখন অধর্ম্ম যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইয়া ভারতবর্ষের কোটী কোটী নরনারী যাহাতে প্রকৃত সুখে ও শান্তিতে থাকিতে পারে, গভর্ণমেণ্ট সেই চেষ্টা করুন” ইত্যাদি। যখন এদেশের হইয়া একটী কথাও কেহ বলিতেন না, সেই সময় ব্রাইট আমাদের হইয়া কত বলিয়াছেন, এদেশকে অত্যাচার ও পীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি চিরদিনই ভারতের বন্ধু ছিলেন, তাই তাঁহার মৃত্যুতে আজ আমরাও শোক করিতেছি। ব্রাইট রাজনৈতিক কার্য্যেই জীবন অবসান করিয়াছেন; সে সমস্ত বিশেষ ভাবে লিখিবার কোন আবশ্যক নাই। প্রায়ই দেখা যায় যে, যাঁহারা রাজনৈতিক কার্য্যে লিপ্ত থাকেন, নীতি সম্বন্ধে তাঁহারা অনেক সময় উদাসীন হন। অনেক সময় মিথ্যা ব্যবহার ও প্রবঞ্চনা করিতে দেখা যায়। স্বার্থসিদ্ধি বা মানুষের খাতিরে, যাহা অন্যায় তাহাও করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রাইট এ সম্বন্ধে আদর্শ-পুরুষ। রাজনৈতিক কার্য্যে জীবন কাটাইয়াও তিনি কখনও মিথ্যা বা প্রবঞ্চনা অবলম্বন করেন নাই। মানুষের খাতিরে বা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তিনি কখনও ন্যায়কে পরিত্যাগ করেন নাই। যাহা অন্যায় বুঝিয়াছেন, প্রাণপণে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, যাহা ন্যায় ও সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে, প্রাণপণে তাহা সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে অনেক সময় তাঁহাকে লোকের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছে। যুদ্ধকে তিনি মহাপাপ মনে করিতেন, অন্যায় ও অত্যাচারের প্রাণপণে প্রতিবাদ করিতেন। লোকের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল এবং জীবনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহা হইতে বিরত হন নাই। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু ছিলেন, নীতির পথ কখনও পরিত্যাগ করেন নাই; যাহা সত্য, যাহা ন্যায় বলিয়া বুঝিয়াছেন, প্রাণপণে তাহা পালন করিয়াছেন। এইজন্যই তিনি সকলের শ্রদ্ধা পাইয়াছেন, এবং সকলের পূজনীয় হইয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল, সকলেই তাহাতে মুগ্ধ হইত। তিনি যাহা নিজে প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিতেন, তাহাই বলিতেন সুতরাং তাহাতে লোকের প্রাণ স্পর্শ করিত। পার্লিয়ামেণ্টের মহাসভায় তাঁহার কণ্ঠরব আর কেহ শুনিবে না, পার্লিয়ামেণ্ট তাঁহার কণ্ঠধ্বনিতে আর কম্পিত হইবে না। ব্রাইটের সেই মধুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর চিরদিনের মত নীরব হইয়া গিয়াছে! গত ২৭শে মার্চ্চ জন ব্রাইটের মৃত্যু হইয়াছে। ব্রাইটের মৃত্যু হইয়াছে সত্য, তাঁহাকে আর কেহ দেখিতে পাইবে না সত্য; কিন্তু তাঁহার ন্যায়পরতা, তাঁহার সাধুতা এবং তাঁহার সৎকীর্ত্তি তাঁহাকে চিরকাল জীবিত রাখিবে।

দাসত্ব প্রথা।

আমাদের অনেকেই টম্‌কাকার কুটীর পড়িয়াছে, এবং দাস ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেক কথা জান। ইউরোপের সভ্য সাহেবগণ আমেরিকায় যাইয়া চিনি, তুলা ইত্যাদির চাষ করিতেন, এবং ইউরোপের বাজারে সেই সকল জিনিস বিক্রয় করিয়া ধনী হইতেন। এই সকল কারবারে ক্ষেতে খাটিবার জন্য অনেক লোকের দরকার হইত। মাহিয়ানা করিয়া চাকর রাখিতে গেলে বিস্তর পয়সা লাগে, লাভ তত বেশী হয় না, সুতরাং অল্প পয়সায় যাহাতে কাজ চলে, সাহেবেরা শীঘ্রই তাহার একটা উপায় স্থির করিলেন।

আফ্রিকায় নীগ্রো নামক অসভ্য জাতির বাস। নীগ্রোরা বলিষ্ঠ, কর্ম্মক্ষম, সরল এবং শান্ত স্বভাব। একদল লোক ইহাদিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আমেরিকায় আনিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল; এইরূপে দাস ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইল। এই সকল লোকদের উপর কিরূপ পশুর মতন নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইত, নিম্নলিখিত গল্পটী পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবে।

লাইবেরিয়াতে একজন নীগ্রো পাদ্রী আছেন। বাল্যকালে তাঁহাকে দাস ব্যবসায়ীদের হাতে পড়িয়া ভয়ানক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাঁহাকে ধরিবার সময় পাষণ্ডেরা তাঁহার গায় যে আঘাত করিয়াছিল, এই বৃদ্ধ বয়সেও তাহার চিহ্ন সকল আছে। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাঁহাকে চুরী করিয়া আনে। তাঁহার পিতা আফ্রিকার ঐ স্থানের একজন ধর্ম্ম যাজক ছিলেন। একটী ছোট গ্রামের একটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটীরে তাঁহারা বাস করিতেন। ইহার নিকটেই তাঁহাদের কাঠের ছোট কালো দেবতাটীর মন্দির ছিল। রোজ দুবেলা ছেলেদের সেই দেবতার কাছে লইয়া গিয়া হাতযোড় করিয়া পূজা করিতে শিখাইতেন। এইরূপ নির্দ্দোষ সুখে তাঁহাদের জীবন চলিত; ভবিষ্যতের দারুণ দুঃখের কথা তাঁহারা স্বপ্নেও জানিতে পারেন নাই।

এই গ্রামের নিকটেই আর একদল নীগ্রো বাস করিত। ইহারা টাকার লোভে পর্টুগীজ দাস ব্যবসায়ীদিগকে এই গ্রামে পথ দেখাইয়া আনিল। একদিন রাত্রিতে সকলে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময় একদল সশস্ত্র লোক গ্রামে প্রবেশ করিয়া যত জনকে ধরিতে পারিল, বন্ধন করিল। মৃত লোককে বিক্রী করা যাইবে না, সুতরাং অধিক লোককে মারা হইল না।

পিতা তিনটী সন্তানকে লইয়া সময় থাকিতেই জঙ্গলে পলাইতে পারিয়াছিলেন। মাতা সর্ব্ব কনিষ্ঠ শিশুটীকে লইয়া গ্রামান্তরে কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। পোনের দিবস তাঁহারা সেই স্থানে ছিলেন, এই সময়ের মধ্যে আত্মীয়েরা

অবশিষ্ট তিনটী সন্তান এবং তাঁহাদের পিতার সন্ধান লইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের কোনরূপ খবরই পাওয়া গেল না। পোনের দিনের পর একদিন রাত্রিতে দাস ব্যবসায়ীরা এই গ্রামে আসিয়া সকলকে আক্রমণ করিল। আত্মীয়েরা কোথায় পলাইয়া গিয়াছিলেন, মাতা এবং পুত্র বন্দী হইলেন। ইহাঁদিগকে পর্টুগীজদিগের ছাউনীতে লইয়া আসিল। সেখানে সপ্তাহকাল তাঁহাদের উপর বিশেষ কোন অত্যাচার হয় নাই, কারণ পর্টুগীজেরা এদিক ওদিক মানুষ ধরিতে ব্যস্ত ছিল। সেখানেও অন্যান্য অনেক লোকের উপরে নানা রকম লোমহর্ষণ অত্যাচার হইয়াছিল। অনেক পিতা পরিবারের জন্য যুদ্ধ করিয়া বন্দুকের গুলিতে হত হইলেন, অনেক মাতা শিশু সন্তানকে লইয়া পলায়নের চেষ্টা করাতে অস্ত্রাঘাতে প্রাণ হারাইলেন।

যখন অনেকগুলি 'দাস' সংগৃহীত হইল তখন ইহাদিগকে একটা 'ডিপো'তে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে চারি শতের বেশী লোককে শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। এর পর ইহাদিগকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া আফ্রিকার সেই ভয়ানক রৌদ্রে ১৮০ মাইল পথ লইয়া গেল, এই সময় যে কি নিষ্ঠুর ব্যবহার সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ছেলেগুলি চোখের সামনে থাকিলে তাহাদের কষ্ট দেখিয়া পিতামাতা নিরুৎসাহ হইতে পারে, এই বলিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইল। অনেক সময় স্ত্রীলোক এবং শিশুরা আর চলিতে না পারিয়া রাস্তায় পড়িয়া যাইত; তখন চাবুক মারিয়া তাহাদিগকে উঠিতে বাধ্য করিত। চাবুকে না কুলাইলে লোহার তীক্ষ্ম লাঠি দ্বারা খোঁচা মারিত। বহু সংখ্যক লোক এত অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিল। আমাদের পরিচিত শিশুটীর মাতা তাহার মধ্যে একজন। শিশুটী কাঁদিতে কাঁদিতে বিষম প্রহার খাইয়া প্রাণের ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

এই রূপে চলিয়া শেষে সমুদ্রের ধারে উপস্থিত হইল। সেখানে তাহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য জাহাজ প্রস্তুত। জাহাজ দেখিয়া তাহাদের মনে অধিকতর আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তাহারা জাহাজ দেখিয়া মনে করিল যে, এটা বুঝি একটা ভয়ানক জানোয়ার, আর এটাকে খাওয়াইবার জন্য তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছে। ভয়ে হতভাগ্যেরা চীৎকার করিতে লাগিল, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক জাহাজে তোলা হইল।

জাহাজের 'ভিতরে' আল্‌মারিতে বই রাখিবার মতন করিয়া দাসদিগকে রাখা হইত। পরিণত বয়স্কদের জন্য ছয় ফুট লম্বা আর এক ফুট চার ইঞ্চি উচু স্থান, আর পাশাপাশি যত লোক ধরে—বেচারাদের পাশ ফিরিবার সম্ভাবনা থাকিত না। ছেলেদের জন্য পাঁচ ফুট লম্বা এক ফুট উচু স্থান। এইরূপে তাহাদের দুই মাস কাল থাকিতে হইত। সাত আট দিন পর এক দিন কেবল মাত্র এক ঘণ্টা কালের জন্য তাহাদিগকে উপরে আসিতে দেওয়া হইত।

এত অত্যাচারে কয় জন বাঁচিয়া থাকিবে? তিন জনের ভিতরে দুই জন সাধারণতঃ জাহাজেই মারা যাইত, অবশিষ্টেরাও জন্মের মত বিকলাঙ্গ হইয়া থাকিত।

ক্রমশঃ—

সখা
সপ্তম ভাগ। পঞ্চম সংখ্যা।
মে, ১৮৮৯।

দাসত্ব প্রথা।

(৬৪ পৃষ্ঠার পর)

আমরা যাহাদের কথা বলিতেছি, তাহাদের উপর ঈশ্বর সদয় হইলেন। জাহাজ ছাড়িবার পর এক সপ্তাহের ভিতরেই ইংলণ্ডের এক খানা যুদ্ধ-জাহাজ তাহাদের পিছু পিছু আসিয়া দাস ব্যবসায়ীদিগকে আত্ম সমর্পণ করিতে বলিল। দাস ব্যবসায়ীরা পলায়নোদ্যত হইল। জাহাজ হাল্কা করিবার জন্য পিপায় পুরিয়া নীগ্রোদিগকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া ইংরাজদের জাহাজ অধিকতর বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং শীঘ্রই দাসব্যবসায়ীদিগকে ধরিয়া ফেলিল। কিছুকাল ভয়ানক যুদ্ধের পর পর্টুগীজেরা পরাজিত হইল, জাহাজ ইংরাজদের হস্তগত হইল। দাসদিগকে উপরে আনিয়া খাইতে দেওয়া হইল, এবং তাহারা সেই খানেই থাকিতে পাইল। এর পর জাহাজ লাইবেরিয়ার দিকে চলিল দেখিয়া বেচারা নীগ্রোদের মনে আনন্দ হইল।

লাইবেরিয়াতে আনিয়া তাহাদিগকে নানা স্থানে পাঠাইয়া যাহাতে তাহাদের জীবিকা উপার্জ্জনের পন্থা হয় তাহার চেষ্টা হইতে লাগিল। আমাদের পরিচিত নিরাশ্রয় মাতৃহীন শিশুটীকে এবং অন্যান্য অনেক শিশুকে মিসনারিদের ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। এই খানে থাকিয়া তিনি লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেন। মিসনারিরা মাঝে মাঝে তাঁহাকে উপশিক্ষকের কাজ করিতে দিতেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া একটী স্কুল-মাষ্টারিতে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে ইহাঁকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া জন্‌সাউথ্ নাম দেওয়া হয়। জন্‌সাউথ্ অনেক দিন এই কার্য্যে ছিলেন, শেষটা তাঁহাকে প্রচারকের পদে নিযুক্ত করা হইল। এই কার্য্যে তিনি বিশেষ রূপে লোকের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছেন।

দাসদিগের দুঃখের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। পথে কিরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে হইত তাহাই বলিয়াছি। এর পর যাহারা তাহাদিগকে কিনিত, তাহাদিগের নিকট আরো অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। সমস্ত দিন ক্রমাগত খাটিতে হইত। সে যে কি ভয়ানক খাটুনি তাহা আর কি বলিব! এত খাটিয়াও প্রভুর সন্তোষ নাই; অল্প কাজ হইয়াছে বলিয়া বেত্রাঘাত হইত। সামান্য একটু অবাধ্যতা হইলে তাহাকে মারিয়া তাহার হাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইত। যাহারা টম্‌কাকার কুটীর পড়িয়াছ তাহারা জান টমের

মতন একজন ভাল লোককেও অকারণ এইরূপ প্রহারে একটা পশুর মতন লোকের হাতে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। অনেক হতভাগ্য পলাইয়া এই পাশব অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিত। দেশের এরূপ আইন ছিল যে, এই সকল লোকদিগকে যে আশ্রয় দিবে তাহারই শাস্তি হইবে। পলাতক দাস যদি একবার ধরা পড়িত তবে আর তাহার যাতনার সীমা থাকিত না। এই সকল লোককে দিনের বেলায় জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়া কেবল রাত্রিতে চলিতে হইত। ইংরাজ রাজ্য হইতে সর্ব্ব প্রথমে দাস ব্যবসায় উঠিয়া যায়। আমেরিকার উত্তরে ইংরাজাধিকৃত কানাডা দেশ; পলাতক দাসেরা একবার এই দেশে আসিতে পারিলেই পুনরায় স্বাধীন হইবে ইহা তাহারা জানিত। তাহারা জানিত যে ধ্রুবতারা সকল সময়েই উত্তর দিকে থাকে, সুতরাং এই তারার দিকে গেলেই উত্তরের সেই কানাডা দেশে যাওয়া যাইবে। এই রূপে রাত্রিতে ধ্রুব তারা লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত উত্তরদিকে আসিতে আসিতে অনেকে শেষে কানাডায় আসিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। কত জন জঙ্গলে বন্য জন্তুর গ্রাসে প্রাণ হারাইয়াছে। এইরূপ একজন পলাতক দাস এখন কানাডা দেশের একজন সম্মানিত লোক। তিনি পলাইয়া আসিবার সময় কিরূপে সাপের হাতে পড়িয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন তাহা বলিয়াছেন।

"আমি তাড়াতাড়ি লাফাইয়া একটা গর্ত্ত পার হইবার সময় একটা কোমল পিছল জিনিসের উপর পড়িয়া আছাড় খাইলাম। আমি উঠিতে না উঠিতেই একটা কি যেন আমাকে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল। আমি বুঝিতে পারিলাম আমাকে সাপে ধরিয়াছে। আমাকে এমন আটিয়া ধরিয়াছে যে আমি দুই হাতে মাথা ঢাকিয়া কোন মতে ক্ষীণ চীৎকার করিতে পারিলাম মাত্র। আমি শুনিয়াছিলাম যে, সাপ গলায় প্যাঁচ দিয়া গলা ভাঙ্গিয়া ফেলে, সেই জন্যই হাত উচু করিয়া মাথা ঢাকিয়া ছিলাম। ভয়েও কষ্টে নিজের অবস্থা বুঝিবার শক্তি ছিল না। ক্রমে আমার পাঁজরা ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল। আমি প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়াছি, এমন সময় আমার বন্ধুদিগের শব্দ শুনিতে পাইলাম। তাঁহাদের একজন কাটারি দিয়া সাপের গলা কাটিয়া ফেলিলেন, কিন্তু তবু তাহার শরীরটা আমাকে পূর্ব্বের ন্যায়ই আটিয়া ধরিয়া থাকিল। এমন সময় আমার বন্ধুরা ল্যাজের দিকে প্রায় দুই ফিট কাটিয়া ফেলিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ বন্ধন মুক্ত হইলাম, কিন্তু তখন আর উঠিবার কি কথা বলিবার শক্তি নাই। সুখের বিষয় জল নিকটেই ছিল; আমি শীঘ্রই সুস্থ হইলাম। আমরা যতদূর বুঝিতে পারিলাম, অজাগরটা ষোল ফুট লম্বা হইবে এবং তাহার শরীরের খুব মোটা জায়গাটা একজন বলিষ্ঠ লোকের ঠ্যাঙের মতন মোটা। সাপটা বিষধর ছিল না, কিন্তু আমার এক হাতে এমন দুই একটী আঁচড় দিয়াছিল যে, অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তাহার দাগ যায় নাই। অনেকদিন পর্য্যন্ত সাপ দেখিলে, এমন কি সাপের নাম শুনিলেই আমার গা সিহরিয়া উঠিত। অনেকদিন পর্য্যন্ত আমি ঘুমের ভিতরে মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিতাম। আজ পর্য্যন্তও আমার সেদিনকার ভয়টা দূর হয় নাই।"

দাসত্বপ্রথা আমেরিকা হইতে উঠাইয়া দিতে অনেকদিন লাগিয়াছিল। অনেক মহৎলোকের বহুদিন ব্যাপি চেষ্টার পর দাসত্বপ্রথা রহিত করিবার আইন হইল। কিন্তু যাহারা দাস-

দিগকে খাটাইত তাহারা এ আইন কিছুতেই মানিতে চাহিল না। অবশেষে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া ভয়ানক যুদ্ধ করিল, অনেক লোকের প্রাণনাশের পর সাধু লোকদেরই জয় হইল, দাসগণ স্বাধীনতা পাইল। ইহার কিছুদিন পরেই দাস ব্যবসায়ীদের একজন লোক আমেরিকার সভাপতি লিংকল্‌ন্‌কে হত্যা করিল। লিংকল্‌ন্ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন (দাস ব্যবসায়ীগণ বিনামী চিঠি লিখিয়াছিল) যে, দাসত্বপ্রথা উঠাইয়া দিলে তাঁহার প্রাণ যাইবে। কিন্তু লিংকল্‌নের ন্যায় মহৎলোক অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই সকল চিঠি একটা পুলিন্দায় রাখিয়া দিতেন; সেই পুলিন্দার উপরে লেখা ছিল "খুনের চিঠি।" কিন্তু সেই সকল চিঠির ভয়ের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া তিনি নির্ভয়ে দাসত্বপ্রথা উঠাইয়া দিলেন। এইজন্য একটা দুর্বৃত্ত থিয়েটারের ভিতরে তাহাকে খুন করিল। দাসগণ যখন লিংকল্‌নের মৃত্যু সংবাদ শুনিল তখন তাহারা পাগলের ন্যায় রাস্তায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। জীবিতাবস্থায় যখনই দাসগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইত তখনই দুই হাতে সেলাম করিয়া নৃত্য করিত আর বলিত "ধন্য পরমেশ্বর! ধন্য পরমেশ্বর! প্রভু লিংকাম্!" "লিংকল্‌ন্ শব্দ নীগ্রোরা উচ্চারণ করিতে না পারিয়া "লিংকাম্" বলিত। অনেক নীগ্রোর বিশ্বাস হইয়াছিল যে, লিংকল্‌ন্‌ই পরমেশ্বর। একবার একজন নীগ্রো ধর্ম্ম যাজক তাঁহার শিষ্যদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—"হে ভাই সকল, প্রভু লিংকাম্ তিনি সকল স্থানেই আছেন; প্রভু লিংকাম্ আমরা যাহা বলি সবই শোনেন, প্রভু লিংকাম্ আমাদের মনের কথা সব জানেন।"

দক্ষিণ আমেরিকায় এতদিন দাসত্বপ্রথা ছিল; কিছুদিন হইল তাহাও উঠিয়া গিয়াছে।

এতক্ষণ অন্যান্য দেশে অতীতকালে যাহা ঘটিয়াছে তাহাই বলিয়াছি। কিন্তু আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালেই ছোট খাট রকমে সেই সকল ব্যাপার ঘটিতেছে। আসামে অনেক সাহেবের "চা"র চাষ আছে। চা ক্ষেত্রে কাজ করিবার জন্য অনেক কুলির প্রয়োজন হয়। এই সকল কুলির উপর অনেক সময় ভয়ানক অত্যাচার হইয়া থাকে। ভয়ানক খাটুনি, অমানুষিক অত্যাচার এই সকলই এই কুলিদিগকে অনেক সময় সহ্য করিতে হয়। অল্প কয়েকজন দয়ালু লোক আছেন, যাঁহাদের বাগানে কুলিদের উপর ভাল ব্যবহার হয় এবং তাহারা অনেক পরিমাণে সুখে থাকে; কিন্তু এরূপ পাশব প্রকৃতির অনেক লোক আছে যাহারা কুলিদিগকে আমেরিকার দাসদের ন্যায় ব্যবহার করে। ইংরাজ রাজ্যে বলপূর্ব্বক লোককে ধরিবার সাধ্য নাই, সুতরাং কুলি সংগ্রহ করিবার জন্য ইহাদের নিযুক্ত লোকেরা (ইহাদিগকে আড়কাটি বলে) অন্য রকম উপায় অবলম্বন করে। তাহারা ধার্ম্মিকের বেশে গ্রামে গ্রামে যায়, এবং অল্পবুদ্ধি লোকদিগকে কম কাজ এবং বেশী বেতনের লোভ দেখাইয়া ভুলাইয়া আনে। একবার ইহাদিগকে হস্তগত করিয়া আড্ডায় (ডিপো) আনিয়া ফেলিতে পারিলে আর সহজে নিস্তার নাই। এইরূপ করিয়া যাহারা লোক সংগ্রহ করে তাহারা সম্ভবতঃ কখনই তাহাদের উপর পরে ভাল ব্যবহার করে না। জন্ সাউথ রাস্তায় যেরূপ কষ্ট পাইয়াছিলেন এই সকল আড়কাটিদের হাতে কুলিরাও প্রায় সেইরূপ ক্লেশ পায়। কিছুদিন ভাল ব্যবহার করে; সম্পূর্ণরূপে হস্তগত হইলেই অন্য মূর্ত্তি

ধারণ করে। আধপেটা খাওয়া, কথায় কথায় প্রহার, অযত্নে থাকা ইত্যাদি ত আছেই; ইহার মধ্যে যাহার কোনরূপ রোগ হয় সে বেচারার আর রক্ষা নাই। অনেকে সময় থাকিতে টের পাইয়া এই সকল পশুর নিকট হইতে পলায়ন করে। আমাদের একটা ঝি একবার ইহাদের হাতে পড়িয়াছিল। ইহারা যে আড়কাটি, তাহা সে প্রথমে জানিতে পারে নাই। তাহার সঙ্গে আরো দুইজন ছিল। ইহাদিগকে আড়কাটিরা বলিয়াছিল যে ভাল ব্রাহ্মণের বাড়ীতে কাজ করিতে হইবে, ৬ টাকা মাইনে আর খোরাক পোষাক পাইবে। তাহারা সহজেই রাজী হইল এবং সেই লোকগুলির সঙ্গে একটা বাড়ীতে আসিল। সেখানে তাহাদিগক অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল। আমাদের ঝি একটু ব্যস্ত হইল এবং শীঘ্র শীঘ্র কাজ পাইবার জন্য তাগাদা করিতে লাগিল। আড়কাটিরা তাহাকে বুঝাইয়া বলিল যে, "সাহেব আসিবেন, তিনি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করেন সব কথাতেই হাঁ বলিও, তা হইলেই তোমার কাজ হইবে।" ঝির ত শুনিয়া চক্ষুস্থির— "ওমা! সে কিগো! বামনের বাড়ীতে কাজ কোত্তে এলাম, তা আবার সাহেব কেন আস্‌বে গো?" ঝির প্রাণে বিষম খট্‌কা বাধিল। সে আড়কাটিদের কথা কিছু কিছু জানিত, তাহার মনে গুরুতর সন্দেহ হইল। সে কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে খাইতে দিল, সে কিছুই খাইল না। এইরূপে বেলা শেষ হইয়া আসিল। বিকাল বেলায় অনেক কথাবার্ত্তা, তর্ক বিতর্ক, সন্দেহ, প্রবোধ ইত্যাদি চলিতে লাগিল; ইহার মধ্যে আমাদের ঝি—বোঁ করিয়া ছুট! একেবারে বাড়ীতে! অন্য কয়টীর শেষটা কি দশা হইল সে বলিতে পারে না।

আড়কাটির কথা এখন এত প্রসিদ্ধ হইয়াছে যে, এখন হঠাৎ কেহ অদৃশ্য হইলেই উহাদের কথা মনে হয়। এ বিষয়ে লেখকের নিজের অভিজ্ঞতার ভিতরে যে একটা ঘটনা হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করি।

আমাদের একটী ভাগ্‌নে আমার দাদার বাড়ীতে থাকিত। একদিন সকালে হঠাৎ সে অদৃশ্য হইল। বারটার সময়ও বাড়ী ফিরে নাই দেখিয়া দাদা আমাদের বাড়ীতে একজন লোক পাঠাইলেন। সকালে সে আমাদের এখানে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু আটটার পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল। যোড়াসাঁকোতে তাহার জ্যাঠা মহাশয় থাকেন সেখানে লোক পাঠাইয়া জানা গেল, সে সেখানেও যায় নাই। দেখিতে দেখিতে ২টা বাজিল; তখন সকলেই চিন্তিত হইলাম। কলিকাতার থানা এবং ডাক্তারখানা একটাও বাঁকি রহিল না, নারিকেলডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানেও অনুসন্ধানের ত্রুটী হইল না, কিন্তু তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। বাড়ীর মেয়েরা ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সকল অনুসন্ধানে রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল। এমন সময় আমাদের মনে হইল যে, হয়ত সে আড়কাটিদের হাতে পড়িয়াছে। এই চিন্তায় আমাদের মনের কিরূপ অবস্থা হইল সহজেই বুঝিতে পার।

আমাদের একজন বন্ধু (তাঁহাকে বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিব) আড়কাটিদের সম্বন্ধে অনেক খবর রাখেন। ইনিই প্রথমে কুলিদের অবস্থার প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় যেই খবর শুনিলেন, অমনি তিনি লাঠি হাতে করিয়া অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। এবিষয়ে কলিকাতার যত সন্দিগ্ধ স্থান আছে, তিনি

তাহার প্রায় সকল গুলির কথাই জানেন; কিন্তু যত যায়গায় গেলেন, কোথাও কোনরূপ সন্ধান পাইলেন না। শেষে যেখানে গিয়াছিলেন সেখানে কতগুলি ষণ্ডা লাঠি লইয়া তাঁহাকে তাড়া করিয়াছিল। তিনি অনেক পুণ্যের জোরে সেই ভয়ানক সংকীর্ণ গলির ভিতর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া বড় রাস্তায় আসিয়া বাঁচিলেন।

১২ টার সময় বিদ্যারত্ন মহাশয় ক্ষুন্ন মনে ঘরে ফিরিলেন। ষ্টেশনে ষ্টেশনে লোক গিয়াছিল তাহারা ইহার অনেক পূর্ব্বেই ফিরিয়াছে। সকলেই স্তব্ধ, কাহারো মুখে কথাটী নাই। যেরূপে রাত্রি কাটিল, তাহার কিঞ্চিৎ কেহ কেহ বুঝিতে পারিবেন, বলিবার সাধ্য নাই।

ভোরে উঠিয়া আবার সকলে অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। কেবলমাত্র দাদা বাড়ীতে রহিলেন। ৭ টার সময় এক জন লোক আসিয়া দরজায় ঘা দিল। প্রশ্নের পর সে বলিল "আমি—ময়রা; মহাশয়ের বাড়ীর একটী ছেলের নিকট জল খাবার দরুণ ৷৵০ পাইব। কাল সকালে বিশেষ করিয়া তাগাদা করাতে বলিয়াছিল আমার সঙ্গে এস। আমরা লোক সঙ্গে দিলাম; তাহাকে এই বাড়ীর দরজায় দাঁড় করাইয়া ভিতরে গেল। কিছুকাল পরে বাহিরে আসিয়া বলিল 'এখানে নয়, ও বাড়ী (লেখকের বাড়ী) চল।' ও বাড়াতে কিছু কাল থাকিয়া আমায় বলিল—'বিকালে'।" তাই আমি আসিয়াছি, টাকাটা এখন পাইব কি? এত ছোট ছেলেকে ও রকম করিয়া ধারে সন্দেশ কেন খাওইলে জিজ্ঞাসা করাতে ময়রা তাহার কোন ভাল উত্তর দিতে পারিল না। অপ্রতিভ হইয়া সম্প্রতি সরিয়া পড়িল।

আমার ভাগ্‌নের সম্বন্ধে প্রকৃত কথা এখন একটু একটু বুঝিতে পারা গেল। তাহার জ্যাঠা মহাশয়ের বাড়ীতে তৎক্ষণাৎ পুনরায় লোক পাঠান হইল। সেখানে গিয়া দেখা গেল যে, সে ঠোঙ্গায় করিয়া জল খাবার খাইতেছে। দুর হইতে কে আসিতেছে দেখিয়াই ঠোঙ্গাটী রাখিয়া বসিয়া রহিল। অনেক প্রশ্নের পর তাহার ইতিহাস বলিল আর বলিল যে, "তোমরাই কি শুধু পরিশ্রম করিয়াছ? আমিও ঢের ঘুরিয়াছি।"

আমাদের ওখান হইতে বাহির হইয়া সে কালিঘাট গিয়াছিল। তাহার সঙ্গে একটীও পয়সা ছিল না, সুতরাং এই রাস্তা টুকু হাঁটিয়াই যাইতে হইয়াছিল। ময়রার ভীষণ মূর্ত্তি তাহার প্রাণে জাগিতেছিল। তার পর ময়রা যদি মাতুল মহাশয়কে বলে, তবে নিতান্তই লজ্জার বিষয় হইবে এবং শাস্তিরও বিশেষ সম্ভাবনা বোধ করিল। কাজেই তাহার কাছে আসিতে কিছুতেই ভরসা হইতেছিল না। কালীঘাটে পরিচিত স্থান নাই, সুতরাং শীঘ্রই সেখান হইতে ফিরিতে হইল। এর পর হাইকোর্টের দিকে চলিল। গড়ের মাঠের মাঝা-মাঝি আসিয়া বড়ই ক্লান্তি বোধ করিতে লাগিল; সুতরাং কাছে বট গাছতলায় একটা বেঞ্চ দেখিতে পাইয়া সেখানে কয়েক ঘণ্টা নিদ্রা গেল। তারপর হাইকোর্ট, হাওড়া ষ্টেশন ইত্যাদ পরিদর্শন করিয়া ৫টার সময় তাহার জ্যাঠা মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত। সেখানে আসিয়াই ঢক্ ঢক্ করিয়া জল পূর্ণ একটা গ্লাসকে খালি করিল। সে বাড়ীর লোকেরা তাহার চোখ মুখের অবস্থা দেখিয়া বড়ই ব্যস্ত হইলেন; কিন্তু তাহাকে কিছু খাইতে দিয়া প্রকৃতিস্থ না করিয়া কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না। কিছুকাল বিশ্রামের পর শেষে সে উপরিলিখিত বিবরণটী বলিল। সন্ধ্যার সময় তাহার জ্যাঠা মহাশয় একজন লোক সঙ্গে দিয়া বাড়ী

পাঠাইয়া দিলেন। অর্দ্ধেক পথ আসিয়া হঠাৎ সে ছুট দিল। সঙ্গের লোকটী কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারিল না। মাইল খানেক তাহার পশ্চাতে দৌড়িয়া শেষটা তাহাকে বলিল যে "তোমার বাড়ী যাইবার দরকার নাই, আমাদের বাড়ীতে আইস।" সে আশ্বস্ত হইল, এবং তাহার জ্যাঠা মহাশয়ের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

সে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে কিছুতেই রাজি হইল না।

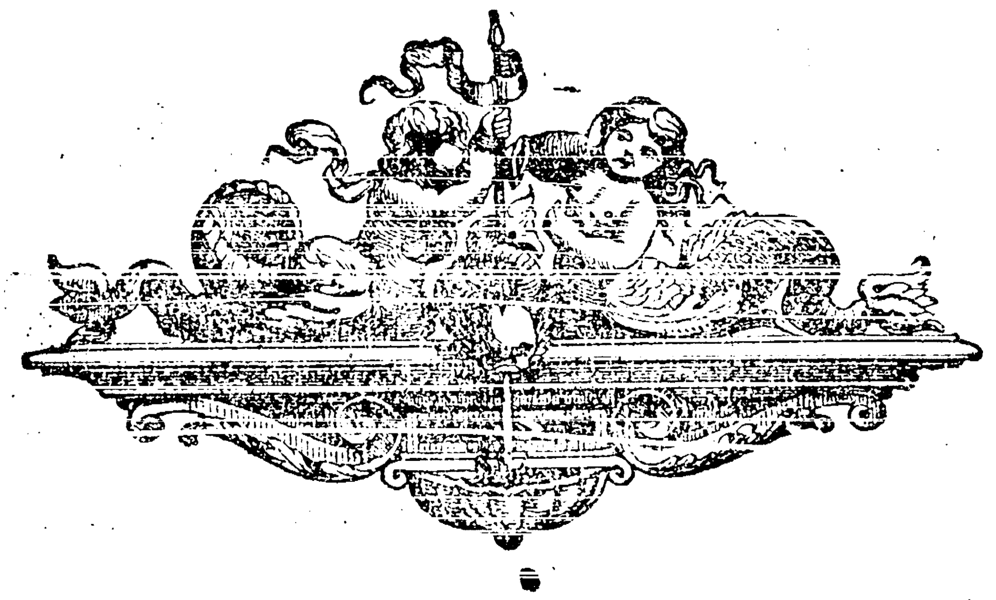

জ্যেষ্ঠতাত।

এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদিগকে দেখিলেই চোক বুঁজিতে ইচ্ছা করে; তাহারা যদি কথা কয় তবে কাণে হাতদিতে ইচ্ছা হয়। অনেক ঘরের কোণে অতিশয় কদাকার একপ্রকার ব্যাঙ্‌ বাস করে; তাহারা যখন মাঝে মাঝে কট-কট-শব্দ করিয়া উঠে তখন প্রাণ চমকিয়া যায়; হঠাৎ যদি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চোখের সামনে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে ছুটিয়া পালাইতে ইচ্ছা করে। জানোয়ারের মধ্যে এগুলি যেমন, মানুষের মধ্যে জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়েরা ততোধিক। ইহাঁদের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হইলে আর জীবনে ইহাদিগকে ভুলিতে পারা যায় না।

এক নম্বরে—খবর ওয়ালা জ্যেষ্ঠতাত। জগতে এমন ঘটনা নাই, যাহার কথা ইনি শুনিয়া রাখেন নাই। তুমি যদি তাহার কোন সামান্য বিষয়ে অজ্ঞতা প্রদর্শন কর, তাহা হইলে ইনি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। যদি কোন কথা তুমি অন্যরূপ জান বলিয়া প্রকাশ কর, তবে তোমার আর রক্ষাই নাই—তোমাকে এমন একটা সার্টি-ফিকেট দিয়া বসিবেন যে তেমন সার্টিফিকেট—সচরাচর কেহ কাহাকেও দেয় না। কিন্তু হয়ত এর পরেই তোমার নিকট হইতে উঠিয়া যাইবেন।

দুয়ের নম্বরে—পণ্ডিত জ্যেষ্ঠতাত। ইনি 'খবর ওয়ালা' মহাশয়েরই বড় ভাই। ইহার স্বভাবও অনেকটা তাঁহারই মতন। ইনি যে শ্রেণীতে পাঠ করেন, তাহার ৩।৪ ক্লাশ উপরের পাঠ্য পুস্তক লইয়া নাড়া-চাড়া করেন। যে সকল পুস্তক কোনদিন চক্ষে দেখেন নাই, তাহাতে কি লেখা আছে, সেই কথাটা বিশেষ করিয়া তোমাকে বার বার বলিবেন। ইস্কুলে গিয়া মাষ্টার মহাশয়কে যে সকল পুস্তকের কথা বলিতে হইবে, তাহার খবর খুব কমই রাখেন। এই শ্রেণীর অনেক জ্যেষ্ঠতাত দেখিয়াছি। এরা প্রায়ই একটু নীচ প্রকৃতির হইয়া থাকে। ছাত্র-সভায় বক্তৃতা করিতে হইলে বই মুখস্ত করিয়া আইসে। এই শ্রেণীর একজন আমাকে একবার চিঠি লিখিয়া-ছিল; সেই চিঠিখানা মেকলে সাহেবের একখানা পত্রের অবিকল নকল!

তিনের নম্বরে—মুরব্বি জ্যেষ্ঠতাত। তোমার কোন্ বিষয়ে কি ত্রুটী আছে, তাহা বাহির করিয়া তোমাকে তিরস্কার করা ইহাঁর ব্যবসায়। কোন একটা কাজ যদি না করিয়া থাক, তবে তোমার

বড়ই অন্যায় হইয়াছে; আর যদি করিয়া থাক, তাহা হইলে কাজটা ভাল হয় নাই। ইনি যদি তোমার সমপাঠী হন, তবে তোমাকে এমন সকল আঁক কসিতে দিবেন, যাহা তাঁহার বিদ্যায় কিছু-তেই কুলায় না। তাহাতে যদি তোমার একটু দেরি হয় তবে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিবেন যে, তিনি খুব অল্প সময়েই এরূপ আঁক সব কসিয়া ফেলেন। যদি খুব শীঘ্রই আঁকটা কসিয়া ফেলিতে পার, তবে বলিবেন 'বড় ঘুরিয়াছ!' যদি একটা কোন সহজ উপায় দেখাইয়া দিতে বল, তবে হয়ত বলিবেন যে, তাঁহার অনেক কাজ আছে, সময় কম। এই বলিয়া প্রস্থান করিবেন। এই শ্রেণীর একটা লোক এমন ভাবে কথা বার্ত্তা বলিত যেন তাহার মতন ভাল জিনিস কিনিতে কেহ জানেনা। অন্য কেহ একটা কোন জিনিস কিনিয়া আনিলেই বলিত "তোমাকে ঠকাইয়াছে। আমি এর চাইতে কম দামে আনিতে পারিতাম। অনর্থক পয়সাগুলি জলে ফেলিয়াছ।" নিজের বিদ্যাবুদ্ধি অতি কমই ছিল। কিন্তু সেই বাড়ীতে যে সকল কলেজ ক্লাশের ছেলে থাকিত, তাহাদের পড়া শুনা কেমন চলিতেছে তাহার খবরটা রীতি-মত রাখা হইত। মাঝে মাঝে তাহাদের বই খুলিয়া দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইত। এই ব্যক্তি একদিন চিৎপুর রোড্ দিয়া যাইবার সময় দেখিল যে দুইজন লোক রাস্তায় দাঁড়াইয়া তর্ক করিতেছে। কাছে গিয়া জানিতে পারিল যে একজন কতকগুলি সোণার ফুল কুড়াইয়া পাইয়াছে, আর একজন তাহাকে সেগুলি লইয়া যাইতে দিতেছে না। জ্যেষ্ঠতাতকে দেখিয়া তাহারা উভয়েই মধ্যস্থ মানিল। বিচারের মীমাংসা এই হইল যে, ফুলগুলিকে তিনভাগ করিয়া তিনজনে পাইবে, এবং যে ব্যক্তি প্রথমে কুড়াইয়া পাইয়াছিল তাহাকে অপর দুইজনে সামান্য মূল্য দিবে। জ্যেষ্ঠতাতের সঙ্গে ৩টী টাকা ছিল; তাহা দিয়া সে কুড়িটী ফুল কিনিল। বাড়ী আসিয়া সে সেদিন আর আস্তে কথা কহিতে পারে না। অধিক বুদ্ধি থাকিলে ব্যাপারটা কিরূপ হয় সকলকে ডাকিয়া তাহাই বুঝাইয়া দিতে লাগিল। একজন একটী ফুল হাতে লইয়া দেখিল যে ফুলটী পিতলের, তাহার উপর সামান্য গিল্টী। এই কথা যখন জানা গেল, তখন হাসির ধুম পড়িল। এর পরে অনেকদিন পর্য্যন্ত জ্যেষ্ঠ-তাত কোন উৎপাত করে নাই।

চতুর্থ নম্বরে—বড়লোক জ্যেষ্ঠতাত। যাহারা সমকক্ষ, তাহাদের সহিত ইহারা কথা কহিবে না। যাহারা নিজের অনেক উপরে, তাহাদের সঙ্গে মিশিতে চাহিবে এবং তাহাদের পদলেহন করিবে। ক্লাশে মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে ইয়ারকি দিবে; লোকের নিকট টাকা ধার করিয়া বাবুগিরি করিবে। টাকা চাহিলে বিরক্ত হইবে। নিজের যেমন অবস্থা তেমনি অবস্থার লোকদিগকে ঘৃণা করিবে, কোন ভাল কাজের জন্য কিছু দিতে বলিলে খাতায় স্বাক্ষর করিবে না—যদি করে, তবে নিশ্চয়ই তাহা দিবে না। ঘৃণায় যাহাদের সহিত কোন দিন মিশে না, মাঝে মাঝে হঠাৎ এক এক-বার তাহাদের নিকট অত্যধিক আত্মীয়তা দেখা-ইতে আসিবে। তাহাদের সামান্য কোন জিনিস থাকিলে তাহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া বেশী দাম দিয়া একটা ভাল জিনিস কিনিতে বলিবে। সেই উপলক্ষে নিজের কেমন সব উচ্চদরের জিনিস না হইলে ব্যবহার হয় না, বড় বড় বই না হইলে পড়া হয় না তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিবে। এর পর নিজের একটা খুব বড় কাজ করিতে হইবে, আর অধিক সময় নাই, এই বলিয়া

বিদায় লইবে। যাইবার সময় হয়ত বলিবে "ভাই কিছু টাকা দিতে পার? কাল দিব।" না হয় এমন একটা কোন কাজের ভার দিবে যে, তাহা হয় তাহার বিদ্যাবুদ্ধির অতীত, না হয় তাহা নিজে করিতে সে লজ্জিত হয়—পাছে লোকে তাহাকে ছোটলোক মনে করে।

এর পর সমালোচক জ্যেষ্ঠতাতের কথা বলিয়া শেষ করিব। এমন বিষয় নাই যাহা লইয়া এব্যক্তি নাড়া চাড়া না করিবে। এমন লোক নাই, নিজের চাইতে সে যত বড় লোকই হউক না কেন, যাহার সম্বন্ধে সে দু চার কথা না বলিবে—নিজের যাহা নয়, বা নিজে যাহা করে নাই, সাধ্য সত্বেও তাহার প্রশংসা করিবে না। যদি দায়ে পড়িয়া নেহাৎ দুই কথা বলিতে হয়, তবে এমন একটা খটকা রাখিয়া দিবে যে তাহাতেই তাহার নিজের কাজ সিদ্ধ হয়। এমন কিছু প্রসংসার কাজ হইতে পারে না যাহা সে মনে করে যে সে করিতে পারে না; এত দিন যে তাহা করিয়া ফেলে নাই তাহা তাহার অনুগ্রহ। অন্যের যাহা দেখিয়া নিন্দা করিবে, সে জিনিসটা নিজের হইলে আবার তাহারই প্রশংসা করিবে।

আশা করি সখার পাঠক পাঠিকাদের কেহই এই সকলের ভিতরে নিজের ছবি দেখিতে পাইবে না। যদি পাও, আমাদের উপর বিরক্ত না হইয়া তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবে।

ক্ষুদ্র জ্ঞানী।

মনোহর রায় চৌধুরী হরিহর পুরের জমীদার, তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া ব্যায়াম করিবার জন্য অশ্বারোহণে তাঁহার গ্রামের চারিদিকে ভ্রমণ করিতেন। একদিন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে একটী চমৎকার বনফুল দেখিয়া তাহা চয়ন করিবার জন্য অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। অশ্ব সম্মুখে রাখিয়া যেমন তিনি ফুল তুলিবেন, অমনি অশ্ব এক লাফে ছুটিয়া পলাইল। তিনি অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন বটে, কিন্তু কোন মতে তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। একটী ছোট কৃষক বালক মাঠ নিড়াইতে নিড়াইতে এই ঘটনা দর্শন করিল। সে সাহস করিয়া গিয়া অশ্বের মুখের লাগাম ধরিল, ঘোড়া থামিয়া গেল। ইতি মধ্যে জমীদার মহাশয় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কৃষক বালকের সতেজ ও আনন্দপূর্ণ মুখখানি দেখিয়া মনে মনে বড় সুখী হইলেন, কহিলেন বালক, তোমায় ধন্যবাদ দিতেছি। তুমি ছেলে মানুষ হয়েও বড় কৌশলে আমার ঘোড়া ধরিয়াছ, আমার নিকট তুমি কি চাও বল, আমি এখনি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। এই বলিয়া তিনি নিজের পকেটে হাত দিলেন। বালক বলিল, মহাশয় আমি কিছুই চাই না।

জমীদার মহাশয় দরিদ্র বালকের এরূপ কথায় কিছু বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, যে কোন উপায়েই হউক, আমার ইহাকে কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য। তিনি বলিলেন, বেশ তোমার কথায় আমি বড় খুসী হইলাম বাপু তোমার নাম কি? আর তুমি এই

মাঠে কি করিতেছিলে? বালক উত্তর করিল, আমার নাম রজনীকান্ত, আমি মাঠে ঘাস নিড়াইতেছিলাম, ও ভেড়া চরাইতেছিলাম।

জমীদার। তুমি কি তোমার এ কর্ম্ম পছন্দ কর?

বালক। হাঁ, আমার এ কর্ম্ম খুব ভাল লাগে।

জমীদার। তুমি কি ইহার চেয়ে খেলিতে ভাল বাসনা।

বালক। আমার একাজ যে কিছু কঠিন তা নয়, ইহা খেলার সঙ্গে সমান।

জমীদার। কে তোমায় কাজ করিতে দিয়াছে?

বালক। আমার বাবা আমায় এই কাজ দিয়াছেন।

জমীদার। তোমাদের বাড়ী কোথায়?

বালক। ঐ যে আম বাগান দেখিতেছেন উহার নীচে আমাদের ঘর।

জমীদার। তোমার পিতার নাম কি?

বালক। ক্ষেত্রনাথ সর্দ্দার।

জমীদার। তোমার বয়স কত।

বালক। এইবার পূজার সময় আমি বার বৎসর উৎরাইয়া তের বৎসরে পড়িয়াছি।

জমীদার। কতক্ষণ মাঠে আসিয়াছ?

বালক। ঠিক ছটার সময় হইতে কাজ করিতেছি।

জমীদার মহাশয় ভাবিলেন বালক নিশ্চয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে, ইহাকে খাদ্য দ্রব্যের কথা বলিলে উহা পাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিবে। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, এত বেলা হইল তোমার ক্ষুধা লাগে নাই।

বালক। হাঁ, এই বাড়ী গিয়া ভাত খাইবার সময় হইল, এখনি ভাত খাইব।

জমীদার। তুমি যদি একটা টাকা পাও তাহা লইয়া কি কর?

বালক। কি করিব জানি না, আমার বয়সে একবারে একটা টাকা কখন পাই নাই।

জমীদার। তোমার কি কোন খেলনা নাই?

বালক। সে আবার কি, খেলনা কার নাম?

জমীদার। কেন, বল্, মার্বল, লাঠিম, কাঠের ঘোড়া এসব কি কখন দেখ নাই?

বালক। না মহাশয়, আমাদের পাড়ার যদুর একখানী কাঠের গাড়ী আছে। আমরা কখন কখন বড় ঘুড়ি উড়াই। আমার একখানী গড়াইবার চাকা ছিল কিন্তু তাহা ভাঙ্গিয়া রহিয়াছে।

জমীদার। তুমি কি কোন নূতন রকম খেলিবার জিনিস চাও না।

বালক। না মহাশয়, আমার খেলিবার সময় নাই আমি কখন মাঠে নিড়াই, কখন গরু ও ভেড়া মাঠে ছাড়িয়া দিয়া খেলা করি, কখন বাবার সঙ্গে ভিন্ন গ্রামের হাটে যাই, ইহাতে আমি কত আনন্দ পাই।

জমীদার। কিন্তু তুমি টাকা পাইলে বোধ হয় নিচু ও সন্দেশ কিনিতে পার।

বালক। আমি বাড়ীতে বসিয়া কত নিচু খাই, আর যে সন্দেশের কথা বলিতেছিলেন, তাহা খাইবার তত আবশ্যক নাই।

বালকগণ স্বভাবতঃ ছুরী বড় ভালবাসে সেই জন্য জমীদার বলিলেন, তুমি কি একখান ছুরী পাইলে খুসী হও না? তোমার একখানা ছুরী হইলে ছড়ী কাটিতে ও আম কাটিতে পারিবে।

বালক। এই যে আমার একখানা আছে এই খানি আমার মামা আমায় দিয়াছিলেন।

জমীদার। এক জোড়া নূতন জুতা বোধ হয় তোমার আবশ্যক হইতে পারে।

বালক। আমার কোথায় যাইবার জন্য এক জোড়া চটি জুতা আছে, কাজ করিবার সময় শুধু পায় চলা সুবিধা জনক।

জমীদার। তোমার পরিধানের কাপড়খানি ছিঁড়িয়াছে।

বালক। হাঁ, এই কাপড় খানি ছেঁড়া বটে কিন্তু ঘরে আমার একখান ভাল কাপড় আছে।

জমীদার। তুমি বৃষ্টির সময় কি মাথায় দিয়া পথ চল।

বালক। যখন বৃষ্টি হয় তখন পথের ধারে কোথাও দাঁড়াই; বৃষ্টি থামিয়া গেলে আবার পথ চলি। ইহাতে আমার মাথায় দিবার কিছু দরকার হয় না।

জমীদার। মাঠে কাজ করিতে করিতে যদি তোমার ক্ষুধা পায় তুমি কি খাও।

বালক। কেন মাঠের কেস্থর তুলিয়া খাই।

জমীদার। যদি তাহা না মেলে।

বালক। তাহা হইলে আমি সাধ্যমত কাজ করি ক্ষুধার কথা মনে আসিতে দিই না।

জমীদার। এই গরমের দিন এখনও কি তোমার পিপাসা পায় নাই।

বালক। ঐ যে মাঠের মধ্যে জল রহিয়াছে, তৃষ্ণা পাইলে ইহা হইতে জল পান করিব।

জমীদার মহাশয় কৃষক বালকের কথায় অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন। সে তাহার নিজের অবস্থায় এত সন্তুষ্ট যে, আপনার কোন অভাব দেখিতে পাইল না। তখন তিনি বালককে বলিলেন, "রজনীকান্ত, তুমি দেখিতেছি একজন পরম জ্ঞানী, কিন্তু নিশ্চয়ই জ্ঞানী কাহাকে বলে তাহা তুমি জান না।

বালক। মহাশয়! জ্ঞানী হওয়ায় কোন দোষ নাইত?

জমীদার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, বালক, তোমার যখন কোন অভাবই নাই, অভাব কাহাকে বলে তাহাই যখন তুমি জান না, তখন আমি তোমায় এমন জিনিস দিতে চাহি না যে, তোমার মনে অভাব আনিয়া দেয়। তুমি কি কখন পাঠশালায় গিয়াছ।

বালক। না, আমি কখনও পাঠশালায় যাই নাই, বাবা বলেছেন ফশল কাটার পর আমায় পাঠশালায় দিবেন।

জমীদার। তখন তোমার পুস্তকের আবশ্যক হইবে সন্দেহ নাই।

বালক। হাঁ,

জমীদার। তোমার বাবাকে বলিও যে মনোহর রায় চৌধুরী তোমাকে তোমার সমস্ত দরকারী বই দিবেন। আমি কখন তোমার ন্যায় সন্তুষ্ট বালক দেখি নাই। যাও তোমার কাজে যাও, আমি এক্ষণে গৃহে যাই।

বালক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

অনরেবল্ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর সি, এস, আই,

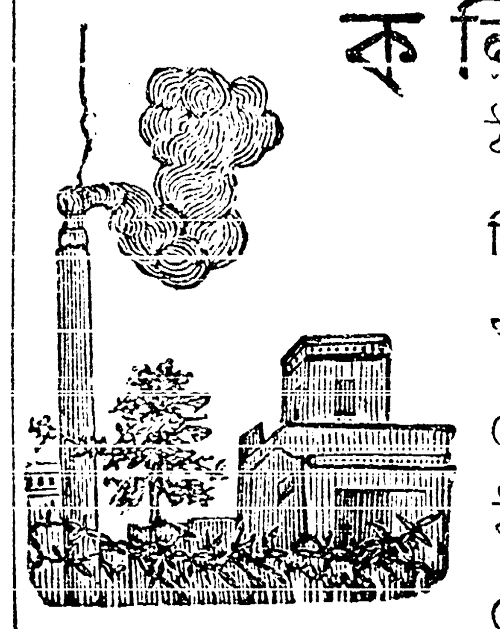

কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবংশ বাঙ্গালা দেশে বিখ্যাত। এমন বাঙ্গালি অতি অল্পই আছেন যাঁহারা গোপীমোহন ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুর, জ্যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম না শুনিয়াছেন। এই বংশের কৃতী-পুত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ইউরোপ ও আমেরিকায় স্মরণীয় হইয়াছেন।

এবার আমরা এই বংশের প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জীবন চরিত সম্বন্ধে দু চারি কথা বলিতেছি। ইনি ১৮০৩ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা গোপীমোহন ঠাকুর খুব বিদ্বান, দয়ালু, প্রতিপত্তিশালী ধর্ম্মনিষ্ঠ জমিদার ছিলেন। গোপী মোহন ঠাকুর সংস্কৃত, আর্ব্বী, পার্শী, উর্দ্দু, ফরাসী, পর্ত্তুগিজ ও ইংরাজী ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর ছয় পুত্রের মধ্যে প্রসন্নকুমার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। বাল্যাবধিই লেখা পড়ায় ইহাঁর খুব মনোযোগ ছিল। প্রথমে বাড়ীতেই ইংরাজী শিক্ষা করেন, পরে সের্ব্বোর্ণ্ সাহেবের স্কুলে পাঠ করিয়া হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইলে তথায় শিক্ষা লাভ করেন। জীবনের প্রারম্ভ হইতেই সত্যের প্রতি ইহাঁর নিতান্ত অনুরাগ ছিল। যাহা ভাল ও যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন সমাজ বা লোকের ভয়ে তাহা পালন করিতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইতেন না। রাজা রামমোহন রায়ের সহিত ইহাঁর ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুতা জন্মে। তাঁহারই প্রভাবে ইনি আপন হিন্দু ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের ভিত্তি কতদূর যুক্তি সঙ্গত তাহারই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই সময়ে একটী পুস্তিকা রচনা করিয়া প্রচার করেন, তাহাতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সকলের শাসনকর্ত্তা এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে স্বদেশবাসীদিগকে অনুরোধ করেন। যাহা হউক, নিজের এই নূতন মত ও বিশ্বাস লইয়া অপরের সহিত কলহ করিতে যাইতেন না অথবা তাঁহার মত-বিরোধী যাহা কিছু তাহাই বিনাশ করিবার জন্য অদমনীয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেন না। গোঁড়া হিন্দু ধর্ম্মে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সে সকল ধর্ম্মবিশ্বাস অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং নিজের মত ও বিশ্বাস যাহা, যুক্তি তর্ক ও সদুপদেশে তাহা সর্ব্বদা নিজে রক্ষা করিতেন। মূলাজোরে তাঁহাদের পারিবারিক দেবমন্দির ছিল, সে দেব মন্দির রহিল এবং সেই দেব মন্দিরে তাঁহার মাতৃঠাকুরাণী যে রৌপ্য পালঙ্কে শয়ন করিতেন তাহা তথায় দেবতার ব্যবহারের জন্য প্রদান করিলেন। মাতার প্রতি ইহাঁর অসীম ভক্তি ছিল, মাতৃভক্তিই ইহাঁর পরম

ধর্ম্ম ছিল। বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত কখন কোন প্রকারে মাতার প্রতি অসদ্ব্যবহার বা অভক্তি প্রকাশ করেন নাই।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর আইন শিক্ষা করিয়া সদর আদালতে ওকালতি করিতে মনস্থ করেন। এই ইচ্ছা পূরণের নিমিত্ত যখন তিনি আইন পড়িতে আরম্ভ করেন সেই সময় তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে "আইন পাঠে কোন লাভ নাই ইহাতে বৃথা সময় ব্যয় হয় ও তাঁহার ন্যায় ধনী ব্যক্তির ইহা শিখিবার কোনও প্রয়োজন নাই" এই বলিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর বলিলেন যে, আইন শিক্ষায় তাঁহার লাভ বই লোকসান নাই এবং তাঁহার বন্ধুর কথা গ্রাহ্য না করিয়া পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছু কাল পরে তাঁহার নীলের চাস ও অন্যান্য আয় সম্বন্ধীয় কোন কোন মোকদ্দমায় তাঁহার অত্যন্ত ক্ষতি হয়। মোকদ্দমা সুচারুরূপে চালাইবার দোষে তাঁহার ক্ষতি হইয়াছে দেখিয়া ভবিষ্যতে স্বয়ং মোকদ্দমা চালাইতে ইচ্ছুক হইলেন। এই কারণে তিনি ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ের গভর্ণমেণ্টের উকিল বেলী সাহেব অবসর গ্রহণ করিলে আদালতের অনেক জজেরা প্রসন্নকুমার ঠাকুরকেই সেই পদ দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন, তিনি জমীদার বলিয়া অনেকে তাঁহার এই পদ প্রাপ্তির বিরুদ্ধে ছিলেন, তাহা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সেই পদে নিয়োগ করেন। এই ওকালতি করিয়া তিনি তাঁহার জমীদারীর বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি করিলেন ও বৎসরে তাঁহার প্রায় ১৷৷০ লক্ষ টাকা আয় হইতে লাগিল।

১৮৩২ খৃঃ অব্দে গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে সতীদাহ উঠাইয়া দিয়াছেন বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে এখানকার কতকগুলি লোক ইংলণ্ডের রাজার নিকট দরখাস্ত করেন, কিন্তু রাজা সে দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর রাজার এই সৎকার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার জন্য জোড়াসাঁকো ব্রাহ্ম-সমাজ গৃহে এক সভা আহ্বান করেন।

তিনি অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। প্রত্যহ শতাধিক অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তি ও নিঃস্ব স্কুলের ছাত্রগণকে আপনার গৃহে আহার করাইতেন। তিনি বিদ্বৎসেবী ছিলেন ও পণ্ডিতগণকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতেন না। তাঁহার সময়ে কলিকাতায় তাঁহার ন্যায় অত বড় দাতা বোধ হয় আর কেহই ছিল না।

তাঁহার এক প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল; এই লাইব্রেরী হইতে সদর আদালত ও হাইকোর্টের জজেরা প্রয়োজন হইলে পুস্তকাদি লইতেন এবং ইহা ছাত্রগণের ব্যবহারার্থ সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। ইহাতে তাঁহার বিদ্যানুরাগের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি সচরাচর তাঁহার জমীদারী পরিদর্শনার্থ বহির্গত হইতেন এবং তথায় অত্যন্ত দীন দরিদ্র কৃষকগণের সহিত আলাপাদি করিতেন। তিনি এই সকল দরিদ্র ব্যক্তিদিগের জন্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দরিদ্র প্রজাগণ খাজনা দিতে অক্ষম হইলে তাহাদিগের নিকট তাহা গ্রহণ করিতেন না।

একবার তিনি রংপুরে তাঁহার জমীদারী দর্শনার্থে বহির্গত হন সেই সময় তাঁহার কতকগুলি প্রজা তাঁহাকে আসিয়া বলিল "মহাশয় আপনার মত এত বড় লোকের কাঠের পাল্কিতে চড়িয়া যাতায়াত করা ভাল দেখায় না।" প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাহাদিগকে বলিলেন যে, "আমি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ রূপার পাল্কী কোথায় পাব?"

এই কথা শুনিয়া তাহারা ছয় দিনের মধ্যে চাঁদা করিয়া তাঁহাকে একখানি রূপার পাল্কী তৈয়ার করিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিল। তিনি এই কথা কোনরূপে জানিতে পারিয়া সংগ্রহকারীদিগকে স্ব স্ব টাকা ফিরাইয়া লইতে অনুরোধ করিলেন, এবং রূপার পাল্কীতে চড়িয়া যে যাওয়া আসার সুবিধা হয় না তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। এইরূপে অতি কষ্টে তিনি এই কার্য্য হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্যর চার্লস্ পিকক্ সাহেবকে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন প্রস্তুত করিবার সময়ে বিশেষ সাহায্য করেন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্ব প্রথমে গভর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে নিযুক্ত হইয়া অত্যন্ত সম্মানিত হন।

কেহ তাঁহার নিকট আইন সম্বন্ধীয় কোন পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিলে তৎক্ষণাৎ তাহা দিতেন ও তাহার জন্য কাহারও নিকট অর্থ গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল, কোন বিষয় কোন পুস্তকে পড়িয়াছেন তৎক্ষণাৎ তাহা বলিতে পারিতেন।

গোলাব সিং যখন কাশ্মীরের মহারাজা ছিলেন তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর কাশ্মীর দেখিতে গিয়াছিলেন। কাশ্মীরের মহারাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি এই নিয়মে মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন যে, তিনি মহারাজাকে নজর দিবেন না ও মহারাজাও তাঁহাকে যেন খিলাত না দেন।

তিনি যতগুলি প্রধান প্রধান কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন শিক্ষা দিবার অধ্যাপকের পদ সৃষ্টিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই অধ্যাপকগণের আইন সম্বন্ধীয় বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা হয় এবং ইহার দ্বারা আমাদিগের যে কত উপকার হয় তাহা বলা যায় না। তাঁহার জীবনে তিনি এইরূপ আরও অনেকানেক কার্য্য করিয়াছেন। তিনি মিউনিসিপালিটির দ্বারা কলিকাতার উন্নতি সাধনে বিশেষ তৎপর ছিলেন। ইনি ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভার একজন প্রবর্ত্তক এবং রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পর ইনি এই সভার সভাপতি রূপে নিযুক্ত হয়েন। ব্যাকরণ, ছন্দ, ন্যায় শাস্ত্র ও স্মৃতি শিক্ষা দিবার জন্য মূলাজোরে একটি সংস্কৃত স্কুল খুলিয়াছেন।

ইহাঁর সম্বন্ধে এক গল্প আছে যে, রেওয়ার মহারাজা একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; সেই সময় প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহারাজের সম্মানার্থ আপন বাস ভবনে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহার সম্মানার্থ যে মস্নদ্ প্রস্তুত ছিল তাহার উপর একখানি তরবারি রক্ষিত রহিয়াছে দেখিয়া মহারাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "বাঙ্গালীরা কি এখনও তরবারি ব্যবহার করে" এই কথার উত্তরে প্রসন্নকুমার ঠাকুর বলিলেন যে "বাঙ্গালীরা তরবারির পরিবর্ত্তে এখন কলম লইয়াছে, দয়ালু ইংরাজের রাজত্বে তরবারির প্রয়োজন নাই, কিন্তু লক্ষণ সেনের প্রধান মন্ত্রী আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ হলায়ুধের শ্রেষ্ঠ বংশের গৌরব রক্ষার্থ ইহা এই খানে রাখা হইয়াছে।"

প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইউরোপীয় ও এদেশীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনার্থ বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। এমন দিন ছিল না যে দিন কোন না কোন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ইহাঁর গৃহে আহারাদি না করিয়াছেন। বেলজিয়মের রাজা দ্বিতীয় লিওপোলড কলিকাতায় থাকিয়া ইহাঁর গৃহে অতিথী হইয়াছিলেন।

ইনি বাঙ্গালা দেশের একজন প্রসিদ্ধ, ক্ষমতা-

শালী ও অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৬৬ খৃঃ মাঃ গভর্ণমেণ্ট হইতে সি, এস, আই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৬৮ খৃঃ মাঃ ৩০শে আগষ্ট ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর মৃত্যুতে বঙ্গভূমি একটি রত্ন হারাইয়াছেন।

ইহাঁর একমাত্র পুত্র বিদ্যমান আছেন তাঁহার নাম জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। ইনি বিলাতে শিক্ষা লাভ করিয়া বারিষ্টার হইয়াছেন। ইহাঁর বিবাহের সময়ে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইহাঁকে সাত হাজার টাকার এক জমিদারী দান করেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর বহুমূল্য অলঙ্কারাদি সকলই তিনি লয়েন। তৎপর শিক্ষা লাভ করিবার জন্য বিলাত গমন করেন। সেই খানে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন এবং কোন ইংলণ্ডীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। সেই অবধি প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁহার উপর কিছু বিরক্ত হয়েন। কিন্তু পিতার জীবিতাবস্থায় তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিতে বঞ্চিত হয়েন নাই। প্রসন্নকুমার ঠাকুর মৃত্যুর সময়ে তাঁহার উইলে তাঁহার পুত্রের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার বিষয় সম্পত্তি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং নিজের চারিটী বিধবা কন্যাকে ও দাতব্য কার্য্যে ভাগ করিয়া দিয়া যান। পুত্রকে এক কপর্দ্দকও দেন নাই। কেন যে দিলেন না তাহার কোনই কারণ উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয় তাঁহার খৃষ্টান হইয়া ইংরেজ মহিলা বিবাহ করাই তাঁহার বিরক্তির কারণ। কথিত আছে মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রসন্নকুমার ঠাকুর অত্যন্ত পীড়িত হইলে সাহেব ও দেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহাকে দেখিতে যান, জ্ঞানেন্দ্রমোহন পিতার বিরক্তি ভাজন হইলেও পিতার প্রতি ভালবাসা বশতঃ এবং পুত্রের কর্ত্তব্য হেতু তাঁহাকে দেখিতে যান। প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া ক্রোধে অস্থির হইয়া উঠেন ও তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে আদেশ করেন।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন পুত্র হইয়া পৈতৃক বিষয়ের উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন না বলিয়া সেই উইল গ্রাহ্য হইতে পারে না বলিয়া হাইকোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। তাহাতে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। তৎপর বিলাতে মহারাণীর নিকট আপীল করেন সেখানেও কৃতকার্য্য হয়েন নাই। তিনি এখন বিলাতেই থাকেন। পূর্ব্বে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকতার কার্য্য করিতেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাগৃহে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের যে প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি আছে, আমরা তাহারই ছবি দিলাম।

হেঁয়ালি গল্প।

আমি আর আমার বন্ধু দুজনে পরস্পরের মধ্যে বড়ই বাধ্য বাধকতা। আমি না হ'লে তাঁর টেঁকা দায় আর তিনি না হ'লে আমায় কেহ জিজ্ঞাসাও করে না। আমি তাঁর পক্ষে বড়ই প্রয়োজনীয়। তিনিও আমার পক্ষে বড়ই প্রয়োজনীয়। তাঁর ঠিক সেই সব গুণ আছে যা আমার বড়ই দরকারে লাগে, আর আমারও ঠিক সেই সব গুণ আছে যা না হ'লে আমি অকর্ম্মণ্য হ'য়ে থাকি। আমি বড় খোলা

মেজাজের লোক কিন্তু আমার বন্ধু বড় চাপা, আমি তাঁর সঙ্গে না থাকলে তাঁর কাছ থেকে কিছু বে'র করা বড়ই শক্ত ব্যাপার। পেটের কথা পুষে রাখা তাঁর মত অল্প লোকেই পারে। তাঁর কাছে যদি কিছু গোপন করে রাখ্‌তে দাও তিনি তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া দিবেন না। কেবল আমার অনুমতি পাইলেই তিনি প্রকাশ করিয়া দেন। যদিও অনেকে তাঁর বিষয়ে অনেক কুৎসা করে, বলে যে তিনি টাকা কড়ির লোভে, ঘুস খেয়ে, আর মন্ত্র তন্ত্রের চোটে অনেক জিনিস প্রকাশ করে দেন কিন্তু আমি তাহার এক বর্ণও বিশ্বাস করি না, তাঁর মত বিশ্বস্ত ভৃত্য পৃথিবীতে আর নাই। সেই জন্য যে সব স্থানে টাকা কড়ির কারবার, বহুমূল্য জিনিস পত্র যেখানে থাকে সেই খানেই তিনি প্রহরী নিযুক্ত হয়েন। এটা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আর যদি সেই সব জিনিস পত্র না দিতে বলি তবে প্রাণান্তেও তিনি কাহাকেও তাহার এক চুলও দিবেন না। তবে যদি দস্যুবৃত্তি করিয়া তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর বল প্রয়োগ কর বা তাঁহার সহিত প্রবঞ্চনা প্রতারণা কর তবে সে ভিন্ন কথা। আমার কতকগুলি আত্মীয় আছেন, (তাদের আত্মীয় ব'লে আমার স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ হয়), তারা সময়ে সময়ে আমার বন্ধুর সহিত প্রতারণা করিয়া অনেক গোপনীয় জিনিস তাঁহার নিকট হইতে বাহির করিয়া দেয়, তাহাতে সময়ে সময়ে রাজকার্য্যের বড় ক্ষতি হয় ও গৃহস্থকে কখন কখনও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারি হইতে হয়। এরা বড় নীচ, কাজেও যেমন কুৎসিৎ দেখিতেও তেমনি কুৎসিৎ। আত্মীয় হ'লে কি হয় এদের দেখ্‌লে আমার কিছুমাত্র অহঙ্কার হয় না। আমরা অতি প্রাচীন বংশের লোক। প্রাচীন হ'লে অনেক বংশ লোপ পায়। আমরা কিন্তু সেরূপ নহি। আমাদের বংশ যতই প্রাচীন হইতেছে আমরা ততই উন্নতি লাভ করিতেছি। এই আমার বন্ধুর কথা বলি এঁর পূর্ব্বপুরুষেরা বড় স্থূলকায় হাতীর মত কদাকার ছিলেন, নড়া চড়া তাঁদের পক্ষে বড় কষ্টকর ছিল, কিন্তু এখনকার এঁরা বেশ, শরীর যেমন দোহারা ও পরিশ্রমক্ষম সেইরূপ দেখ্‌লেও বোধ হয় যেন ছেলেদের মত ছুটাছুটী করিতে ইচ্ছুক।

আমাদের পরিবার খুব বৃহৎ, এবং যদিও আমাদের পরিবারের সকলের মুখের গড়ন বা ভাব প্রায় এক ধরণের তবুও আমাদের কোন দুজনার চেহারা দেখিতে ঠিক এক রকম নয়! এটা সৌভাগ্যই বলিতে হইবে কারণ যদি একজনের চেহারা ঠিক আর একজনের মত হইত তবে ভয়ানক ক্ষতি হইত এবং বড় অসুবিধাও হইত।

আমার বন্ধু প্রহরীর কাজ করেন বলিলে হয়ত তোমার জেলখানা বা পাগলা হাঁসপাতালের কথা মনে হইবে। আর ভাব্‌বে তিনি বুঝি কেবল সেই খানেই চাকরী করেন, কিন্তু সেটা তোমার ভুল। আমরা দুজনেই সর্ব্বদা জেলখানা ও পাগলা হাঁসপাতালে থাকি বটে, কিন্তু আমাকে ঘরে ঘরে দেখিতে পাইবে। রাজার বাড়ীই বল আর গৃহস্থের কুটীরই বল সব বাড়ীতেই থাকি, তবে নিতান্ত কুঁড়ে ঘর হইলে তাহা আমার বাসের অনুপযুক্ত।

কখনও লোকে আমার বন্ধুকে ভাঙ্গে; আর আমি আর আমার ভাইরা যখন একত্র থাকি তখন লোকে বলে আমরা একগোছা হ'য়ে আছি। তুমি হয়ত মনে কচ্ছ যে আমরা বুঝি কোন ফুল বা ফল হব। আমি আর আমার বন্ধু যখন

বিশ্রাম করি তখন আমরা একেবারে নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ। কিন্তু আমরা দুজনে যখন কাজ করি বা নড়ি চড়ি তখন একটু মনোযোগ দিলে আমাদের শব্দ শুন্‌তে পাবে, বিশেষতঃ অনেকদিন বেকার বসে থেকে আল্‌সে হয়ে পড়্‌লে, কায কর্‌বার সময়ে শব্দটা কিছু আমাদের পেট থেকে বেশী বেরোয়। সেই সময়ে বেতো রোগীদের মত আমাদের একটু তেল মালিস কল্লেই আবার সব ঠিক হ'য়ে যায়।

বাড়ীর কর্ত্তাই বল আর গিন্নীই বল আর বড় বড় রাজকর্ম্মচারীই বল সকলেই আমাকে বিশেষ যত্ন করেন ও অতি সাবধানে রাখেন। আমাকে রাখা সময়ে সময়ে তাঁরা সম্মান সূচক মনে করেন। যাঁরা আমায় রাখেন, তাঁহারা আমার বিয়োগে একেবারে অধীর হইয়া পড়েন, এবং আমাকে পুনরায় ফিরিয়া পাইবার জন্য অনেক টাকা ব্যয় করিতেও স্বীকৃত হন। আমায় হারাইয়া ফেলিলে বিদেশ যাত্রীরা বড়ই অসুবিধা ভোগ করেন এবং বড় ক্ষতিগ্রস্ত হন। তুমি যদি বিদেশে যাও তবে রাজার আদেশে রাজকর্ম্মচারী ব্যতীত অপর কেহ তোমার নিকট হইতে আমায় চাহিলে কখনও তাহাকে দিবে না।

আমি আমার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছি, এতেও যদি এখনও না বুঝিয়া থাক তবে তুমি যে আর কখনও বুঝিতে পারিবে তাহা বোধ হয় না। অনেকবার "আমি আমি" করিয়া আমার গুণ গাহিয়াছি, তাহাতে আমায় অহঙ্কারী মনে করিও না; দেখিতেছ না আমি আমার জীবন চরিত লিখিতেছি। আর অধিক লিখিতে ভয় হয়। এবার তোমাদের জ্যেষ্ঠতাতদের উপর বড় আক্রোশ হয়েছে, আর না বুঝে সুঝে যারে তারে যদি জ্যেষ্ঠতাত ঠাওরাও সে বড় খারাপ। আমায় কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত ঠাওরিও না। তোমরা ছেলে মানুষ তোমরা কাহাকেও জ্যেষ্ঠতাত ঠাওরাইতে যাইও না।

ধাঁধা।

গত ফেব্রুয়ারি মাসের ধাঁধার উত্তর। *

মাতুল।

হেঁয়ালি।

গত এপ্রিল মাসের হেঁয়ালির উত্তর। †

মুদ্রা।

---

* নিম্নলিখিত গ্রাহকগণ ধাঁধার ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন গুপ্ত, মাথাভাঙ্গা; শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস, ভাগলপুর; শ্রীরমারঞ্জন ঘোষ, রায়গঞ্জ; শ্রীঅনাদিনাথ সেন-গুপ্ত, বগুড়া; শ্রীরমানাথ পাল, সৈয়দপুর; শ্রীত্রৈলোক্যনাথ বক্সী, মামুদপুর; শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী, পটুয়াখালি; শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র বসু, ভাগলপুর; শ্রীকিশোরীমোহন রায়, কাকিনা; শ্রীএককড়ি দে, চুঁচুড়া; শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, সৈয়দপুর; শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, ডিব্রুগড়; শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, নওগাঁও; শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়, নাড়াজোল; শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়, মাণিকগঞ্জ; শ্রীকুলদাকান্ত ঘোষ, ঢাকা; শ্রীসূর্য্যকুমার বসু, বজ্রযোগিণী; শ্রীভবানন্দ চক্রবর্ত্তী, লোকনাথপুর; শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাসী, ছয়ঘরিয়া; শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাহাপুর; শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য, চাগড়া; শ্রীমতী শরৎ-কামিনী দাসী, ছয়ঘরিয়া।

† নিম্নলিখিত গ্রাহকগণ হেঁয়ালি গল্পের ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

শ্রীরমানাথ পাল, সৈয়দপুর; শ্রীমতী চমৎকারিণী দাসী, নিশ্চিন্দীপুর।

সখা। সপ্তম ভাগ। ষষ্ঠ সংখ্যা।

জুন, ১৮৮৯।

বিবিধ।

পিপীলিকার সম্বন্ধে সখায় তোমরা অনেক কথা পড়িয়াছ। সার জন লাবক তাঁহার লিখিত কীটতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কোন পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, পিপীলিকাদিগের জীবন মনোযোগ সহকারে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বোধ হয় মানুষের অপেক্ষা উহারা কোন অংশে হীন নহে। মানুষের ন্যায় ইহাদিগেরও এই ক্ষুদ্র সংসারে স্নেহ, দয়া, মমতা, পীড়িতের শুশ্রূষা, অনাথকে আশ্রয়দান প্রভৃতি সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা একে অন্যের সাহায্য করে, পীড়া হইলে শুশ্রূষা করে, আহার দেয় এবং পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া বেড়ায়। এক এক স্থানে এক লক্ষেরও অধিক পিপীলিকা একত্র বাস করে, ইহারা পরস্পর সকলকেই চিনিতে পারে; এতগুলি একত্র বাস করিলেও কখনও বিবাদ করিতে দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে ইহারা মানুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পিপীলিকাদের মধ্যে যাহারা শিশু, বৃদ্ধ এবং রোগী, তাহারা গৃহেই থাকে; যাহারা বলবান, কর্ম্মক্ষম তাহারা আহার সংগ্রহ করিয়া আনে। একদলের একটি পিপীলিকাকে আর একটি দলে ছাড়িয়া দিলে, এই নবাগত পিপীলিকাকে তাহারা যত্ন ও আগ্রহের সহিত আপনাদের দলে লয়; এক বাসার একটি পিপীলিকা ডিম্ব আর এক বাসায় রাখিয়া দিলে, বাসার পিপীলিকারা স্নেহ ও যত্নের সহিত আপনাদের ডিম্বের ন্যায় তাহা রক্ষা করে। লাবক সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, পিপীলিকাগণ পাঁচ বৎসরেরও অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে।

* *
*

লজ্জাবতী লতা স্পর্শ করিলেই উহা সংকোচিত হইয়া যায়, ইহা তোমরা অনেকেই দেখিয়া থাকিবে। পণ্ডিতেরা বলেন যে, লজ্জাবতী লতার পাতার বোঁটার ভিতরে ছিদ্র আছে, ঐ সকল ছিদ্রের মধ্যে ক্রুশের ন্যায় আকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কোচক পদার্থ আছে। ইহারা স্প্রিংএর কার্য্য করে। পাতাগুলি স্পর্শ করিলেই ঐ সকল পদার্থ সংকোচিত হইয়া যায়; এই জন্য স্পর্শ করিবামাত্র পাতাগুলি ঢলিয়া পড়ে।

* *
*

জুলিয়স্ সিজরকে রোমের কয়েক জন লোক কয়েকটী শুক পাখী উপহার দিয়াছিল। পাখীগুলিকে এমন শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল যে, সীজরকে দেখিলেই তাহারা বলিয়া উঠিত, "মহা-

বীর সীজর তুমি দীর্ঘজীবি হও।” সীজর সন্তুষ্ট হইয়া এক একটী পাখীর জন্য এক এক হাজার টাকা পুরস্কার দিলেন। ইহা দেখিয়া আর এক ব্যক্তি একটী শিক্ষিত শুক পাখী সীজরকে উপহার দেন; কিন্তু সীজর তাহা গ্রহণ করিলেন না! ইহাতে ঐ ব্যক্তি পক্ষিটীকে ছাড়িয়া দিলেন, এবং ছাড়িয়া দিবার সময় এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন যে, “হায়! দুঃখী দেখিয়া সীজর আমাকে উপেক্ষা করিলেন।” ইহার দুই দিন পরে সীজর একদিন বাগানে বেড়াইতে গিয়াছেন, এমন সময় শুনিলেন কে যেন বলিতেছে, “হায়! দুঃখী দেখিয়া সীজর আমাকে উপেক্ষা করিলেন।” সীজর দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, নিকটেই একটী শুক পাখী গাছের ডালে বসিয়া বলিতেছে, “হায়! দুঃখী দেখিয়া সীজর আমাকে উপেক্ষা করিলেন।” সীজর ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, যে ব্যক্তি এই শুক পাখীটী আনিয়াছিল, তাহাকে ডাকাইয়া দুই হাজার টাকা পুরস্কার দিলেন।

* *
*

ফ্রান্স ও প্রুসিয়ার সহিত যুদ্ধে যখন জর্ম্মানেরা পারিস নগর অবরোধ করে, তখন ফরাসীরা শিক্ষিত পায়রা দ্বারা নগরের বাহিরে আত্মীয়গণের নিকট সংবাদ পাঠাইত; জর্ম্মানেরাও আবার শিক্ষিত বাজ পক্ষী দ্বারা সেই সকল পায়রাগুলি ধরিয়া আনিয়া, বিপক্ষের গোপনীয় পত্রগুলি জানিয়া লইত। একদিন একটী পায়রা একখানি পত্র মুখে করিয়া নগর হইতে বাহিরে লইয়া যাইতেছে, এমন সময় বিপক্ষের বাজপক্ষী আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। পায়রাটীকে ধরিয়া জর্ম্মাণেরা তাহার ঠোঁট হইতে পত্র খানি লইবার জন্য কত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সে কিছুতেই তাহা ছাড়িল না। অবশেষে যখন দেখিল আর রাখিতে পারে না; তখন পত্র খানি গিলিয়া ফেলিল। জর্ম্মাণেরা তখন পায়রাটীর গলা চিরিয়া পত্র খানি বাহির করিয়া লইল। পত্র খানির জন্য পায়রাটী নিজ জীবন পর্য্যন্ত দিল। মানুষেও অনেক সময় এ প্রকার করে না।

* *
*

গত জর্ম্মন যুদ্ধে একজন অশ্বারোহী সৈন্য দলের অধ্যক্ষ ঘোটক সকলের খাদ্য অন্বেষণ করিতেছিলেন। তিনি মাঠের মধ্যে একখানি কুটীর দেখিতে পাইয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। কুটীর হইতে একটী শ্বেত-শ্মশ্রু বৃদ্ধ বহির্গত হইল। অধ্যক্ষ কহিলেন “বলিতে পার আমরা কোথায় অশ্বের খাদ্য সামগ্রী পাইতে পারি?”

“আমার সঙ্গে আইস।” বলিয়া বৃদ্ধ অধ্যক্ষকে উপত্যকা হইতে নীচে লইয়া গেল। অধ্যক্ষ এক সুন্দর যবের ক্ষেত্র দেখিতে পাইয়া কহিলেন—“এই ক্ষেত আমাদিগের যথেষ্ট হইবে।” বৃদ্ধ কহিল—“অধৈর্য্য হইবেন না। আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করিব।” কিয়দ্দূর যাইয়া বৃদ্ধ এক যবের ক্ষেত্র দেখাইয়া দিল। সৈন্যদিগের কর্ত্তন শেষ হইলে অধ্যক্ষ কহিলেন—“বৃদ্ধ, বৃথা ক্লেশ স্বীকার করিয়াছ। পূর্ব্বের ক্ষেতই ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল।” বৃদ্ধ কহিল—“তা সত্য। কিন্তু উহা আমার ক্ষেত নহে।”

* *
*

কিছুদিন হইল বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দুর্গাপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে একটি অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ

৫০০৲ টাকা সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার সময় দুর্গাপুর ষ্টেশনে নামেন; বাটী পৌঁছিতে রাত্রি অধিক হইবে বলিয়া একটি মুদির দোকানে রাত্রি যাপন স্থির করেন, কিন্তু টাকা সঙ্গে লইয়া মুদির দোকানে থাকা নিরাপদ নহে বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণ সেখানকার পোষ্টমাষ্টারের নিকট টাকা রাখিয়া আসেন, কথা থাকে এই টাকা রাখার জন্য পোষ্টমাষ্টারকে কিছু দিবেন। পোষ্টমাষ্টার ঐ টাকার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া মুদির সহিত যোগে ব্রাহ্মণকে হত্যা করা স্থির করে। মুদি ঐ কার্য্যের জন্য এক ডোমের সাহায্য লয়। ব্রাহ্মণকে দোকান ঘরের বারান্দায় শুইতে দেয়। ধূর্ত্তদিগের দুষ্ট অভিসন্ধি ব্রাহ্মণ কোন গতিকে বুঝিতে পারায় ব্রাহ্মণের নিদ্রা আসিতেছিল না, বিছানায় পড়িয়া কেবল ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া মুদির এক পীড়িত পুত্র যে ঘরের মধ্যে শুইয়াছিল, সে ব্রাহ্মণকে তাহার নিজের বিছানায় গিয়া শুইতে বলিল। ব্রাহ্মণ তদ্দণ্ডেই সেই ঘরের ভিতর যাইয়া দ্বার বন্দ করিয়া শয়ন করিলেন। এদিকে মুদির পীড়িত পুত্র ব্রাহ্মণের শয্যায় শয়ন করিয়া শীঘ্রই অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ডোম ও মুদি আসিয়া ঐ পীড়িত মুদি-পুত্রকে ব্রাহ্মণ বোধে মস্তক ছেদন করিল। অনেক সময় পাপের প্রায়শ্চিত্ত এইরূপ হাতে হাতেই ফলিয়া থাকে।

—“সম্মিলনী।”

* *
*

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্কটলণ্ডস্থ এডিনবরা নামক নগরে একজন সুবিখ্যাত চিত্রকর বাস করিতেন। তাঁহার চিত্রকার্য্যে এতদূর নৈপুণ্য ছিল যে, তাঁহার কৃত কোন চিত্র কেহ একবার দেখিলে চমৎকৃত হইয়া যাইত ও প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না। ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন। একদিন মহারাণী তাঁহার কৃত চিত্রাদি দর্শনার্থ তাঁহার গৃহে আগমন করিবেন বলিয়া তাঁহাকে জানাইলেন। এই সংবাদ পাইয়া পরিবারস্থিত সকলেই গৃহের শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গৃহের কোন স্থান যেন অপরিষ্কার না থাকে, মহারাণী যেন কোন রূপে অসন্তুষ্ট না হয়েন সকলের মনে এই চিন্তা হইতে লাগিল।

কেবল চারি বৎসরের একটি বালিকার এ সকল কিছু ভাল লাগিতেছে না, তাহার মনে কিছু মাত্র আনন্দ নাই। মহারাণীর আগমন সংবাদ শুনিয়া তাহার হাসি খুসি মুখখানি একেবারে গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। বাড়ীর সকলে তাহাকে কেবল ভাল লক্ষ্মী মেয়েটির মত থাকিতে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের কাহারও কথা তাহার বড় ভাল লাগিতেছে না।

মহারাণীর আসিবার সময় হইলে বালিকা তাহার মাতার হস্ত ধারণ করিয়া পিতার চিত্রালয়ে বেড়াইতে লাগিল এমন সময় মহারাণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার মাতা মহারাণীকে চিত্রগুলি দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু মহারাণী বালিকাটিকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, “ঐ ছবিটি আমি দেখিতে চাই, তুমি আমার কাছে এস।”

তাঁহার কথা শুনিয়া বালিকা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডের মহারাণীর উপর তাহার বড় রাগ কারণ সে শুনিয়াছিল যে, ইংলণ্ডের রাণী মেরীর প্রাণবধের আজ্ঞা দেন। সে বিরক্ত হইয়া সরিয়া গেল ও মুখখানি ভারি করিয়া বলিল “আমি তোমায় ভালবাসি না।”

কন্যার এই ব্যবহার দেখিয়া পিতা মাতা অবাক হইয়া রহিলেন।

মহারাণী হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তুমি আমায় ভালবাস না কেন?''

বালিকা কিঞ্চিৎ সঙ্কিত হইয়া ধীরে ধীরে কহিল "তুমি আমাদের রাণী মেরীর প্রাণবধ করিয়াছ।''

মহারাণী তাহাকে ক্রোড়ে লইলেনও চুম্বন করিয়া কহিলেন, "আমি তোমাদের রাণীকে যদি বধ করিতাম তাহা হইলে তুমি রাগ করিতে পারিতে; কিন্তু রাণী মেরীকে তুমিও যেমন ভালবাস আমিও সেইরূপ ভালবাসি।"

বালিকা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এই সুমিষ্ট বচন শুনিয়া কহিল "আমিও তবে তোমায় খুব ভালবাসিব।"

সেই দিন হইতে এই বালিকা তাহার ইতিহাসের পুস্তকে রাণী এলিজাবেথের নাম দেখিলেই বলিত "ইনি আমাদের রাণী নন, ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড উভয়েরই রাণী, তাঁহার রাজ্যে কোন নিষ্ঠুরাচরণ হইতে পারিবে না।"

হাতী-ধরা।

হাতীর ন্যায় প্রকাণ্ড এবং মহা-বলশালী জন্তুকে ক্ষুদ্র মানুষ কি প্রকারে বন হইতে ধরিয়া আনে এবং কি প্রকারে নিজ বসে আনিয়া ইহাদ্বারা আপন কার্য্য করাইয়া লয়, আজ তোমাদিগকে সেই কথা বলিব। কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্ব্বে হাতীর সম্বন্ধে আরও দু একটা কথা বলিয়া রাখা উচিত।

বর্ত্তমান সময় পৃথিবীতে যত জন্তু আছে, হস্তীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহারা অত্যন্ত বলশালী, অন্য কোন জন্তুই শারীরিক বলে ইহাদের সমান হইতে পারে না। বহুকাল হইতে মানুষ এই প্রকাণ্ড জন্তুকে আপন কাজে লাগাইয়া আসিতেছে! রামায়ণ, মহাভারতে হাতীর কথা ছেলেবেলা পড়িয়াছি, তখন দেখি নাই। সেকালে এই হাতীতে চড়িয়া যুদ্ধ হইত। এখন মানুষ সভ্য হইয়াছে, এখন আর এই প্রকাণ্ড জানোয়ারকে লইয়া কেহ যুদ্ধে যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে পরিত্যাগও করিতে পারে নাই। এখনও যুদ্ধের সরঞ্জাম জিনিসপত্র প্রভৃতি ইহাদিগের দ্বারাই বহন করাইয়া লওয়া হয়।

হাতী চার হইতে আট হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। কিন্তু সচরাচর সাড়ে ছয় হাতের অধিক উচ্চ হাতী দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদিগের চারিখানি পাই খুব মোটা এবং স্তম্ভের মত গোলাকার। সম্মুখের দুই খানি পা অপেক্ষা পশ্চাতের পা দুখানি কিছু ছোট। সম্মুখের পায়ে পাঁচটী করিয়া নখ, এবং পশ্চাতের পায় চারিটী করিয়া নখ আছে। আফ্রিকা দেশীয় হাতীর কিন্তু পশ্চাতের পায়ে তিনটী করিয়া নখ থাকে। ইহার শরীরের বর্ণ গাঢ় ধূসর। শরীর মোটা মোটা লোমে আবৃত, কিন্তু এই লোমগুলি এত পাতলা যে, নিকটে না গেলে ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। শরীর অপেক্ষা মাথার উপরের চুল কিছু ঘন এবং দীর্ঘ। হাতীর লাঙ্গুল প্রায় দুই হাত লম্বা এবং লাঙ্গুলের অগ্রভাগে এক গোছা ঘন চুল আছে। ইহার মাথার

গঠন সাধারণ জন্তুর ন্যায় নহে। মাথাটী দুই ভাগে বিভক্ত। দুইটী কলসী উল্টাইয়া রাখিয়া তাহার উপর একখানি কাপড় দিয়া কসিয়া ধরিলে উপরিভাগ যেমন দেখায় হাতীর মাথার উপরিভাগও ঠিক সেইরূপ। আমাদের যেমন হাত, হাতীর তেমনি শুণ্ড। এই শুণ্ডের দ্বারা হাতী সমস্ত কাজ করে। মুখের উপরের ঠোঁট এবং নাক বাড়িয়া এই শুণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। হাতীর স্কন্ধ অতিশয় ছোট; সমস্ত শরীর না ফিরাইলে আর অন্যদিকের কিছু দেখিতে পারে না। অন্যান্য জন্তুর মত ঘাড় নোয়াইয়াও ভূতল হইতে কোন বস্তু তুলিয়া লইতে পারে না। কিন্তু সে সমস্ত অসুবিধাই এই এক শুণ্ডের দ্বারা ইহারা দূর করিয়া থাকে। শুণ্ড যে ইহাদের কতদূর উপকারী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, এমন কি এই শুণ্ড না থাকিলে ইহারা বাঁচিত কি না সন্দেহ। এই শুণ্ড দ্বারা ইহারা ভূতল হইতে আহারীয় পদার্থ তুলিয়া লয়, বড় বড় বৃক্ষাদির শাখা অনায়াসে ভাঙ্গিয়া লয়, এই শুণ্ডের দ্বারা জল পান করে, আবার এই শুণ্ডের দ্বারাই আপনাকে শত্রু হইতে রক্ষা করে, এবং শত্রুকে আক্রমণ করে। শুণ্ডের অগ্রভাগে আঙ্গুলের মত এক খণ্ড সূক্ষ্ম মাংস আছে, উহাদ্বারা অতি ক্ষুদ্র জিনিসও তুলিয়া লইতে পারে। এ জন্তুর সকলই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড; কিন্তু ইহাদিগের চক্ষু অতিশয় ক্ষুদ্র; প্রকাণ্ড দুই কর্ণ দ্বারা সর্ব্বদাই এই দুই চক্ষুকে রক্ষা করিতেছে। ইহাদিগের নীচের ঠোঁট অতিশয় ছোট; বিশেষ কোন কাজেও আসে না। জিহ্বাও স্থূল ও ক্ষুদ্র। ইহাদের কোন পাঁটিতে সম্মুখে দাঁত নাই, কেবল মাড়ীতে উপরে নীচে ছয়টী করিয়া দাঁত আছে! ইহা ব্যতীত পুরুষ হস্তীগুলির শুণ্ডের দুই পার্শ্ব হইতে অতি প্রকাণ্ড দুইটী দন্ত বাহির হয়। কোন কোন হস্তীর এই দন্ত ৫।৬ হাত লম্বা দেখা গিয়াছে। এই দুইটীকে আমরা গজদন্ত বলিয়া থাকি। কখন কখনও দেশীয় হস্তিনীদিগের মধ্যে এইরূপ দন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও তাহাদের মুখ নীচের দিকে থাকে। আফ্রিকা দেশীয় হস্তি ও হস্তিনী উভয়েরই বড় বড় দন্ত জন্মিয়া থাকে। ইঁহারা আঠার মাসে সন্তান প্রসব করে, শিশু হস্তীগুলি অন্যান্য জন্তুর ন্যায় মাতৃদুগ্ধ খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। হাতীর যেমন প্রকাণ্ড শরীর তেমনি অপরিসীম বল; কিন্তু ইহারা বড় ভীরু। ইহারা সর্ব্বদা দলবদ্ধ থাকিতে ভালবাসে। এক দলে এক শতেরও অধিক হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়; এক দলে একটীর অধিক পুরুষ হস্তী দেখিতে পাওয়া যায় না। এই হস্তীকে সাধারণতঃ গুণ্ডা বলিয়া থাকে। কোন প্রকার ভয়ের কারণ হইলে শিশু ও দুর্ব্বল হস্তীগুলিকে মধ্যে রাখিয়া সবলগুলি চারিদিকে ঘেরিয়া থাকে। ইহারা যখন স্বাধীন ভাবে বনের মধ্যে বিচরণ করে তখন অত্যন্ত সুন্দর দেখায়, ইহাদের চলিবার সময় বিশেষ কোন শব্দ হয় না। আগের হাতী যেখানে পা ফেলিয়া যাইবে পশ্চাতের গুলিও ঠিক সেই খানে পা ফেলিয়া চলিবে। জঙ্গলের মধ্যে চলিবার সময় পা ফেলিবার পূর্ব্বে শুণ্ডের দ্বারা স্থান পরীক্ষা করিয়া পা ফেলিয়া থাকে। ইহারা খুব সাঁতার দিতে পারে। ইহাদের শরীরে কখনও ঘর্ম্ম হয় না; খুব অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে পায়ের নখের গোড়া হইতে এক প্রকার জল বাহির হইতে দেখা যায়। উদ্ভিদই ইহাদের একমাত্র খাদ্য, ইহারা প্রতিদিন ৪।৫ মন আহার করিতে পারে। কলা গাছ, ঘাস, বাঁশপাতা ও ধান্য ইহাদের প্রধান খাদ্য। কখন কখনও বট, অশ্বথ ও ডুমুর গাছের ডালও

আহার করিয়া থাকে। ইহাদের শরীরের মধ্যে জল সঞ্চিত করিয়া রাখিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র যন্ত্র আছে। শুণ্ড দ্বারা ইহারা এই যন্ত্র পূর্ণ করিয়া রাখে, এবং আবশ্যক মত শুণ্ড দ্বারা বাহির করিয়া লয়। অধিক রৌদ্রে চলিবার সময় যখন বাহিরে জল না পায়, তখন এই জল বাহির করিয়া সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া দেয়। ইহাদের অপত্য স্নেহ খুব অধিক। ইহারা একশত বৎসর বাঁচে এরূপ শুনা যায়।

কি উপায়ে এই প্রকাণ্ড জীবকে ক্ষুদ্র মানুষ ধরিয়া আপন কাজ করাইয়া লইতেছে, সংক্ষেপে তাহাই এখন বলিব। হাতী ধরিবার তিনটী প্রণালী আছে। একটীর নাম পরতালা শীকার, আর একটীর নাম ফাঁস শীকার, আর একটী খেদা শীকার।

পরতালা শীকার ;—পরতালা শিকারে কেবল গুণ্ডা হাতী ধরিয়া থাকে। ইহাতে তিনটী কুনকীর দরকার হয়। হস্তিনীকে কুনকী বলিয়া থাকে। শিকারীরা এই কুনকী লইয়া বনের মধ্যে যায়। কুনকী দেখিলে বন্য হস্তীগুলি পলায় না; শিকারীরা কুনকী লইয়া গুণ্ডার নিকটবর্ত্তী হয়; এবং কৌশলে দুইটা কুনকীকে গুণ্ডার দুই পার্শ্বে এমন চাপাইয়া রাখে যে গুণ্ডা কোনমতেই মাহুতকে দেখিতে পায় না। এই খানে বলিয়া দেওয়া উচিত যে, কুনকী দুইটীর মুখ গুণ্ডার মুখের বীপরিত দিকে থাকে। পিছনের কোন পদার্থ দেখিতে হইলে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে হইবে। হাতীর সে সাধ্য নাই, সমস্ত শরীর না ফিরাইলে আর কিছু দেখিতে পায় না। এদিকে ফিরিবারও যো থাকে না, কুনকী দুইটা দুই পাশে খুব চাপিয়া থাকে, কাজেই আর মাহুতকে কোনমতে গুণ্ডারা দেখিতে পায় না। এদিকে আর একজন লোক আর একটী কুনকীতে চড়িয়া গুণ্ডার ঠিক পিছনে গিয়া দাঁড়ায়। গুণ্ডা একটু স্থির হইলে সে অমনি হাতী হইতে নামিয়া গুণ্ডার পিছনের দুই পা একত্র করিয়া কাছি জড়াইতে থাকে। কুনকীগুলিকে এমন শিক্ষা দেওয়া হয় যে, এ বিষয়ও তাহারা শিকারীদিগকে সাহায্য করিয়া থাকে। কুনকীরা আপনাদের পায়ের দ্বারা গুণ্ডার পা ঘর্ষণ করিতে থাকে, কাজেই গুণ্ডার মনে কোন সন্দেহ থাকে না; যখন শিকারীরা পায়ে কাছি জড়ায় তখনও সে মনে করে কুনকীরাই পায়ে পা ঘর্ষণ করিতেছে। এইরূপে নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত একবার কাছি জড়াইয়া ফেলিতে পারিলেই হইল। তার পর বুকে ও গলায় কাছি জড়াইয়া বড় বড় গাছের সহিত বাঁধিয়া রাখে। এইভাবে কয়েকদিন পর্য্যন্ত অনাহারে রাখিলে হাতী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; তখন বন হইতে লইয়া আসিয়া ক্রমে শিক্ষা দিয়া বশীভূত করে।

ফাঁসী শিকার ;—ফাঁসী শিকারে কেবল কুনকী হাতীই ধরিয়া থাকে। বন্য কুনকীগুলি পালিতা কুনকীর পৃষ্ঠে লোক দেখিলেই প্রাণপণ করিয়া দৌড়িতে থাকে; মাহুতেরাও তখন বন্য কুনকীর পিছে পিছে পালিতা কুনকী ধাবিত করিয়া দেয়। পালিতা কুনকী যখন দৌড়িয়া গিয়া বন্য কুনকীর পাশাপাশি হয়, তখন অমনি একজন শিকারী বন্য কুনকীর মাথা ও শুণ্ডের উপর দিয়া মোটা দড়ির ফাঁসী ফেলিয়া দেয়। ফাঁসী লাগাইবার সময় যদি কুনকীটা শুণ্ডের দ্বারা ফাঁসীর দড়ী ফেলিয়া দেয়, তবেই রক্ষা পাইতে পারে, কিন্তু ফাঁসীর দড়ী দেখিলেই উহারা শুণ্ড সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে; ফাঁসীটাও তাহাতে বেশ সুবিধামত গলায় লাগিয়া যায়। তার পর যত টান লাগিতে থাকে তত ফাঁসী কসিয়া যায়। একবার এই ফাঁসী

পরাইতে পারিলে, তার পর সহজে বশীভূত করিয়া ফেলে।

খেদা শিকার ;—খেদা শিকার উপরে লিখিত উভয় প্রকার শিকার হইতেই স্বতন্ত্র। পরতালা ও ফাঁসী শিকারে একবারে একটীর অধিক হাতী ধরা যায় না; কিন্তু খেদা শিকারে এক একবারে অনেকগুলি করিয়া হাতী ধরা পড়ে। যে স্থানে হাতী দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, শিকারীরা সেই স্থানের চারিদিকে অনেকখানি ভূমি বেষ্টন করিয়া ৭।৮ হাত অন্তর এক একজন প্রহরী রাখিয়া দেয়। ঐ প্রহরীরা একখানি করিয়া খুঁটী পুতিয়া তাহাতে লতা পাতা জড়াইয়া বেড়া প্রস্তুত করে। এই সময়ে ইহারা অতি নিঃশব্দে কার্য্য করে; হাতীরা ইহাদের অভিসান্ধি কোন মতে বুঝিতে পারে না। যদি কোন হাতী এই বেড়ার বাহিরে যাইবার উপক্রম করে, তবে ইহারা বন্দুকের আওয়াজ করিয়া বা অন্য কোন উপায়ে ইহাদিগকে ভয় দেখাইয়া, আবার খেদার ভিতরে তাড়াইয়া দেয়। তার পর এই খেদার ভিতরে উপযুক্ত স্থান দেখিয়া একটী খোঁয়াড় প্রস্তুত করে। খোঁয়াড়ের এক দিকে একটী দরজা থাকে, এবং একখানি কপাট এমন কৌশলে ইহার উপরে রাখা হয় যে, তাহা ছাড়িয়া দিবামাত্র দরজা বন্ধ হইয়া যায়। খোঁয়াড় প্রস্তুত হইলে শিকারীরা কৌশল করিয়া হাতীগুলিকে তাড়াইয়া ক্রমে এই খোঁয়াড়ের মধ্যে লইয়া যায়; এবং খোঁয়াড়ে আনিয়াই কপাট বন্ধ করিয়া দেয়। তার পর পালিতা কুনকী লইয়া ঐ খোঁয়াড়ের মধ্যে যাইয়া হাতীগুলিকে ক্রমে বাঁধিয়া ফেলে।

বন হইতে ধরিয়া আনিবার পর ইহারা সহজে বশীভূত হয় না। বন হইতে ধরিয়া আনিয়া প্রথমতঃ বাঁশ ৯।১০ ভাগে চিরিয়া তাহা দ্বারা উহাদের শরীর ঘর্ষণ করিতে হয়; ইহাতে হাতীর শুড়শুড়ি ভাঙ্গিয়া যায়। তার পর পালিতা কুনকীর পৃষ্ঠে বসিয়া ক্রমে ক্রমে উহাদের পৃষ্ঠে চড়িতে চেষ্টা করে; এবং পালিতা কুনকীর সহিত বাঁধিয়া উহাদিগকে এদিক ওদিক ফিরাইয়া থাকে। এই সময় কোন প্রকার অবাধ্যতা করিলেই অঙ্কুশ দ্বারা খুব আঘাত করিয়া থাকে। এইরূপ কিছুদিন করিলেই মানুষের সঙ্গে চলিতে অভ্যস্ত হয়। তারপর ইহাদিগকে বসিবার প্রথা শিক্ষা দেওয়া হয়। কয়েক দিন পর্য্যন্ত ভাল করিয়া স্নান করিতে না দিয়া খুব রৌদ্রে বাঁধিয়া রাখে; পরে একদিন জলে লইয়া গেলে উহারা আপনা হইতেই জলে বসিবার উপক্রম করে, তখন মাহুতেরা "বইঠ্ বইঠ্" করিতে থাকে। কিছুদিন এইরূপ করিলে উহারা জলে বা শুষ্ক স্থানে, যেখানেই হউক "বইঠ্" বলিলেই বসিয়া পড়ে। শিক্ষা দিতে পারিলে হস্তি দ্বারা মানুষের প্রয়োজনীয় অনেক কাজ করিয়া লইতে পারা যায়। হস্তীর বুদ্ধিশক্তি অত্যন্ত প্রবল। মাহুতকে ইহারা অত্যন্ত ভালবাসে, মাহুতের কোন বিপদ হইলে, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য ইহারা প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া থাকে।

মজার খেলা ।

খুব বৃষ্টির দিন, প্রায় প্রত্যহই জল হয়, ঘরের বাহির হইয়া ছেলেরা খেলা করিতে পায় না। তাদের বড়ই মুস্কিল। আর কি করেই বা চুপ্‌টী করে ঘরের কোণে বসে থাকে। তাই প্রফুল্ল আর রমেশ ছুজনে বসে বসে অনেক মাথা ঘুরাইয়া স্থির করিল যে, সন্ধ্যার সময়ে বড় বারান্দায় একটা বড় মজার তামাসা দেখাইবে। কিন্তু সেটা কি তাহা কাহাকেও বলা হইবে না। রমেশ তাদের রামা চাকরকে ডাকিয়া বলিল যে, "উপরের ঘরের আলনা থেকে বাবার মেটে রঙ্গের ফুল্‌ষ্টকিং আর মেটে রঙ্গের র‍্যাপার আর শাল নিয়ে আয়। খানকটে তুলো আর একটা ঝাঁটাও আনিস্।" রামা এই সকল দ্রব্য লইয়া আসিলে তাহারা ছুজনে হরি আর যছুকে ডাকিয়া আনিয়া এক ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া কি করিতে লাগিল। প্রায় ঘণ্টা খানিক পরে আবার রামাকে ডাকিয়া বলিল যে, "খুড়িমা, দিদি, সরোজিনী ও মোনাকে নীচে ডেকে দে, কিছু বলিস্‌নে, এই ঘরের ভিতর পাঠিয়ে দে।"

তাঁরা যেই ঘরের ভিতর আসিয়াছেন আর অমনি গভীর গর্জ্জনে মোনার উপর একটা প্রকাণ্ড সিংহ লাফাইয়া পড়িল। একটা হাতী ভোঁস ভোঁস করিতে করিতে সরোজিনীকে জড়াইয়া ধরিল। মোনা আর সরোজিনী ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল, খুড়িমা ও দিদি ছোঁড়াদের রঙ্গ দেখিয়া হাঁসিতে লাগিলেন। মোনা ও সরোজিনী খানিক পরে সব বুঝিতে পারিয়া তাহারাও বড় মজা হইয়াছে বলিয়া আনন্দে হাত তাল দিতে লাগিল। পাড়ার সব ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ডাকিয়া আনিল। তাহাদের মধ্যেও বড় আনন্দের ঢেউ উঠিয়া গেল। এইরূপে সেই জল কাদার দিনের বৈকাল বেলাটা বেস আমোদেই কাটিয়া গেল।

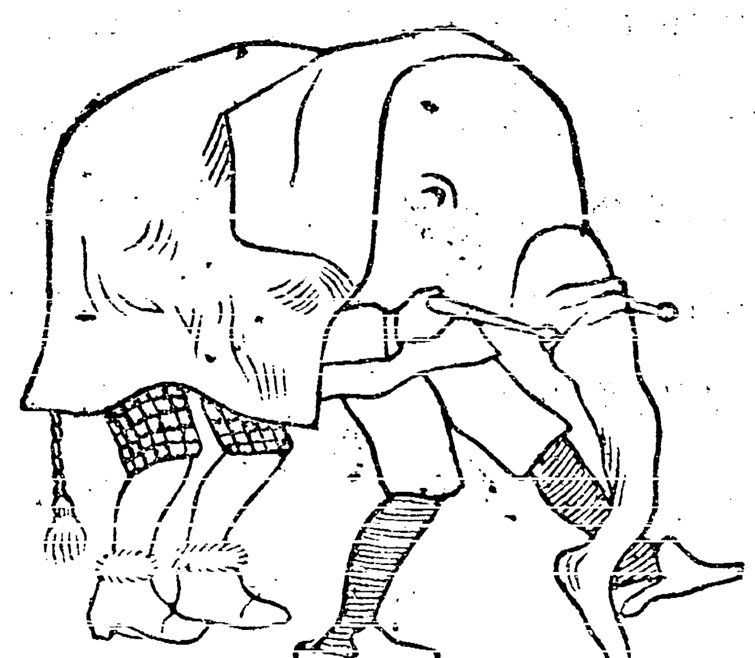

এই ছবি দেখিলেই তাহারা কি কি কাণ্ড করিয়াছিল, কি করিয়া সেই ঘরে হাতী আর সিংহ আসিল তাহা তোমরা সব বুঝিতে পারিবে, ইহার বিশেষ বিবরণ দিতে হইবে না।

পাটীগণিতের ফল ।

প্রায় পাটীগণিতেই অঙ্কের ফল শেষের দিকে থাকে। আমাদিগের স্কুলের ছাত্রেরা অঙ্ক করিবার সময় কেহই পাটীগণিতের ফল দেখিত না। সুতরাং পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রদিগের হস্তে পাটীগণিত দিয়া নিশ্চিন্ত মনে অন্যান্য কার্য্য করিতেন। অঙ্ক করিবার সময় পাটীগণিতের ফল দেখা সকলেই লজ্জাজনক মনে করিত।

অল্প দিন হইল গোপাল নামক একজন বালক স্কুলে ভর্ত্তি হইল। গোপাল বাড়ীতে তেমন সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং মিথ্যা কথা বলা বা গোপনে ফল দেখিয়া অঙ্ক কষিয়া বাহাদুরি লওয়া সে অন্যায় মনে করিত না।

আমাদিগের পণ্ডিত মহাশয় কোন ছাত্রকে সন্দেহ করিতেন না। গোপাল প্রতিদিন পাটীগণিতের ফল দেখিয়া অঙ্কটী তাড়াতাড়ি মিলাইয়া পণ্ডিত মহাশয়কে দেখাইত। পণ্ডিত মহাশয় অঙ্ক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া তাহার প্রশংসা করিতেন; এবং বলিয়াছিলেন এ বৎসরে যাহার বেশী অঙ্ক শুদ্ধ হইবে বৎসরের শেষে তাহাকে একটী পুরস্কার দিবেন। গোপালের একটী আঁকও ভুল যায় না; সুতরাং গোপাল যে ঐ পুরস্কার পাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

গোপাল ভারি সাবধান। অঙ্ক দেওয়া মাত্র সে ঝাঁ করে পাটীগণিতের ফলটী দেখিয়া লইত। অন্য কেহ বড় টের পাইত না। একদিন সুধীর বলিয়া উঠিল,—"কি গোপাল, পাটীগণিতের ফল যে দেখিলে?"

গোপাল দৃঢ়তার সহিত বলিল;—"কই, আমি কখন্ ফল দেখিলাম! আমি পাটীগণিতের পাতা উল্টাইলাম, না!" এই কথা বলিয়া গোপাল তাড়াতাড়ি চাহিয়া দেখিল পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন কি না।

পণ্ডিত মহাশয় অন্য শ্রেণী লইয়া ব্যস্ত আছেন। সুতরাং সুধীরকে শান্ত করিতে পারিলেই সকল গোল চুকিয়া যায়। এই ভাবিয়া গোপাল পকেট হইতে কতকগুলি মার্ব্বেল বাহির করিল এবং সুধীরকে চুপি চুপি বলিল;—"সুধীর, ভাই মার্ব্বেলগুলি নিবি? দেখ আমার কত মার্ব্বেল আছে।"

প্রলোভন বড় শক্ত জিনিস। কিন্তু সুধীর বাপ মার নিকটে লোভের অপকারিতার কথা শুনিয়াছিল, তাই সে বলিল;—"না ভাই, আমি মার্ব্বেল চাই না। তুমি যে আমাকে ভালবাস, এই চের।" এই কথা বলিয়া সুধীর নিবিষ্ট মনে আঁক কষিতে লাগিল।

গোপাল আবার বলিল—"আচ্ছা ভাই আমি ফল দেখিতেছিলাম, তাহা আর বলো না। তুমি তো জান আমি দেখি নাই।"

সুধীর উত্তর করিল—"বলে দিব, ইহা আমি মনেও করি নাই।" কিন্তু সুধীরের মনে একটু অশান্তি বোধ হইতে লাগিল। সেই দিন হইতে সুধীর গোপালের নিকট বড় ঘেঁসিত না।

পাপের বাতাস যাহার গায় লাগে তাহার গা না পুড়িয়া যায় না। সুধীর গোপালের নিকট ঘেঁষিত না বটে; কিন্তু গোপালের সংস্পর্শে সুধীরের মনে যে দাগ পড়িয়াছিল, তাহা সহজে উঠিয়া গেল না। সুধীর কোন দিন স্বপ্নেও ভাবে নাই গোপালের এই পাপ তাহাকে স্পর্শ করিবে—তাহার উজ্জ্বল বুদ্ধি ইহাতে মলিন হইয়া

যাইবে। কিন্তু শাস্ত্রে বলে—"যে দৃঢ় ভূমির উপর দাঁড়াইয়া আছে তাহারও পড়িয়া যাইবার ভয় করা উচিত।" অঙ্কের পুরস্কার লাভ করিবার জন্য সুধীরও চেষ্টা করিতেছিল। গোপাল প্রতারণা করিয়া তাহার ন্যায়তঃ প্রাপ্ত পুরস্কার কাড়িয়া লইবে সুধীরের ইহা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল।

এক দিন সুধীর আঁক কষিতেছে। আঁক ভারি শক্ত। স্লেটের দুই পিট ভরিয়া কত কষ্ট করিয়া কষা গেল তবু আঁক মিলিল না। এই কষা পুঁছিয়া আবার অত গুণন করিয়া কষা, সে কি সম্ভব? মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। গোপাল পুরস্কার লউক, সুধীর অঙ্কে ভুল করিয়া সকলের নীচে হউক তা স্বীকার, তবু অঙ্ক কষিতে সুধীরের প্রাণ যাইতেছে না। সুধীরের প্রাণের ভিতর যেন কে বলিয়া উঠিল,—"গোপালত এত কষ্ট করে না, সে প্রতিদিন বেশ নম্বর পায়। গোপালের মত করিলেই তো সব গোল চুকিয়া যায় এবং পুরস্কার পাইবার আর কোন সন্দেহ থাকে না।"

সে দিন সুধীরের মনে এই চিন্তার উদয় হইলেও সুধীর ফল দেখিল না। আর একদিন আরও শক্ত আঁক। গুণন করিতে করিতে সুধীরের মুখ লাল হইয়া গিয়াছে। মাথা ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। সুধীর আর সহ্য করিতে পারিল না, কুক্ষণে পাতা উল্টাইয়া ফল দেখিয়া লইল। কুক্ষণে পাপ সুধীরের পবিত্র অন্তরে প্রবেশ করিল। সে দিন যদি পণ্ডিত মহাশয় সুধীরকে একটু প্রশংসা করিতেন তবেই মুখের ভাবে সুধীরকে ধরা পড়িতে হইত। সুধীর পাপ স্বীকার করিত। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় বড় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি স্লেট দেখিয়া কেবল 'শুদ্ধ' বলিয়া ফিরাইয়া দিলেন। সুধীরের দুর্ভাগ্য তাই সুধীর ধরা পড়িল না। নির্ব্বিঘ্নে স্থানে গিয়া বসিল। যেমন উচ্চ স্থান হইতে একবার পা ফস্‌কাইলে আর দাঁড়ান যায় না; গড়াইতে গড়াইতে নীচে যাইয়া পড়িতে হয় সুধীরেরও তাহাই হইল। একবার ফল দেখিল ধরা পড়িল না, আবার ফল দেখিবার ইচ্ছা হইল। ক্রমে সাহস বাড়িয়া গেল। একদিন যে পাপ দেখিয়া অন্যকে সাবধান করিতে গিয়াছিল, আজ সেই পাপ সুধীরের অভ্যাস হইয়া গেল। সখার পাঠক পাঠিকা! তোমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর তোমাদিগের যেন এ প্রকার পদস্খলন না হয়।

ক্রমে বৎসর ফুরাইল। সকলেই পুরস্কারের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। সুধীর এত নম্বর পাইয়াছে এবং সচ্চরিত্রের জন্য এমন সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে যে, সকলেই মনে করিতে লাগিল সুধীর নিশ্চয়ই প্রথম পুরস্কার পাইবে। কিন্তু সুধীর সেরূপ ভাবিতেছিল না। সুধীর জানিত গোপাল অঙ্কে তাহার অপেক্ষা বেশী নম্বর পাইবে। প্রতারণা করিয়া পুরস্কার লইবে এ ইচ্ছা সুধীরের জন্মে নাই। কেবল কষ্টের হাত এড়াইবার জন্য সুধীর প্রতারণা করিত—অন্য বালকদিগকে ঠকাইবে ইহা তাহার ইচ্ছা ছিল না। যখন সুধীরের মনে হইল কি জানি ভাগ্যক্রমে যদি সেই প্রথম পুরস্কার পায়, তখন তাহার একটু ভয় হইল। সুধীর আর পূর্ব্বের মত যত্ন করিয়া পাঠ তৈয়ার করিত না। কিন্তু গোপাল পুরস্কার লাভের সম্ভাবনায় ভারি গর্ব্বিত হইল। গোপাল যখন সুধীরের এই অবহেলা দেখিতে পাইল তখন তাহার আর অহঙ্কারের পরিসীমা রহিল না।

ক্রমে পুরস্কারের দিন নিকট হইয়া আসিল। সুধীরের মনে আর এক সন্দেহের উদয় হইল। সে তো দ্বিতীয় হইতে পারে। পঞ্চানন নামক

একটী বালক সুধীরের সমকক্ষ ছিল। সুধীর দ্বিতীয় হইলে তো পঞ্চাননকে তাহার ন্যায়তঃ প্রাপ্য পুরস্কার হইতে বঞ্চিত করা হয়। তবে কি সুধীর সমুদায় কথা পণ্ডিত মহাশয়কে খুলিয়া বলিবে? তাহা হইলেই সব পরিষ্কার হয়; কিন্তু সুধীরের তেমন সাহস হইতেছিল না। তা ছাড়া সুধীর গোপালের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছে সে তাহার কথা কাহারও নিকট বলিবে না।

আজ পুরস্কার বিতরণের দিন। পণ্ডিত মহাশয় পুরস্কারগুলি টেবিলের উপর সাজাইয়া বিতরণের জন্য দাঁড়াইলেন। সর্ব্বাগ্রে গোপালের ডাক পড়িল। গোপাল অহঙ্কারে উৎফুল্ল হইয়া হাসিতে হাসিতে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইল। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় আজ বড় গম্ভীর। তাঁহার গম্ভীরভাবে সমুদায় বিদ্যালয় গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"তুমি তোমার শ্রেণীতে সর্ব্ব প্রথম হইয়াছ। কিন্তু এই পুরস্কার আমি তোমাকে দিতে পারিলাম না। আমি আজ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলাম যে, আমি সকলের নিকট তোমার অপকীর্ত্তির কথা বলিতে পারি এবং তুমিও তোমার দোষ ভাল করিয়া বুঝিতে পার।"

গোপালের মুখ শুকাইয়া গেল। যদি এই সময়ে কেহ সুধীরের দিকে চাহিত, তবে দেখিতে পাইত তাহারও মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় বলিতে লাগিলেন—

"তুমি আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ। তুমি যত নম্বর পাইয়াছ তাহার অধিকাংশই প্রতারণার ফল। তুমি যে পাটীগণিতের ফল দেখিয়া অঙ্ক শুদ্ধ কর, ইহা আমি কেবল দুই সপ্তাহ হইল ধরিতে পারিয়াছি। তোমার মনে আছে সে দিন আমি যে পাটীগণিত দেখিয়া অঙ্ক কষিতে দিয়াছিলাম ঐ পাটীগণিতের ফলগুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। সে দিন তোমার একটী অঙ্কও শুদ্ধ হয় নাই। ইহাতেই আমি তোমার প্রতারণা বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার চরিত্র আমি কিরূপ চক্ষে দেখিতেছি তাহা আমি তোমাকে বলিতে চাই না. তবে এই মাত্র বলিতেছি যে, সকলেরই মনে তোমার চরিত্র সম্বন্ধে একই ভাবের উদয় হইয়াছে। তুমি আপনার স্থানে যাও। তুমি কি জন্য পুরস্কার পাইলে না ইহা তোমার পিতা মাতা অবশ্যই জানিতে পারিবেন। আমি তোমার পুরস্কার দ্বিতীয় বালককে প্রদান করিব।"

এখন গোপালের সাহস ও অহঙ্কার কোথায় চলিয়া গেল? গোপাল আপনার স্থানে গিয়া মাটির দিকে মাথা হেট করিয়া বসিল। এবং বিদ্যালয়ের সকল বালক তাহার দিকে ঘৃণার চক্ষে চাহিতে লাগিল। এই সময়ে সুধীর কাঁপিতে কাঁপিতে আপনার স্থান হইতে উঠিল এবং ছুটিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট গিয়া ফুলিতে ফুলিতে বলিতে লাগিল—

"আমি দ্বিতীয় হইয়াছি কি না, আমি জানি না। যদি দ্বিতীয় হইয়াও থাকি আমি এই পুরস্কার লইতে পারি না। আর যদি না হইয়া থাকি তথাপি আমি আমার দোষের কথা আপনার নিকট বলিব। আমি গোপালের ন্যায় দোষী। আমি কেমন করিয়া এমন নীচ কর্ম্ম করিলাম বলিতে পারি না; কিন্তু আমিও পাটীগণিতের ফল দেখিয়াছি।" সুধীর আর কথা বলিতে পারিল না। একবারে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পণ্ডিত মহাশয় দুঃখিত ভাবে বলিলেন—"বাছা! এ কি সম্ভব?" তিনি উভয়েরই অপ-

বাঙ্গালা অংশ পদ্যময়। গ্রন্থের শেষভাগ এইরূপ——

চব্বিশ অবতারে হরি যে যে লীলা কৈল।
প্রথম স্কন্ধাবধি সম্যক্ ভাগবত হৈল॥

অস্যানুবাদ——

প্রথম স্কন্ধে পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ কথনং। দ্বিতীয় স্কন্ধে সৃষ্টি সৃজনং। তৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মাণ্ড নির্ণয়ং। চতুর্থ স্কন্ধে সমুদ্র মন্থনং। পঞ্চম স্কন্ধে প্রহ্লাদ চরিত্র বর্ণনং। ষষ্ঠ স্কন্ধে বামন চরিত্রকং। সপ্তম স্কন্ধে রঘুনাথ চরিত্রং। (অষ্টম স্কন্ধের উল্লেখ নাই)। নবম স্কন্ধে বংশাবলী চরিত্রং। দশম স্কন্ধে কৃষ্ণলীলা চরিত্রং। একাদশে ভক্তিযোগ কথনং। দ্বাদশ স্কন্ধে পরীক্ষিতের স্বর্গারোহণ। ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে (পড়া যায় না)

উদ্ধৃত অংশের অশুদ্ধি সংশোধনের প্রয়াস পাই নাই। আদর্শ পুস্তকে যেমন আছে, তেমনি লিখিত হইল। আমরা প্রবন্ধের প্রথমে এই গ্রন্থকে ভাগবতের অনুবাদ বলিয়া বোধ হয় ভুল করিয়াছি। ভাগবতের উপাখ্যানের সারভাগ ইহাতে লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া ইহার আদর হওয়া উচিত।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

দয়ানন্দ আশ্রম।

(১)

ব্রজরাজ বলিলেন "সাবিত্রী আজ যাহা শুনিলাম তাহাতে আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না।"

সাবিত্রী। কি শুনিলে?

ব্রজরাজ। প্রতি গৃহ মৃত দেহে পূর্ণ, রাজপথে রাশীকৃত শব। প্রতিদিন শত শত রোগী শুশ্রূষা অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; ভয়ে কেহ রোগিদেহ স্পর্শ করে না, ক্ষুধিত শিশু মৃত জননীর বক্ষঃস্থলের উপর শয়ন করিয়া স্তন হইতে রুধিরধারা পান করিতেছে, তাহারও পানে কেহ ফিরিয়া চাহিতেছেনা, যে যেদিকে সুবিধা পাইতেছে সে সেই দিকে পলায়ন

করিতেছে। যদি শীঘ্র এ রোগের উপশম না হয় তাহা হইলে গৌড় অচিরে জনশূন্য হইবে।

সাবিত্রী। সকলই সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা, তুমি আমি মানুষ, তাঁহার ইচ্ছার প্রতিরোধ কে করিবে?

ব্রজরাজ। তাঁহার ইচ্ছার প্রতিরোধে কাহারও শক্তি নাই কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা পালনে তোমার আমার শক্তি আছে।

সাবিত্রী। কি করিতে চাও।

ব্রজরাজ। আমি যাই, তুমি কিছু দিন একাকিনী থাক, এ বিপদের সময় যদি একটি রোগীকে শুশ্রূষা দ্বারা বাঁচাইতে পারি, একটি মুমূর্ষুর প্রাণ রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলে সেই অনাথনাথ যে উদ্দেশ্যে আমাদিগকে মনুষ্য রূপে সৃজন করিয়াছেন তাহার কথঞ্চিৎ সার্থকতা হইবে।

সাবিত্রী। যে স্থান সকলে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে সেখানে তুমি কেমন করিয়া যাইবে? যদি নিজের কিছু বিপদ ঘটে!

ব্রজরাজ। সাবিত্রি! তুমি এখনও বালিকা, নিজের বিপদের দিকে লক্ষ্য করিলে পরোপকারব্রত হয় না। প্রাণ যায় পরের জন্য যাইবে।

সাবিত্রী। একজনকে মারিয়া আর একজনের প্রাণ রক্ষা কি ধর্ম্ম?

ব্রজরাজ। একজনকে মারিব কেন?

সাবিত্রী। মারিবে না কিসে? আপনাকে মারিবে, আমাকে মারিবে, তবু একটি প্রাণও বাঁচাইতে পারিবে কি না জানি না।

ব্রজরাজ। তবে কি তুমি আমাকে যাইতে নিষেধ কর?

সাবিত্রী। নিষেধ করি না, তুমি আমাকে কখন সে শিক্ষা দাও নাই। তুমি পরের জন্য, ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিবে আমি তোমাকে নিষেধ করিব? তবে আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, তুমি যে ধর্ম্মকার্য্য করিবে, আমি তোমার কাছে কাছে থাকিয়া সেই ধর্ম্মকার্য্যের সহায়তা করিব—ইহাতে আমার অধিকার আছে, পুণ্য আছে, স্বর্গ আছে।

ব্রজরাজ। সে কথা সত্য বটে, কিন্তু এ সময় নয়।

সাবিত্রী। ইহার আবার সময় অসময় কি? আমিতো তোমার

লইল। তৎপরে সে একদিন ছদ্মবেশধারী ভাগিনেয় ও অন্য একজন বন্ধুর সহিত অলঙ্কার দেখিতে আইসে। গৃহ রক্ষক তাহার রীতি অনুসারে তিন জনকে গৃহ মধ্যে লইয়া তালা লাগাইয়া গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। যেই দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে অমনি তিনজনে মিলিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া খুব প্রহার করিতে লাগিল ও ছুরিকা দ্বারা দেহ ক্ষত বিক্ষত করিয়া মৃতবৎ ফেলিয়া রাখিল। তাহারা মুকুট ও অন্যান্য দ্রব্য চুরি করিয়া আপন আপন পরিচ্ছদের মধ্যে লুকাইয়া দরজা খুলিয়া ভদ্রের ন্যায় চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, এই সময়ে সেই স্থানে হঠাৎ একজন সৈনিক পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইল ও ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া 'চোর চোর, মুকুট চুরি গিয়াছে' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই সৈনিক পুরুষ ও দ্বার রক্ষকগণ অনেক দৌড়াদৌড়ির পর চোর ধরিয়া ফেলে। এই টানাটানিতে মুকুট হইতে অনেক হীরা মুক্তা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়।

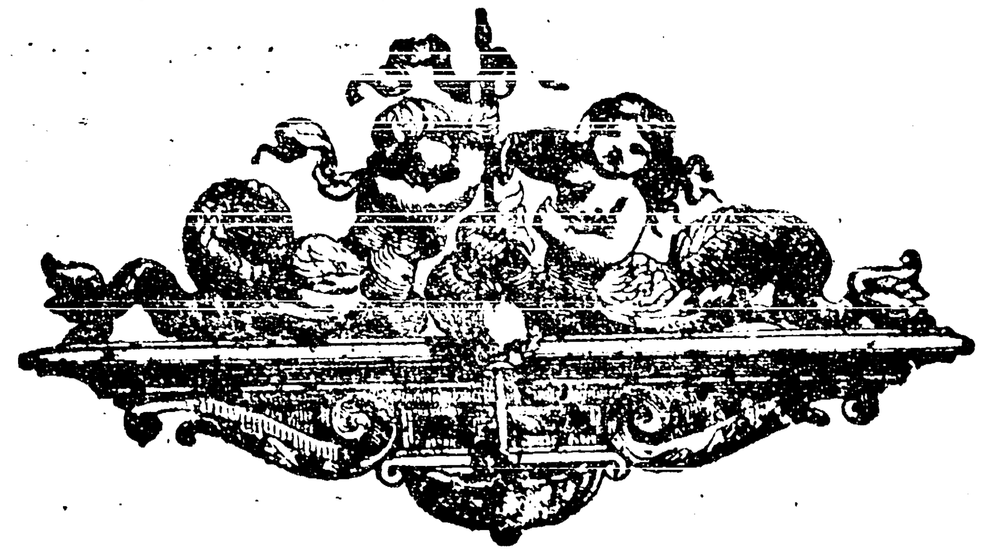

হেঁয়ালি গল্প।

তোমাদের নিকট আমার পরিচয় দিতে বড়ই ইচ্ছা হয়। আমার কথা তোমরা ভাব আর নাই ভাব তবুও আমার কথা একটু আধটু মনে রাখা উচিত। কারণ আমি সর্ব্বদাই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াই। আমি সর্ব্বদাই তোমাদের অনুকরণ করে থাকি। তোমরা যখন যা কর আমি তাই করি। তোমরা যেই বই হাতে কর আমিও ঠিক সেই সময়ে বই হাতে করি; তোমরা যখন লাফালাফি কর আমিও সেই সময়ে লাফালাফি করিতে আরম্ভ করি। তোমরা যখন বেড়াও আমিও তখন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতে আরম্ভ করি।

তোমরা যেমন ধারা কাপড় পর আমিও ঠিক সেই রকম কাপড় পরি। কিন্তু তোমরা যেমন লাল, নীল, নানা রকমের পোষাক পর্‌তে পাও আমার কপালে তা হবার যো নাই। আমি যে কি শাপ-গ্রস্থ, আমাকে সর্ব্বদাই কাল পোষাকে গা ঢাকিয়া থাকিতে হয়। কাল পোষাক ভালবাসি বলে তোমরা মনে করিও না যে, আমি অন্ধকারও ভালবাসি। অন্ধকার আমি দু চক্ষে দেখিতে পারি না। অন্ধকারের মধ্যে কথনও আমাকে দেখিতে পাইবে না। তোমরা কেহ যদি অন্ধকারের মধ্য হইতে আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পার তবে তাঁহার কপাল ফিরিয়া যাইবে। আমি তাঁহাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিব।

আলোর সঙ্গে আমার বড়ই ভাব। আলো এক দণ্ড না দেখ্‌তে পেলে আমি আর বাঁচিনা। আলো যখন ক্ষীণ হয়ে পড়ে, আমি তখন সেই দুঃখে একেবারে তেজহীন হয়ে পড়ি। মেঘেরা যখন সূর্য্যকে এসে একেবারে আড়াল করে রাখে আর ভাল করে দেখ্‌তে দেয় না, আমি সেই সময়ে পৃথিবীতে না থাক্‌বার মত হয়ে পড়ি। আবার সূর্য্য যখন মেঘের ভিতর থেকে হাস্‌তে হাস্‌তে মুখখানি বার করে, আমারও তখন আর আহ্লা-

দের সীমা থাকে না; আমার সেই সময়ে বড় স্ফূর্ত্তি হয় ও খুব সতেজ হয়ে পড়ি। সূর্য্যের তেজ যখন বড় বেড়ে যায়, ঠিক মাথার উপর থেকে গরম আর প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতে থাকে, আমার তখন বড়ই কষ্ট বোধ হয় আমি তাড়াতাড়ি জড়সড় হয়ে তোমাদের পায়ের তলায় গিয়ে আশ্রয় লই। আমার বেশ একটি আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে যে, ইচ্ছামত আমার দেহকে ছোট বড় করিতে পারি।

চাঁদের আলো, সূর্য্যের আলো, গ্যাস, বাতী বা বিদ্যুতের আলো সব আলোর সঙ্গেই আমার সমান ভাব। প্রদীপের আলোর শীসটি যখন দুলিতে থাকে, আমিও তখন নাচিতে আরম্ভ করি।

আমার স্বভাব বড় ঠাণ্ডা। এই গ্রীষ্মকালে রোদের চোটে যখন প্রাণ অস্থির হয়, তখন পথিকেরা আগ্রহ সহকারে আমার আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়ায়। আমি আত্ম প্রশংসা করিতেছি না, সত্য কথা বলিতেছি আমার একটা প্রধান গুণ আছে নম্রতা। আমি সর্ব্বদা তোমাদের পায়ের কাছেই পড়ে থাকি। কথন কথন উঠে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। তোমরা আমায় কত পদ দলিত করে যাও, আমি নীরবে সব সহ্য করি। আমার মুখে একটিও কথা নাই; আমার ঠোঁট দুখানি নড়িতে দেখিবে; কিন্তু আমার মুখ দিয়া সামান্য শব্দটি বাহির হইতে শুনিবে না। কতবার কত গাড়ি ঘোড়ার তলে পড়ি তবুও আমার মুখে কোন শব্দ নাই। আমি কথন কথন কুকুরটির মত তোমাদের পেছনে পেছনে তোমাদের সঙ্গে যেতে থাকি, আবার কথনও তোমাদের আগে আগে যাই, কিন্তু তোমাদের সম্মুখে পড়িলেও তোমাদের চলিবার কোন বাধা দি না। পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, খেচর ভূচর, অচেতন সচেতন সকলের সঙ্গেই থাকি। আমার এক জন জীবন চরিত লেখক বলেছেন যে, এক জন লোক আমার সঙ্গ ছাড়া হ'বার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়েছিলেন। আমার সঙ্গ ছাড়্‌তে গিয়ে ভায়া বড় মুস্কিলেই পড়েছিলেন। তাই তোমাদের সৎপরামর্শ দিচ্ছি যে, কথন আমার সঙ্গ ছাড়্‌তে চেষ্টা করিও না বরং আমার সঙ্গ যত ভাল করে কাটাতে পার সেই চেষ্টা করিও।

পিঞ্জরে পাখী।

বালকের রচনা।

(প্রাপ্ত।)

(১)

কারাগার সম পিঞ্জর মাঝারে,
কেন মোরে রাখিলে ভরিয়ে?
পিঞ্জর হইতে অনুগ্রহ করে,
দেও এবে আমায় ছাড়িয়ে।

(২)

হয়েছে বাসনা অন্তর মাঝারে,
অনন্ত আকাশে উড়িবারে,
দেও ছেড়ে দেও ছেড়ে এবে মোরে,
যাই চলি নিবিড় কান্তারে।

(৩)

বনচর পাখী যাই আমি বনে,
উড়িয়ে উড়িয়ে সদা গাই,
প্রিয় বনচর পাখীগণ সনে,
মন সুখে সতত বেড়াই।

(৪)

সোণার পিঞ্জর সুখাদ্য আহার,
তোমার এ সব নাহি চাই,
এই মাত্র চাই মোরে দেও ছেড়ে,
কাননে উড়িয়ে আমি যাই।

(৫)

সদাই থাকিয়ে কারাগার মাঝে—
কেবল বিষাদে মরে যাই,
বাহিরে যাইতে কভু নাহি পারি
অন্ধকার যেদিকে তাকাই।

(৬)

বড় ভালবাসী বন পাখী সনে,
ইচ্ছামত করিতে চরণ
অনুগ্রহ করে যদি দেও ছেড়ে,
যাইতাম বিজন কানন।

(৭)

বনচর পাখী বনে চলি যাই
বন পাখী সনে গান গাই,
বন ফল আমি বনে বসে খাই,
মন সুখে উড়িয়ে বেড়াই।

(৮)

যত দেও তুমি সুখাদ্য আহার,
কিছুতেই মোর তৃপ্তি নাই,
ছেড়ে দেও, ছেড়ে দেও, ছেড়ে দেও,
তোমার নিকট এই চাই।

ভ্রম সংশোধন।

গত সংখ্যায় প্রুফ সংশোধনের অসাবধানতা বশতঃ প্রসন্ন কুমার ঠাকুর মহাশয়ের জীবন চরিতে কয়েকটী বিষম ভ্রমের সৃষ্টি হইয়াছিল। সখা ছাপা হইয়া গেলে এই ভুল লেখকের দৃষ্টি গোচর হয়, তখন তিনি আমাদিগকে এ বিষয় জানান। বাবু রাজেন্দ্র নাথ ঘোষও এই ভ্রম দেখাইয়া এক পত্র লিখিয়াছেন। ৭৭ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভ ২য় প্যারায় 'চার্‌লস্ পিকক্', স্থানে 'বার্নস্ পিকক্', হইবে।

৭৮ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভ ১২ লাইনে 'সেই থানে'র স্থানে 'ইতিপূর্ব্বে এই থানে' হইবে। ১৩ লাইনে 'ইংলণ্ডীয় মহিলার' স্থানে 'দেশীয় কোন খৃষ্টীয় মহিলার' হইবে (এই মহিলা রেবারেণ্ড কৃষ্ণ মোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা।)।—স, স।

হেঁয়ালি।

গত মে মাসের হেঁয়ালির উত্তর। *

তালা ও চাবি।

* নিম্নলিখিত গ্রাহকগণ হেঁয়ালি গল্পের ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

যতীন্দ্রকুমার ঘোষ, মেদিনীপুর; সতীন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা; রমানাথ পাল, সৈয়দপুর; কালীপ্রসন্ন প্রামাণিক, টাকী-শ্রীপুর; মন্মথনাথ চৌধুরি, পটুয়াখালী; বিনয়ভূষণ ঘোষ, তেঘরিয়া; ভাবগ্রাহী মহন্ত, কটক; শ্রীমতী লাবণ্যলতা চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা; শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ, নাড়াজোল; শ্রীমতী বিনোদিনী রায়, হাজারিবাগ; জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, হাজারিবাগ; শ্রীমতী হেমলতা দেবী, রাজগঞ্জ; কালীসদয় ঘোষাল, নারায়ণপুর; আনন্দচন্দ্র সরকার, রাঁচী; বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, হাওড়া; শ্রীমতী নলিনী সুন্দরী বসু, ঢাকা; নিশিকান্ত সেন, নোয়াখালী; বিহারীলাল সাহা, হরিনারায়নপুর।

সখা
সপ্তম ভাগ। ৭ম সংখ্যা।
জুলাই, ১৮৮৯।

বিবিধ।

স্কটলণ্ডের এক জন লোক ঘোড়ার পীঠে শস্তের বস্তা চাপাইয়া বাজারে বিক্রি করিতে যাইতেছিল। ঘোড়া উছুট খাওয়াতে দৈবাৎ শস্তের বস্তা ঘোড়ার পীঠ হইতে পড়িয়া গেল। অন্যের সাহায্য ভিন্ন ঘোড়ার পীঠে বস্তা তুলিবার যো ছিল না। একজন স্কটলণ্ড দেশীয় সম্ভ্রান্ত জমিদার ঐ রাস্তা দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন। লোকটীর ইচ্ছা তাহাঁকে সাহায্য করিতে আহ্বান করে। কিন্তু তাঁহার পদ মর্য্যাদা দেখিয়া তাঁহাকে প্রার্থনা জানাইতে সাহস পাইতেছিল না। ভদ্র লোকটী তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসার পূর্ব্বেই অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া শস্তের বস্তা অশ্বের পীঠে তুলিয়া দিলেন। শস্য বিক্রেতাও ভদ্রতা জানিত। সে ভদ্রলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়, কেমন করিয়া আপনার ঋণ পরিশোধ করিব?" ভদ্রলোক উত্তর করিলেন—"যখন অন্যকে এই অবস্থায় দেখ, জিজ্ঞাসার পূর্ব্বেই তাহাকে সাহায্য করিও। তাহা হইলেই ঋণ পরিশোধ হইবে।"

***

ইটালী দেশে এডিজ নদীর তীরে ভেরোনা নামক একটী নগর আছে। এই নগরে ঐ নদীর উপরে একটী পরম সুন্দর সেতু ছিল; এবং ঐ সেতুর মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া কোন ব্যক্তি মাশুল আদায়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করিত।

একবার দারুণ শীতে নদীর উপরিভাগ জমিয়া গেল; এবং কিছু কাল পরেই হঠাৎ গ্রীষ্ম হওয়ায় স্থানে স্থানে বরফ গলিয়া প্রকাণ্ড বরফপিণ্ড সকল জলের উপর ভাসিতে লাগিল। এই সকল বরফপিণ্ড বেগে সেতুর উপর পতিত হওয়ায় সেতুর দুই দিকই ভাঙ্গিয়া পড়িল; কেবল মাশুল সংগ্রাহকের ক্ষুদ্র বাড়ী সেতুর যে অংশের উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাই অবশিষ্ট রহিল। কিন্তু তাহাও জলের বেগে থর থর করিযা কাঁপিতে লাগিল। এক্ষণে মাশুল সংগ্রাহক দেখিল তাহার পরিত্রাণের কোন উপায়ই নাই। স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদিগকে লইয়া তাহাকে এই শীতল জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতে হইবে। তাহার মাথায় হঠাৎ যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল; হতাশায় উন্মত্তের ন্যায় হইয়া সে কেবল সাহায্যের জন্য চেঁচাইতে লাগিল।

নদীর তীরে অনেক লোক দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু এই সকল ভাসমান বরফপিণ্ড ঠেলিয়া প্রবল স্রোতে নৌকা লইয়া অগ্রসর হইতে কাহারও সাহস হইল না। হতভাগ্য প্রাণের পুত্র কন্যা ও স্ত্রী লইয়া এই শীতল জলে ডুবিয়া মরিতে যাইতেছে, কিন্তু তাহাদিগের জন্য আপনার জীবন একটু বিপদাপন্ন করিতে কাহারও হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল না। একজন ধনী তীরে দাঁড়াইয়া এই নিদারুণ দৃশ্য দেখিতেছিলেন, তাঁহার প্রাণে বড় ব্যথা লাগিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"যাও, ঐ হতভাগাদিগের সাহায্যের জন্য যে কেহ নৌকা লইয়া অগ্রসর হইবে, আমি তাহাকে বা তাহার পরিবারকে এই মোহরের থলি প্রদান করিব।" যদিও ধনীর প্রত্যেক কথাই সকলের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু এই বিপদের মুখে অগ্রসর হইতে কাহারও সাহস হইল না।

অবশেষে এক দরিদ্র কৃষক লাফাইয়া এক ক্ষুদ্র ডিঙ্গিতে চড়িল, এবং সুদৃঢ় ভুজবলে বরফ ঠেলিতে ঠেলিতে সেতুর নিকট উপস্থিত হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহার ডিঙ্গি এত ছোট ছিল যে, সকলের স্থান হইল না। এই বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে সাহসে ভর করিয়া তাহাকে তিনবার যাতায়াত করিতে হইয়াছিল। দুঃখী পরিবার এইরূপে আসন্ন মৃত্যু হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া জোড়হস্তে ভগবানের নিকট কৃষকের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করিতে লাগিল। ধনী অগ্রসর হইয়া তাহাকে মোহরের থলি প্রদান করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু কৃষক মোহরের থলি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিল—"মহাশয় আমি সোণার লোভে আমার জীবন এমন বিপদের মুখে ফেলি নাই। এই সকল লোক বাড়ী ঘর হারাইয়া বড় দুঃখে পড়িয়াছে, ইহাদিগকে আপনার মোহর প্রদান করুন।"

এই বলিয়া কৃষক কোথায় ছুটিয়া গেল, আর তাহাকে খুজিয়া পাওয়া গেল না।

* * *

কোন জজ একদিন লণ্ডনের রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন একজন লোক তাহার কঙ্কালাবশিষ্ট ঘোড়াকে বড়ই প্রহার করিতেছে। তিনি বিনয় করিয়া বলিলেন—"বাপু হে, রাখ, ঘোড়া মরে যে।" "আমার ঘোড়া আমি ঠেঙ্গাব" বলিয়া লোকটী আরও জোরে প্রহার করিতে লাগিল। জজ সাহেব দেখিলেন তাঁহার অনুনয়ে বিপরীত ফল ফলিল। তিনি জানিতেন যাহারা নির্দ্দয় তাহারা প্রায়ই ভীরু। তখন তিনি হস্তস্থিত যষ্টি লইয়া তাহার পীঠে দুই তিন ঘা বসাইলেন। লোকটী একটু নরম হইয়া বলিল—"মহাশয়, আমাকে মারিবার আপনার কি অধিকার আছে?" জজ সাহেব উত্তর করিলন—"ঘোড়া মারিবার তোমার যে অধিকার আছে, আমার লাঠিরও তেমন অধিকার আছে।"

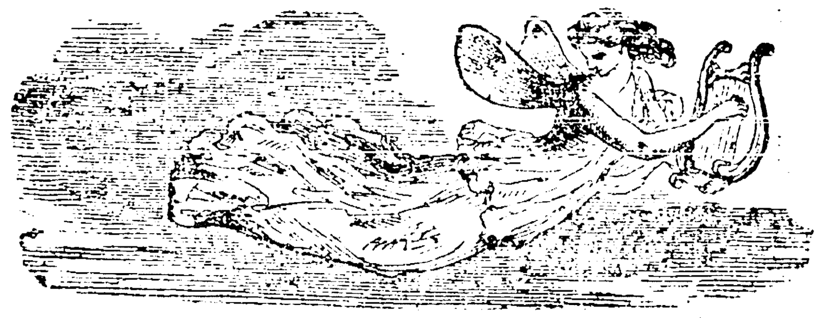

লিমার।

সখার পাঠক পাঠিকা! এখানে যে জন্তুটির চিত্র দেখিতেছ সেটি কি, জান? কেহ বলিবে বানর, কেহ বলিবে কাঠবিড়াল, আবার হয়ত কেহ কহে মনে করিবে এটি বিড়াল কিম্বা বেজির চিত্র। বাস্তবিক এই জন্তুটিকে হঠাৎ দেখিলে বানর, বিড়াল

কি বেজি মনে করা অসম্ভব নয়, কারণ ইহার সহিত ঐ সকল জন্তুর আকারগত অনেক মিল আছে—বিশেষ বানরের সঙ্গে। এই জাতীয় জন্তুকে "লিমার" বলে। ইহার বাঙ্গলা নাম কিছু নাই, আর থাকিবেই বা কেমন করিয়া, ভারতবর্ষেত এ জন্তু পাওয়া যায় না। আফ্রিকার নিকট-বর্ত্তী মাডাগাস্‌করদ্বীপে ইহাদের বাসস্থান। আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষেও এক প্রকার লিমারের মত জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহারা প্রকৃত "লিমার" নয়, প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে "লিমারের মত" জন্তু বলিয়া থাকেন।

উপরে বলা হইয়াছে যে বানরের সঙ্গে লিমা-রের অনেকটা আকারগত মিল আছে। তোমরা বলিতে পার কৈ লিমারের যে আকৃতি এখানে দেওয়া হইয়াছে তাহা ত হনুমান, কিম্বা মর্কট বানরের মত নয়! না, তা নয় সত্য। তোমরা যখন প্রাণিবৃত্তান্ত পড়িবে তখন জানিতে পারিবে যে হনুমান এবং মর্কট বানর যাহা সচরাচর দেখিতে পাও তাহা ভিন্ন আরও অনেক প্রকারের বানর আছে। তোমাদের মধ্যে যাহারা আলি-পুরের পশুশালা দেখিয়াছ তাহাদিগকে এ কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না। মনে ভাবিয়া দেখ দেখি সেখানে ছোট বড়, সাদা কাল কত প্রকারের বানর দেখিয়াছ। কোনটার ল্যাজ বড়, কোনটার ছোট, আবার কোন কোনটার একেবারেই লাঙ্গুল নাই। তাহাদের আকার অব-য়বও কত বিভিন্ন বিভিন্ন; কোনটা মানুষের মত, কোনটা সিংহের মত, আবার কোনটা কাঠবিড়ালের মত। পশুশালায় ত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারের কত বানর দেখিয়াছ, কিন্তু পৃথিবীতে যত প্রকারের বানর পাওয়া যায় তাহার এক তৃতীয়াংশও সেখানে নাই। কাঠবিড়ালের মত বানরগুলি দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায়, আর এই জাতীয় বানরের সঙ্গেই লিমারের আকারগত মিল আছে। সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু একটু ভাল করিয়া দেখিলেই বিভিন্নতাও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। লিমারের গায়ের লোম অনেকটা পশমের মত, বানরের তা নয়; লিমারের লাঙ্গুল কেমন ঘন পশমের মত লোমযুক্ত, বানরের লাঙ্গুলে এত লোম নাই। লিমারের কাণ বড় বড়, চক্ষু উজ্জ্বল, বড এবং ভাসাল। ইহাদের সম্মুখের পা দুখানি পশ্চাতের পা দুখানি চেয়ে ছোট, এইজন্য ইহারা কাঙ্গারুর মত লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। কিন্তু ইহাদিগকে এরূপ চলিতে প্রায়ই দেখা যায় না, কারণ ইহারা সচরাচর গাছের উপর থাকে। যেমন বিভিন্ন প্রকারের বানর আছে তেমনি বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারের লিমারও আছে।

যে প্রকার লিমারের আকৃতি এখানে চিত্রিত রহিয়াছে তাহাদের মুখ ছুচল, কিন্তু আর কয়েক প্রকার লিমার আছে তাহাদের মুখ ছুচল নয় এবং তাহাদের লাঙ্গুল বড় বড়। ইহারা দিনে প্রায় ঘুমাইয়া থাকে, সন্ধ্যার সময় আহার অন্বে-ষণের নিমিত্ত বাহির হয়। ইহাদের প্রকৃতি চঞ্চল। যে সকল প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিত ইহা-দিগকে মাডাগাস্‌করদ্বীপে দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন ইহারা অনেকগুলি দলবদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে এবং নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুকে সর্ব্বদা রত থাকে। সুমিষ্ট ফল এবং ছোট ছোট ডিম ইহাদের আহার। লিমার খুব পোষ-মানে, তখন ছাড়িয়া দিলেও পলাইয়া যায় না, যে প্রতিপালন করে তাহার কাছে থাকিতেই ভালবাসে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভারতবর্ষেও লিমারের মত এক প্রকার জন্তু পাওয়া যায়। ইহাদিগকে

সচরাচর "লজ্জাবতী" বানর বলে। বাস্তবিক ইহারা লজ্জাবতীই বটে, যখন দেখ তখনি দেখিবে ইহারা মাথা নিচু করিয়া বসিয়া কিম্বা শুইয়া আছে। নিতান্ত বিরক্ত করিলে এক আধবার মাথা তোলে এবং একটু মৃদু ভাবে "মিউ" করিয়া আবার মাথা লুকায়। যদিও দিনে এই-রূপ জড় ভাবে কাটায় কিন্তু রাত্রি হইলে ইহারা জড়তা পরিত্যাগ করিয়া আহার অন্বেষণের নিমিত্ত সচেষ্ট হয় এবং কচি কচি পাতা, ছোট ছোট পাখী, ডিম প্রভৃতি আহার করে। আসাম, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশ সকলে লজ্জা-বতী বানর পাওয়া যায়। ভারত মহাসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জেও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌ বফুন সাহেবের একটী লিমার ছিল। অতি যত্নপূর্ব্বক এটিকে তিনি প্রতিপালন করিতেন, এবং তাহার ইচ্ছামত ঘরের মধ্যে বেড়াইতে দিতেন। প্রথমতঃ ইহা বেশ শান্ত প্রকৃতি ছিল, কিন্তু যত বয়স বাড়িতে লাগিল তত দুষ্ট হইয়া উঠিল, অবশেষে বফুন সাহেব ইহাকে বাঁধিয়া রাখিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু দুষ্ট বুদ্ধি লিমার আবদ্ধ থাকিবার নয়, সে সময়ে সময়ে কৌশল করিয়া গলার ফাঁস খুলিয়া ফেলিত এবং পলাইয়া যাইত। সাহেবের বাড়ীর নিকটে রাস্তার ধারে একখানি মিঠায়ের দোকান ছিল, লিমার বন্ধন মুক্ত হইয়াই এই দোকানে গিয়া উপস্থিত হইত এবং এমন সতর্ক ভাবে এবং আস্তে আস্তে আহার করিত যে, সহজে কেহ টের পাইত না। মিষ্টান্ন কিছু না পাইলে সুমিষ্ট ফলগুলির উপর আক্রমণ করিত। কৌশল করিয়া গলার ফাঁস খুলিতে পারিলেই সে এই দোকানেই যাইত, কাযেই তাহাকে অন্য স্থানে খুঁজিতে যাইতে হইত না। সে কিন্তু সহজে ধরা দিত না, ঘরের এ কোণ ও কোণ করিয়া বেড়াইত, ধরিতে গেলেই কামড়াইতে আসিত।

ঊষাবালা।

আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে। ঊষাবালা, মালতী এবং পাড়ার আর আর ছেলে মেয়ে মিলিয়া চাকীদিগের পুকুরের ধারে খেলা আরম্ভ করিয়াছে। হঠাৎ মালতী ঘাসের উপর পড়িয়া গেল এবং তাহার পরিষ্কার ধব্‌ধবে কাপড়ে দাগ লাগিল। মালতীর মা বড় পরিষ্কার; তিনি ছেলে মেয়েদিগকে অপরিষ্কার দেখিলে ভারি বকেন। তাই মালতী মুখখানি ভার করিয়া ঘাটে কাপড় ধুইয়া আনিতে গেল।

সে ঘাটে একখানি তক্তা পাতা ছিল। অনেক দিন কেহ সে ঘাটে নামে নাই। খুঁটা পচিয়া গিয়াছে! মালতী যেমন তক্তার উপর পা দিয়াছে অমনি মড়মড় করিয়া তক্তাখানি ভাঙ্গিয়া মাল-তীর সহিত জলে পড়িয়া গেল। বড় বড় ছেলে মেয়েরা সকলেই মালতীর বিপদ দেখিয়া ঊর্দ্ধ-শ্বাসে পলাইল। পলাইল না কেবল ঊষাবালা।

ঊষাবালা দৌড়িয়া ঘাটে গেল এবং তাড়া-তাড়ি মালতীর পা যেটুকু জলের উপর ছিল ধরিয়া ফেলিল। ঊষাবালার ক্ষুদ্র শরীরে তেমন

বল ছিল না যে, মালতীকে শীঘ্র টানিয়া উঠায়। তবু তাড়াতাড়ি টানিতে লাগিল এবং টানিয়া তাহাকে কিনারায় আনিল। মালতীও অবলম্বন পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঊষাবালা তাড়াতাড়ি তাহার জলসিক্ত দেহ জড়াইয়া ধরিয়া ভীত ও কম্পিত মুখখানি ধরিয়া চুমো খাইল।

মালতী ঊষাবালার আদরে প্রীত হইল বটে, কিন্তু এই ভিজা কাপড় লইয়া মার নিকটে যাইতে তাহার সাহস হইল না। চক্ষের জলে তাহার দুই গণ্ড ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ঊষাবালা বলিল—"ভাই কাঁদ কেন, চল তোমার মার কাছে রাখিয়া আসি।" "মা ভিজা কাপড় দেখ্‌লে মার্‌বেন" বলিয়া মালতী আরও কাঁদিতে লাগিল।

তখন ঊষাবালা মালতীর ভিজা কাপড় খুলিয়া লইয়া আপনার পরিধেয় বস্ত্রের খানিকটা ছিঁড়িয়া তাহাকে পরাইয়া দিল। এবং কাপড় কাচিয়া রৌদ্রে ছড়াইয়া দিয়া বলিল—"তুমি কাপড় দেখ, আমি একবার তোমার মার কাছে থেকে আসি।"

ঊষাবালা দৌড়াইয়া মালতীর মার নিকটে গিয়া বলিল—"দেখুন, আমাকে একখানা শুক্‌নো কাপড় দেবেন ?"

মালতীর মা বলিল—"কেন লক্ষ্মি, হয়েছে কি ? শুক্‌নো কাপড় দিয়া কি কর্‌বে ?"

"আগে বলুন কিছু বল্‌বেন না। তা হলে বলি।"

ঊষাবালার সুন্দর হাসি ভরা মুখ ও মধুর কথা শুনিয়া মালতীর মার মন গলিয়া গেল। তিনি ঊষাবালাকে কোলে লইয়া চুমো খাইলেন; এবং হাসি মুখে বলিলেন—"না লক্ষ্মি, আমি কিছু বল্‌বো না। তোমার কি বল্‌বার আছে বল।"

ঊষাবালা মালতীর মার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল তাঁহার মুখ বেশ প্রসন্ন, সহজে রাগ হইবার সম্ভাবনা নাই। তখন সে হাসিতে হাসিতে সকল কথাই খুলিয়া বলিল;—বলিল না কেবল নিজের দুই একটী কথা।

মালতীর মা কিন্তু সবই বুঝিতে পারিলেন। ঊষাবালার হাসিভরা মুখখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন এবং চক্ষের জলে ঊষার সুন্দর মুখখানি ভিজাইয়া দিলেন।

পরে ঊষাবালা একখানি পরিষ্কার শুষ্ক বস্ত্র লইয়া ছুটিয়া গিয়া চাকীদিগের পুকুরের ধারে উপস্থিত হইল। মালতীর মাও তাহার পিছনে পিছনে গেলেন। যাইয়া দেখিলেন মালতী হাসি মুখে রৌদ্রে কাপড় শুকাইতেছে।

মাতা কন্যাকে বুকে টানিয়া লইলেন এবং ঊষাকে কোলে বসাইলেন। তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন—"মা ঊষা তোর আর জন্মের বোন্ তাই আজ তুই বাঁচিয়া উঠিয়াছিস্।"

পরে উভয় ক্রোড়ে উভয়কে লইয়া মালতীর মা ঊষাবালার মার নিকট গেলেন এবং বলিলেন— "ওগো ঊষার মা, আজ তোমার আর একটী মেয়ে হল।" অনন্তর মালতীকে ঊষাবালার মার কোলে দিয়া সকল কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলেন। অশ্রুস্নাত ঊষা ও মালতীকে যেন দুইটী দেববালার মত দেখাইতে লাগিল।

সেই দিন হইতে মালতী না হইলে ঊষাবালার খেলা ভাল লাগিত না।

বাবা আস্‌চেন বাড়ী।

সন্ধ্যাবেলা সাজ পোষাকের ধূম লেগেছে ভারি,
তাড়া তাড়ি কাজ সেরেনি বাবা আস্‌চেন বাড়ী।
মা ভাজ্‌চেন গরম লুচি রান্না ঘরে গিয়া,
আমি রাখি মিছ্‌রিপানা গেলাসে ছাঁকিয়া।
সুধীর তোমার বই গোছাতে আর কি বাকি আছে ?
বাবা যেমন আস্‌বেন বাড়ী লাফ্‌দে যাব কাছে ॥
নেমা দিদি দেখ্‌না ভাই পটল কোথা গেল।
গা ধুইয়ে চুল বেঁধে দাও সন্ধ্যা হয়ে এল ॥
সবাই আছে আপন কাজে পটল বাড়ী নাই।
সন্ধ্যাবেলা কোথা গেল দেখ্‌তো সুধীর ভাই ॥
খুঁজে খুঁজে হদ্দ সারা নাইকো কোন বাড়ী।
বাবা এসে রাগ কর্‌বেন খোঁজ তাড়া তাড়ি ॥
পাড়ার মাঝে দেখা হ'ল পটল কোথা নাই।
মা বল্‌লেন দেখ্‌বো আমি খুঁজে কাজ নাই ॥

কাজ কর্ম্ম সারা হ'ল সন্ধ্যা হয়ে এল,
নেমা পেমা সুধীর গিয়া দুয়ারে দাঁড়াল।
খট্ খট্ খট্ শব্দ হ'ল ঐ যে বাবা এল,
কোথা হ'তে পটল গিয়া লাফ্‌দে কোলে প'ল।
আড়ালে লুকায়ে ছিল কেউ দেখেনি তায়।
বলেছিল কে আগেভে বাবার কাছে যায় ॥
পটলের রঙ্গ দেখে উঠলো হাসির রোল,
মহোৎসব বাড়ীতে যেন ভারি গণ্ড গোল।
বাবার মুখে ফুট্‌লো হাসি মায়ের মুখে হাসি,
হাসির ঘটায় বাড়ীর কোণে হাসে প্রতিবাসী।

প্রহ্লাদ চরিত।

(ধ্রুব ও প্রহ্লাদ নামক গ্রন্থ হইতে সংকলিত।)

পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দক্ষ প্রজাপতির একাদশ কন্যা ছিল। তন্মধ্যে দিতি ও অদিতিই সুবিখ্যাতা ছিল। দিতির গর্ভে দানবদিগের জন্ম হয়, এবং অদিতির গর্ভে দেবতাদিগের উৎপত্তি হয়। এই উভয়বিধ সন্তানদিগের মধ্যে প্রকৃতি, ভাব, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি বিষয়ে এত পার্থক্য হইতে লাগিল যে, পরিশেষে পরস্পর সুরাসুর এই বিপরীত নামে আখ্যাত হইলেন। দেবগণের স্বভাব—ধর্ম্মনিষ্ঠ, দয়ালু, ক্ষমাশীল ও পরোপকারী ছিল। দানবদিগের স্বভাব—ধর্ম্ম বিদ্বেষী, ক্রোধপরায়ণ, পরের অনিষ্টকারী ও গর্ব্বিত ছিল। এই কারণে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। অসুরেরা সর্ব্বদাই দেবতাদিগের প্রতি অসৎ ব্যবহার করিত। তাঁহাদের ধর্ম্ম লোপ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই চেষ্টা পাইত। দিতি প্রথমে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে দুই পুত্র প্রসব করিলেন। কালক্রমে দুই সহোদর অতিশয় বলশালী হইয়া উঠিল এবং দেবতাদিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। কাহারও চিরদিন কখন সমান যায় না, দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। যাঁহার হস্তে জীবের প্রাণ, তাঁহারি হস্তে আবার মৃত্যু। কালক্রমে হিরণ্যাক্ষ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া পৃথিবীর নিকট বিদায় লইল।

অত্যন্ত গ্রীষ্মের পর বৃষ্টি পতনে লোকের যেরূপ আনন্দ হয়, হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুতে দেবতা-

দিগের সেই রূপ আনন্দের সঞ্চার হইল। তাঁহাদের জয়ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল ব্যাপ্ত হইল। তাঁহাদের ম্লান মুখে প্রফুল্লতার উদয় হইল। হিরণ্যকশিপু ভ্রাতার মৃত্যুতে বিষাদিত হইয়া স্বামী-বিয়োগ-বিধুরা ভ্রাতৃবধু ও পুত্র শোকার্ত্তা জননাকে সান্ত্বনা করিয়া অক্ষত শরীরে দেবতাদিগের নিপাতের আয়োজন করিতে লাগিল। হিরণ্যকশিপু আপনাকে অজেয় ও অমর করিতে বাসনা করিয়া মন্দর পর্ব্বতের কন্দর মধ্যে শতবর্ষ কাল কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। কিছুদিন পরে তপ সিদ্ধ হইলে ব্রহ্মার নিকট এই বর প্রার্থনা করিল—"ভগবন্‌! আমি একেবারে অমর হইতে পারি আমার ঈদৃশ বরদান করুন্‌।" তিনি বলিলেন, "আমি ওরূপ বর প্রদান করিতে পারি না। অন্য বর প্রার্থনা কর।" তখন হিরণ্যকশিপু কহিল, "তবে এই করুন্ অস্ত্রে কি অনলে,জলে কিম্বা স্থলে, মৃত্তিকায় অথবা বায়ুতে, নরহস্তে কিম্বা দেবহস্তে, দিবসে কিম্বা রজনীতে যেন আমার মৃত্যু না হয়।" তিনিও তথাস্তু বলিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। কিছুদিন পরে ঈশ্বর প্রসাদে হিরণ্যের হ্লাদ, অনুহ্লাদ, নিহ্লাদ ও প্রহ্লাদ নামে চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পঞ্জাব প্রদেশে মুলতান নগরীতে ভাগ্যশীলা মহিষী কয়াধুর গর্ভে প্রহ্লাদ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

. এই সকল তনয়-রত্ন লাভে দৈত্যপুরি উৎসবপুরী হইয়া উঠিল। রাজ প্রাসাদ নৃত্যগীতাদিতে পূর্ণ হইল। শশী-কলার ন্যায় পুত্রগণ দিন দিন বলবীর্য্য সম্পন্ন ও রূপ-লাবণ্যে সুশোভিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বালকগণ পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইল। বালকগণের মধ্যে প্রহ্লাদই সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ছিলেন। একদিন রাজা কহিলেন—"দেখ মন্ত্রীবর! বালকগণের বিদ্যারম্ভের সময় উপস্থিত। এক্ষণে একজন সদ্‌গুরুর হস্তে ইহাদের শিক্ষার ভার দেওয়া উচিত।" এই বলিয়া কুল পুরোহিত শুক্রাচার্য্যের পুত্র সণ্ডামার্ককে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। ষণ্ডামার্ক শ্রবণ মাত্র ব্যগ্রচিত্তে রাজবাটীতে উপনীত হইলেন। রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ! কি জন্য আমায় আহ্বান করিয়াছেন? আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ত।" রাজা কহিলেন "দেখুন পুত্রদিগের বিদ্যারম্ভের সময় উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে ইহাদের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত সদ্‌গুরুর হস্তে শিক্ষার ভার দেওয়া উচিত। এজন্য আপনাকে আহ্বান করিয়াছি। হ্লাদ, অনুহ্লাদ, নিহ্লাদ ও প্রহ্লাদ আমার এই চারিটী পুত্রকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, যাহাতে ইহাদের সৎ-শিক্ষা হয় এরূপ শিক্ষা দিবেন।" ষণ্ডামার্ক তথাস্তু বলিয়া বালকদিগকে লইয়া গেলেন।

বাল্যাবস্থা হইতে প্রহ্লাদ সুশীল, সুবুদ্ধি ও সত্য-প্রতিজ্ঞ ছিলেন। প্রহ্লাদ সকলের প্রতি সরল ব্যবহার করিতেন বলিয়া প্রহ্লাদকে সকলেই ভাল বাসিত। প্রহ্লাদ আর্য্যগণের চরণ সেবা করিতেন। তাঁহার মধুময় বাক্যগুলি যে একবার শ্রবণ করিত সে তাহা আর ভুলিতে পারিত না। পিতার ন্যায় দীন হীন দুঃখীর প্রতি বাৎসল্য ব্যবহার করিতেন। সমবয়স্ক বালকদিগকে ভ্রাতৃতুল্য স্নেহ করিতেন। গুরুজনকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। বিপদে পড়িলে তাঁহার চিত্ত কখনও বিচলিত হইত না। প্রহ্লাদ যখন ঈশ্বর প্রেমে নিমগ্ন থাকিতেন তখন আনন্দে দুই বাহু উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতেন। কখন আনন্দে বিহ্বল হইয়া অনবরত হরি হরি করিতেন, কখন বা তাঁহার ঈষৎ নিমীলিত নয়ন যুগল হইতে অবিচলিত ভক্তি-নিবন্ধন আনন্দ বারি নিপতিত হইত।

ধন্য প্রহ্লাদ! বালকগণ যেন তোমার নিকট ঈশ্বর ভক্তি শিক্ষা করে। প্রহ্লাদ ও তাঁহার ভ্রাতারা পিতা মাতার আদেশে আদিষ্ট হইয়া ঋষির সমভিব্যাহারে তাঁহার আশ্রমে উপনীত হইলেন। অনন্তর এক শুভ দিন দেখিয়া তাঁহাদের হাতে খড়ি দেওয়া হইল। ঋষি বালকদিগকে লিখিতে কহিলেন, বালকেরা লিখিতে পারিল না, এত সোজা ভাবে বুঝাইয়া দিলেন তবুও তাহারা পারিল না! অবশেষে প্রহ্লাদকে কহিলেন "প্রহ্লাদ তুমি এসত 'ক' লেখ।" তিনি নিকটে আসিয়া বর্ণটী দেখিবামাত্র তাঁহার হৃদয়স্থ দেবভাব জলন্ত রূপে নেত্র সমক্ষে প্রকাশিত হইল। ভক্তিপূর্ণ ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে মনে মনে কহিতে লাগিলেন—"আজ আমার জীবন সার্থক হইল। আমি সেই পবিত্র নামের আদ্যক্ষর আজ সহস্তে লিখিতেছি।" এই বলিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে রহিলেন এবং নয়ন হইতে বিন্দু বিন্দু বাষ্প-বারি বিগলিত হইতে লাগিল। গুরু কহিলেন—"একি প্রহ্লাদ! তুমি কাঁদ কেন? আমি ত তোমায় মারি নাই।" এইরূপ অনেক প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, তিনি মনে করিলেন, বুঝি প্রহ্লাদ অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে, কিন্তু তখন ইহার প্রকৃত মর্ম্ম কিছুই অবগত হইলেন না। প্রহ্লাদ কিছুই উত্তর করেন না; চুপ করিয়া আছেন। পুনরায় ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওরে প্রহ্লাদ! তোর কি হইয়াছে বল না?" তখন প্রহ্লাদ কহিলেন, "গুরো! আমি লিখিবার ভয়ে কাঁদি নাই, আজ আমি আমার প্রভুর নামের আদ্যক্ষর লিখিতেছি, আজ আমার জন্ম সার্থক হইল বলিয়া কাঁদিতেছি।" ঋষির শুনিয়াই চক্ষুস্থির, এ বলে কি! একেত রাজা হরি-দ্বেষী, দেব-দ্বেষী, তাহাতে আবার এরূপ কথা শুনিলে আমার অন্ন মারা যাইবে। প্রকাশ্যে কহিলেন—"ভাল! এখন 'ক' লেখ।" প্রহ্লাদ স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলে অল্পক্ষণের মধ্যে চতুস্ত্রিংশৎ বর্ণের সমস্তই লিখিলেন। প্রহ্লাদের অত্যন্ত স্মরণ-শক্তি ছিল, একবার এক কথা বলিয়া দিলে আর ভুলিতেন না। এইরূপে প্রহ্লাদ অল্প দিনের মধ্যে বেশ সুশিক্ষিত বালক হইয়া উঠিলেন।

এক দিন রাজা মন্ত্রীকে কহিলেন, "দেখ বালকগণের কেমন পাঠাভ্যাস হইতেছে একবার পরীক্ষা করা উচিত। অতএব বালকদিগকে আনিতে সংবাদ প্রেরণ কর।" মন্ত্রী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তথায় লোক পাঠাইলেন। যণ্ডামার্ক পর দিবস প্রাতে বালকদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজসমীপে উপনীত হইলেন। রাজা যণ্ডামার্ককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছাত্রগণের অধ্যয়ন ভাল হইতেছে ত?" ঋষি একে অধ্যাপক ব্রাহ্মণ তাহাতে আবার রাজ ভয় প্রবল; মনে মনে কহিতে লাগিলেন 'তোমার বানর ছেলেরা নির্ব্বোধের একশেষ। কেবল একটী ছেলে ভাল তাও আবার হরি ভক্ত। তোমার ত চক্ষের শূল। অমার সর্ব্বনাশ আর কি!' প্রকাশ্যে কহিলেন—"আজ্ঞে! আপনার পুত্রগুলি বড় সুবুদ্ধি, এমন মেধা যেন ক্ষুরের ধার।" রাজা এক এক করিয়া সব পুত্রগুলিকে প্রশ্ন করিলেন, প্রশ্ন শুনিয়া হ্লাদ, নিহ্লাদ, অনুহ্লাদ মাথা হেঁট করিয়া রহিল। কেহই প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সক্ষম হইল না। রাজার রাগের পরিসীমা রহিল না। ঋষির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "এই কি আপনার অধ্যাপনা।" তার পর প্রহ্লাদকে আহ্বান করিলেন। প্রহ্লাদ নাকি তাঁর শান্ত, সুবুদ্ধি ছেলে, রাজা যাহা জিজ্ঞাসা করেন তাহারই উত্তর প্রদান করে। রাজা কহিলেন—"বৎস, তুমি তত্ত্ব-শাস্ত্র কিরূপ শিক্ষা করিয়াছ।" প্রহ্লাদ বলিলেন "হে রাজন! মনুষ্যগণ সর্ব্বক্ষণ এই সংসার

মদে মত্ত হইয়া রহিয়াছে। ঈশ্বর যে কি বস্তু তাহা আজও বুঝিতে পারিতেছে না। অতএব এই অন্ধ-কূপ হইতে বহির্গত হইয়া বনে গমন করতঃ হরির চরণাশ্রয় করাই বিধেয় মনে করি।” এই কথা শুনিবামাত্র হিরণ্যকশিপু অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন—“কি, আমি হরি-দ্বেষী, তুই পুত্র হ'য়ে ঐ নাম আমার সমক্ষে উচ্চারণ করিতেছিস্, এত বড় স্পর্দ্ধা! রে প্রহ্লাদ! আমিই সর্ব্বস্ব, ভূমণ্ডলে আর প্রভু কে আছে। রে দুর্ব্বুদ্ধে! আমি দেখিতেছি আমার শত্রু পক্ষেই তোর সমধিক পক্ষপাত ও সমাদর। এখনও ক্ষান্ত হও, এখনও তোরে অভয় দান করিতেছি। মূঢ়মতি হইয়া কি জন্য নষ্ট হইতেছিস্।” রাজা ঋষির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, “এবারে বালকদিগকে খুব যত্ন পূর্ব্বক অধ্যয়ন করাইবেন। আর যেন ও নাম আমার কর্ণগোচর না হয়।” রাজার এই কথা শুনিয়া শিষ্য সমভিব্যাহারে ঋষি পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি প্রহ্লাদকে তিরস্কার সহকারে কহিলেন, “দেখ্ প্রহ্লাদ! রাজার সমক্ষে আর হরি নাম উচ্চারণ করিস্ নি, আমরা দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিছু প্রত্যাশা করি, কেন তাহা হইতে আর বঞ্চিত করিস্।” প্রহ্লাদ অবনত মস্তকে সকল শ্রবণ করিলেন, কোন কথারই উত্তর দিলেন না। এইরূপে কিছু দিন গত হইলে রাজা পুনরায় পুত্রদিগকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। ঋষি পুনরায় বালকদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। ঋষি হস্ত তুলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজাও ঋষিকে অভ্যর্থনা করিয়া পরে যথা সময়ে পুত্রদিগের পরীক্ষা লইলেন। প্রহ্লাদ ভিন্ন অন্য পুত্রদিগের বিদ্যা তথৈবচ। হিরণ্যকশিপু অবশেষে প্রহ্লাদকে অতি আদর সহকারে নিজ ক্রোড়ে বসাইলেন। এবং একটী গুরুতর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রহ্লাদ, বলত জীবনের কর্ত্তব্য কি?” প্রহ্লাদ বলিলেন, “প্রভুর অর্চ্চনা, বন্দনা ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করাই শ্রেয়।” ইহা শুনিয়াই রাজা ক্রোধভরে প্রহ্লাদকে স্বীয় অঙ্ক হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “পাপিষ্ঠ! আমি থাকিতে কি জগতে আর কাহারও অর্চ্চণা বন্দনা পাইবার অধিকার আছে। রে কুলাঙ্গার! তুই আজ অবধি আর আমার পুত্র নস্!” ঋষিও ব্যস্ততা সহকারে নিজ দোষ ক্ষালনার্থ ক্রোধপূর্ণ ভাব প্রকাশ করিলেন। কি জানি রাজা পাছে কি বলেন, এই ভয়ে প্রহ্লাদের বিপক্ষতা আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কহিলেন “হে রাজন! এ বালক দৈত্যবংশের কণ্টক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।” রাজা কহিলেন “এ হতভাগা কোথা হইতে এ সব শিক্ষা করিল।” ঋষি কহিলেন, “হে রাজেন্দ্র! এই বালক আমা হইতে এ সব শিক্ষা করে নাই, এবং অপর হইতেও এরূপ হয় নাই। আপনার পুত্র নিজ হইতেই এরূপ শিক্ষা পাইয়াছে।” রাজা এ কথা শুনিয়া আরও ক্লিষ্টমনা হইলেন এবং প্রহ্লাদের কোমলাঙ্গে পদাঘাত করিয়া ভূমিসাৎ করিলেন। এদিকে মহিষী কয়াধু পুত্রকে রোরুদ্যমান ও ধূলা ধুসরিত দেখিয়া আকুলিত চিত্তে গৃহ মধ্যে লইয়া গিয়া নিজ অঞ্চল দ্বারা প্রহ্লাদের চক্ষের জল মোচন করিয়া দিলেন, এবং নানা প্রকারে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। রাজা পুনর্ব্বার ঋষিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “দেখ এবার যেন ইহার বুদ্ধির বিপর্য্যয় না ঘটে।” রাজার এই কথা শুনিয়া তিনি প্রহ্লাদকে আশ্রমে লইয়া গেলেন। কিছুদিন পরে রাজা পুত্রদিগের কিরূপ বিদ্যাশিক্ষা হইল পুনরায় পরীক্ষা করিবার জন্য তাহা-

দের আনিতে লোক পাঠাইলেন। পরদিন প্রত্যূষে ঋষি বালকদিগের সঙ্গে লইয়া রাজ সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। রাজা পুত্রকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তাহার সেইরূপ বিশ্বাসই ঠিক আছে। তাঁহার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া গেল। নিষ্ঠুর স্বভাব সেই দানব রাজ পদাহত সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সরোষে প্রহ্লাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—“ওরে দুর্ব্বিনীত ও মন্দাত্মন! তুই দৈত্যকুল বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিস্। তুই নিতান্ত অধম, আমার শাসন উলঙ্ঘন করিয়া এখন মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছিস্, থাক্ তোকে এখনই যমালয় প্রেরণ করিব, জানিস্ না আমি ক্রোধ করিলে ত্রিলোক পর্য্যন্ত কম্পিত হয়, তুই আমার আজ্ঞা নির্ভিকের ন্যায় লঙ্ঘন করিয়াছিস্।” পরে তিনি মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিলেন যে, ওরূপ পুত্রের মুখ দর্শন করা অপেক্ষা ওমুখ যাহাতে না দেখিতে হয় তাহাই করা উচিত। অনন্তর নির্দ্দয় হিরণ্যকশিপু দ্বারবানের প্রতি আজ্ঞা দিলেন, “তোমরা এখনই ইহার শিরশ্ছেদন করিয়া আমার নিকটে আনয়ন কর।” দ্বারবানেরা কি করে ক্রীতদাস কোন ক্ষমতা নাই, রাজার আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে। দ্বারবানেরা প্রহ্লাদকে বধ্যস্থানে লইয়া গেল। সকলেই স্তম্ভিত, নিরপরাধী বালকের প্রাণ কিরূপে বিনষ্ট করিবে। উহার মধ্যে একজন বলিল, “এস প্রহ্লাদ এখন তোমার প্রাণ বিনষ্ট করি।” প্রহ্লাদ বলিলেন, ‘ক্ষণকাল বিলম্ব কর’ এই বলিয়া দরদরিত ধারে অশ্রুমোচন পূর্ব্বক তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে ডাকিতে লাগিলেন। প্রার্থনা শেষ হইলে প্রহ্লাদ কহিলেন, ‘এক্ষণে তোমাদের যাহা করিতে হয় কর।’ তাহাদের মধ্যে একজন প্রহ্লাদের গলদেশে অস্ত্র প্রহার করিল, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইল না। রাজ সমীপে প্রহ্লাদ আনীত হইলে রাজা সবিশেষ শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীকে বলিলেন, ‘ইহার সদুপায় কি বল।’ মন্ত্রী কহিলেন, “ইহাকে মত্ত মাতঙ্গের পদতলে নিক্ষেপ করুন তাহা হইলেই নিশ্চয় মৃত্যু হইবে।” ভৃত্যগণ পুনরায় প্রহ্লাদকে লইয়া গিয়া ক্ষিপ্ত হস্তীর পায়ের নিকট ফেলিয়া রাখিল। হস্তী প্রহ্লাদকে দেখিয়া অতি স্নেহভরে শুঁড় দ্বারা পৃষ্ঠে তুলিয়া লইল। আবার রাজার নিকট ভৃতগণ গিয়া কহিল, “মহরাজ! এ ছেলের মৃত্যু নাই।” মন্ত্রী কহিলেন, “আমি যাহা বলি কর, তাহা হইলে আর অন্য কথা কহিতে হইবে না। এক উত্তপ্ত তৈল কটাহে প্রহ্লাদকে ফেলিয়া দেও।” প্রহ্লাদের তাহাতেও মৃত্যু হইল না, দয়াময়ী মা সেই উত্তপ্ত তৈল কটাহের মধ্যে তাঁহার ভক্তকে ক্রোড়ে করিয়া রহিলেন। রাজা এই সংবাদ পাইয়া প্রধান মন্ত্রীকে কহিলেন, প্রহ্লাদের মৃত্যু হয় নাই। মন্ত্রী কহিল, “এক সদুপায় বলি ইহাই করা যাউক, এক প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের মধ্যে ফেলিয়া দেও, তাহা হইলে নিশ্চয় মৃত্যু হইবে।” প্রহ্লাদ দীননাথের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন, সেই অগ্নি ধ্বংশ হইলে প্রহ্লাদ যেমন শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন সেই প্রশান্ত মূর্ত্তিতে বাহির হইলেন, শরীরের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। রাজা দেখিয়া অবাক হইলেন। মন্ত্রী কহিলেন, “প্রহ্লাদকে বিষ মিশ্রিত অন্ন আহার করিতে দেওয়া যাউক, তাহা হইলে আর ইতস্ততঃ করিতে হইবে না।” অন্তঃপুরে রাজ মহিষীর নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করা হইল। রাণী শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অনেক যত্ন সহকারে রাণীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ করা হইল। এদিকে প্রহ্লাদের

খাদ্য দ্রব্য অন্য গৃহে আনীত হইলে প্রহ্লাদ গৃহাভ্যন্তরে গমন করিলেন, এবং দীনবন্ধু হরিকে সজলনেত্রে ডাকিতে লাগিলেন, "প্রভো! তোমাকে না দিয়া ত কোন দিন আমি আহার করি নাই, আজ কেমন করিয়া তোমায় এই বিষ মিশ্রিত অন্ন দিব।" এই স্থানে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, সেই বিষাক্ত অন্ন অমৃত হইল। প্রহ্লাদ সেই অন্ন আহার করিয়া সুখে নিদ্রা গেলেন। পরদিন প্রভাতে সকলেই মনে করিতেছেন, আজ প্রহ্লাদ জীবিত নাই। প্রাতঃকালে প্রহ্লাদ গৃহ হইতে বাহির হইলে সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। মন্ত্রী কহিলেন, "ইহাকে এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতে নিক্ষেপ করা যাউক।" ভৃত্যগণ আদেশ প্রাপ্তি মাত্র গিরিশিখর হইতে প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ করিল, তাহাতে কিছুই হইল না।" তখন প্রহ্লাদের অচল ভক্তি দেখিয়া তাঁহার প্রিয় দেবতা কহিলেন "প্রহ্লাদ! আমার প্রতি তোমার অটল ভক্তি দেখিয়া আমি তোমার প্রতি বড় প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" প্রহ্লাদ কহিলেন, "হে দেব! আমার পিতা যে এতাবৎকাল আমার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তুমি অকপটে ক্ষমা কর।" তিনি তথাস্তু বলিয়া কহিলেন "তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর।" প্রহ্লাদ বলিলেন "আমি আর কিছুই চাই না, কেবল তোমার প্রতি যেন অচল ভক্তি থাকে, এই প্রার্থনা।" হরি তথাস্তু বলিলেন। প্রহ্লাদ আনন্দে 'হরিবোল' 'হরিবোল' শব্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার সমপাঠিগণ উচ্চৈঃস্বরে হরি হরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। রাজা এই ব্যাপার দর্শন করিয়া ক্রোধ ভরে প্রহ্লাদকে ডাকিয়া কহিলেন, "কৈ তোর হরি কোথায়?" প্রহ্লাদ কহিলেন "এই যে, আমার হরি।" রাজা বলিলেন "এই স্ফটিক স্তম্ভেও কি!" প্রহ্লাদ কহিলেন "হাঁ, নিশ্চয়!" হিরণ্যকশিপু পদাঘাতে স্তম্ভ চূর্ণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ প্রহ্লাদের দেবতা সেই স্তম্ভ হইতে বহির্গত হইয়া নৃসিংহ বেশে হিরণ্যকে বিনাশ করিলেন। সরল পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা প্রহ্লাদের হরি ভক্তি দেখিয়া ঈশ্বরকে ভালবাসিতে শিক্ষা কর।

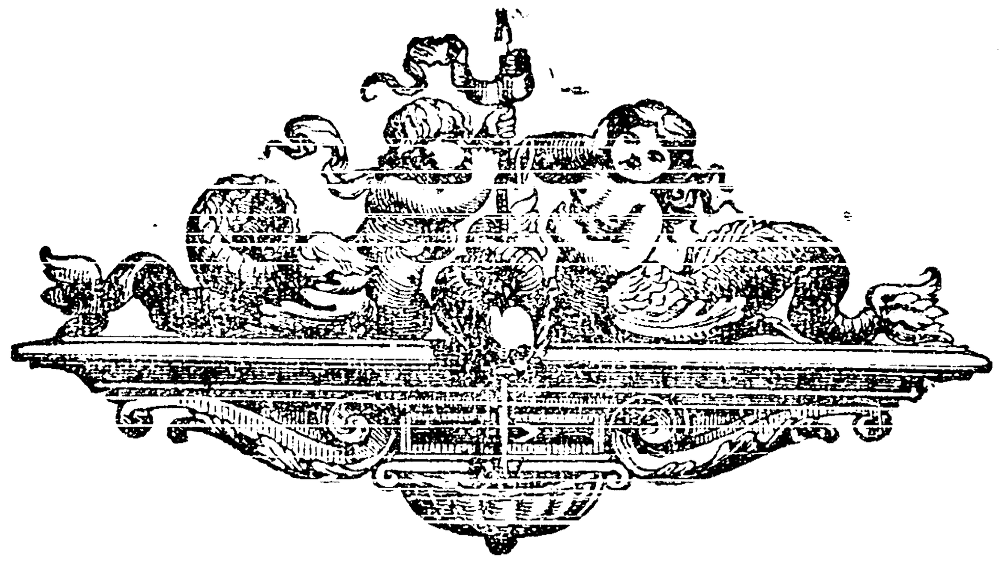

ঠাকুরদাদার গল্প।

এক দিন কাকার কাছে আমি বলিতেছিলাম,—"ঘোষালদের বিধু পড়া শুনা কিছুই করে না; আজ সে অঙ্ক কসিবার সময় কেবল ছবি আঁকিয়াছিল এবং পড়ার সময় আগা গোড়া অন্যমনস্ক হইয়া গল্প করিয়াছিল।" আমি তাহার দুইটা গল্প শিখিয়াছি তাহাও বলিলাম।

এই সময় ঠাকুর দাদা মহাশয় আসিলেন; আমি কি বলিতেছিলাম তাহাও শুনিলেন। শুনিয়া আমাকে বলিলেন—"আমি ঐ রকম করিয়া একদিন বড় ধরা পড়িয়াছিলাম। আমি যখন তোমার মত ছেলে মানুষ ছিলাম, তখন

অনেক সময়েই অন্যমনস্ক হইতাম। একদিন যখন স্কুলে পড়া বলিয়া দেওয়া হইতেছিল, তখন আমি জানালার বাহিরে একটা কুকুরের দিকে চাহিয়াছিলাম। কুকুরটার ঘায়ে মাছি বসিতেছিল, কুকুরটা ক্রমাগতই লেজ নাড়িয়া গা ঝাড়িয়া মাছি তাড়াইতেছিল, পড়ার বদলে আমি তাহাই দেখিতেছিলাম। পড়াটা বুঝিলাম কি না, জানিবার জন্য শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলে মধ্যে মধ্যে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিতেছিলাম।

অনেক ক্ষণের পর শিক্ষক মহাশয় আমাকে অন্যমনস্ক জানিতে পারিয়া সহসা বিরক্তভাবে ডাকিয়া বলিলেন—'কি বুঝিলে বল দেখি?' আমি থতমত খাইয়া বলিয়া ফেলিলাম—'মাছি'। ক্লাসের ছেলেরা সবাই হাসিতে লাগিল। আমি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম।

শিক্ষক মহাশয় তখন এইরূপ অমনোযোগিতার জন্য আমাকে তিরস্কার করিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন। এরূপ করা বড়ই দোষ, অতএব কেহই যেন আর এরূপ অমনোযোগী না হয়, এজন্য সকলকেই অনুরোধ করিলেন। কেহ যদি দেখিতে পার যে, কোনও বালক অন্যমনস্ক আছে, বই দেখিতেছে না, তবে তাহাও তাঁহাকে বলিয়া দিতে বলিলেন।

শেষের কথাটায় আমার বড় আনন্দ হইল, আমি ভাবিলাম বেশ হইয়াছে। আমি 'মাছি' বলিয়া ফেলিয়াছিলাম বলিয়া অনেকে হাসিয়াছিল, এখন তাহাদিগকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, খুঁজিতে লাগিলাম—কতক্ষণে কে একটু অন্যমনস্ক হয়, কাহাকে কি রকমে ধরাইয়া দি।

একজন একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিল, আমি তখনই শিক্ষক মহাশয়ের নিকটে গিয়া বলিয়া দিলাম। শিক্ষক মহাশয় একখানি শ্লেট লইয়া তাহার নাম লিখিয়া পাশে আমার নামটিও লিখিয়া রাখিলেন এবং আমাকে মনোযোগ পূর্ব্বক পড়া শুনিতে আদেশ করিয়া আমাদের পড়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

শ্লেটে নাম লেখা দেখিয়া আমি বড়ই খুসি হইলাম। পড়া শেষ হইলেই ঐ বালককে তিরস্কার করিবেন, ইহা ভাবিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইতে লাগিল। এইরূপে একে একে আরও ছয় জনের নাম লেখাইলাম। তাহাদের মধ্যে কেহ দোষী, কেহ অল্প দোষী, কেহ বা নির্দ্দোষীও ছিল।

পড়া শেষ হইল। শিক্ষক মহাশয় পুস্তকখানি রাখিতে না রাখিতে আমি তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে গিয়া বলিলাম—"মহাশয়, যাহারা পড়া শুনে নাই, এখন তাহাদের একটা ব্যবস্থা করুন।"

শিক্ষক মহাশয় কহিলেন—"তাহা হইলে তোমার ব্যবস্থাই ত আগে করিতে হয়, দেখিতেছি।"

আমি এরূপ উল্টা কথা বুঝিতে পারিলাম না। শ্লেটে অমনোযোগী বালকদিগের নাম লিখিয়া রাখিয়া এখন আবার এ কিরূপ কাজ, তাহাই পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলাম।

শিক্ষক মহাশয় তখন আমাকে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে আদেশ দিয়া সকলকে বলিতে লাগিলেন—"তোমরা সকলে একটি মনোযোগী বালক দেখ! ইনি অমনোযোগী বালক ধরিতে এতই মনোযোগী, যে নিজে পড়ায় মনোযোগ দিতে পারেন নাই। শ্লেটে যে সাত জনের নাম লেখা আছে, ইহারা এক একবার মাত্র হয়ত অমনোযোগী হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ইনি একাই নিশ্চয় সাতবার অমনোযোগী হইয়াছেন।"

সকলে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তোমাদের ঠাকুরদাদা একবারেই মাটি—তাঁহার

আর কথাটি কহিবার যো রহিল না। প্রতিবারই অভিযুক্ত অমনোযোগী বালকদিগের নামের পাশে তোমাদের ঠাকুর দাদার নাম কেন যে লেখা হইতেছিল এতক্ষণে ঠাকুরদাদা তাহা বুঝিতে পারিলেন।

তবেই দেখ, যদি আমরা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে একান্ত মনোযোগী হই ও আপনার দোষ আপনি দেখিতে শিক্ষা করি, তাহা হইলে আর আমাদের অপরের অমনোযোগীতা বা দোষ দেখিবার অবকাশ হয় না।"

ঠাকুরদাদার কথা শেষ হইল। ঠাকুরদাদা ছেলেবেলার পুরাতন কথাটা আজ কি জন্য তুলিয়াছিলেন, তাহাও আমার বুঝিবার বাকী রহিল না।

হেঁয়ালি গল্প।

আমি তোমাদের সকলের কাছেই বেশ পরিচিত। তবে নামটা আগেই বলিতে চাই না, যখন আমার সহিত এত পরিচয়, তখন দূর থেকে নিজ আকৃতি ও প্রকৃতির যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া দেখি আমায় চিনিতে পার কি না।

আমি বড়ই ক্ষুদ্র ও অত্যন্ত দুর্ব্বল। আমার শরীরের বল এতই অল্প যে, সামান্য ছোট ছেলেও ইচ্ছা করিলে আমায় দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিতে পারে। আমি লম্বায় তিন অঙ্গুলি পরিমাণ হইব। আমি অত্যন্ত সরু, একটি শ্লেট পেন্‌সিলকেও আমার তুলনায় স্থূলকায় বলিয়া বোধ হয়। আমার শরীরে যে কিছুমাত্র বল আছে আমার আকৃতি দেখিয়া সেরূপ বোধ হয় না। তথাপি আমার এই ক্ষুদ্র ও রুগ্ন শরীরে এরূপ বল নিহিত আছে যাহার দ্বারায় বৃহৎ বৃহৎ গ্রাম ও নগরাদি এককালে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারি।

দুষ্ট ছেলেরা আমার নিকট বড় সাহস করিয়া আসিতে চায় না। জননীগণ স্ব স্ব সন্তানদিগকে আমার সহিত খেলা করিতে বড়ই নিষেধ করেন; ও সহজে না শুনিলে কিঞ্চিৎ চড় চাপড়ও দিয়া থাকেন। একবার মা ঘুমাইতেছেন দেখিয়া এক দুষ্ট ছেলে আমার সহিত চুপি চুপি ভাব করিতে আসিয়াছিলেন। আমি আমার ঘরের ভিতর শুইয়াছিলাম, তিনি আসিয়াই আমাকে ভারি নাড়া চাড়া করিতে লাগিলেন; আমার ঘরের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিলেন ও নানা রকমে আমার বড় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। আমিও সময় বুঝিয়া তাঁহার হাতে এমন কামড়াইয়া দিলাম যে, তিনি সহজে আর আমার নিকট আসিলেন না, ও তাঁহার হাতে কত দিন ব্যথা ছিল। তাই বলিয়া যে তোমাদের সঙ্গে আমার কোন বিবাদ আছে তাহা মনে করিও না। কিন্তু যদি শান্ত শিষ্ট হইয়া আমার সহিত ভদ্র ব্যবহার কর তাহা হইলে আমার ন্যায় এমন উপকারী বন্ধু আর জগতে পাইবে না।

আমরা এক বাড়ীতে কত শত ভাই এক সঙ্গে মিলে মিশে থাকি। আমরা যখন প্রথম ঘরের ভিতর প্রবেশ করি তখন বড় স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারি না, আমাদের সকলকে এমন ঘেঁসাঘেঁসি

করিয়া থাকিতে হয় যে, নিঃশ্বাস ফেলিবারও জায়গা থাকে না। আবার মানুষের সঙ্গে বাস করিতে করিতে আমাদের বেশ জায়গা হয়; কারণ আমাদের সকলকে একে একে বাহির করিয়া লওয়া হয় ও অবশেষে গৃহটি শূন্য পড়িয়া থাকে। আমাদের বাড়ীটা শেষে উননের ভিতর কিম্বা আবর্জ্জনার সঙ্গে বাহিরে তাড়ান হয়।

আমাদের গৃহের এরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের প্রাণে বড়ই কষ্ট হয়। এই গৃহটি আমাদের এক প্রধান সহায়, এইটি না থাকিলে আমরা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ি। শম্বুক যেমন তাহার গৃহ ব্যতীত একদণ্ডও বাঁচিতে পারে না, আমরাও সেইরূপ এই গৃহটি না থাকিলে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হইয়া পড়ি।

মানুষের যেমন মাথার চুল সকলের এক রকম হয় না, কাহারও খুব কাল, কাহারও একটু লাল, কাহারও শাদা হয়, আমাদেরও সেইরূপ মাথার রং সকলের এক প্রকার হয় না, কাহারও লাল, কাহারও নীল, কাহারও বা কাল থাকে। তবে রংই আমাদের মধ্যে কিছু বেশী দেখা যায়। আর আমাদের বাড়ীর ছাদের রং প্রায়ই হল্‌দে হয়।

রাজ-প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটির পর্য্যন্ত আমরা সকল স্থানে সমান ভাবে বিরাজ করি। আমরা যে কত লক্ষ লক্ষ হইব তাহা সহজে গণণা করা যায় না। মানবের বিশেষ উপকারের জন্যই আমাদের সংসারে সৃষ্টি। আমরা এই বিশেষ কার্য্যের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া থাকি। মানবের উপকার করিতে গিয়া আমাদের নিজ নিজ দেহকে ভস্মীভূত করিতে হয়। মানবই আমাদিগের জন্মদাতা, হর্ত্তা ও সংরক্ষক।

আমাদের পরস্পরের মধ্যে আকৃতির কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না; সুতরাং আমাদের মধ্যে কাহারও চিনিয়া রাখিতে তোমাদের বড় কষ্ট হয়।

আমাদের মাথার এক অসাধারণ ক্ষমতা আছে। সময় বিশেষে আমাদের মাথার ভিতর হইতে বিদ্যুতের ন্যায় আলোক বাহির হইয়া পড়ে, এবং সেই আলোকে আমাদের শরীর দগ্ধ হইয়া যায়। যদিও এই উজ্জ্বল ছটা প্রকাশ করিয়াই আমাদের মৃত্যু হয়, তথাপি অন্য পদার্থের শরীরে এই আশ্চর্য্য আলোক অনায়াসে বিতরণ করিতে পারি।

আমাদের মুখে কোন কথা নাই সর্ব্বদাই নিস্তব্ধ। কিন্তু মৃত্যুকালে আমরা এক প্রকার শব্দ করিয়া থাকি। এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মস্তক হইতে সেই সুন্দর আলোক বাহির হয়। বর্ষার সহিত আমাদের বড় বিবাদ। বর্ষা আসিয়া আমাদিগকে বড়ই অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। খেপা কুকুর যেমন জল দেখিলে ভয় পায় আমাদেরও জল দেখিয়া সেইরূপ ভয় হয়।

আর অধিক পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই, এখন বোধ হয় আমাকে বেশ চিনিয়াছ। সহজ কথায় এই বলিতে পারি যে, আমি না থাকিলে তোমাদের সময়মত অন্ন যুটে না সুতরাং বড়ই কষ্ট পাইতে হয়।

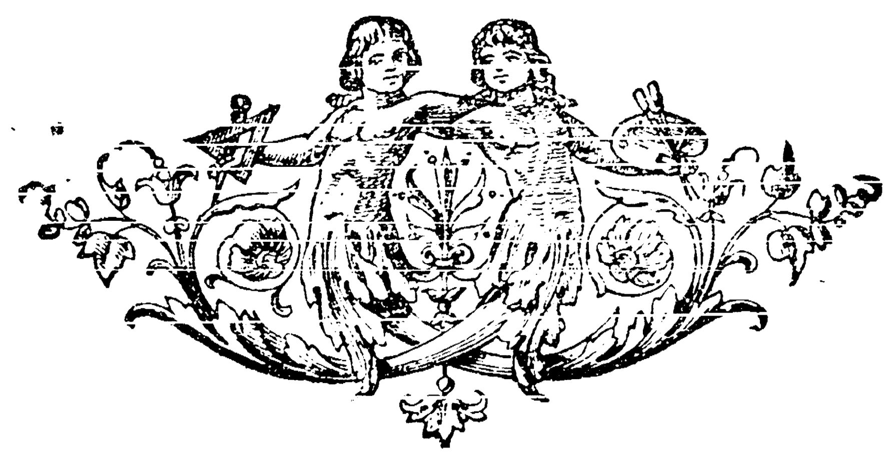

যন্ত্রণা বোধ।

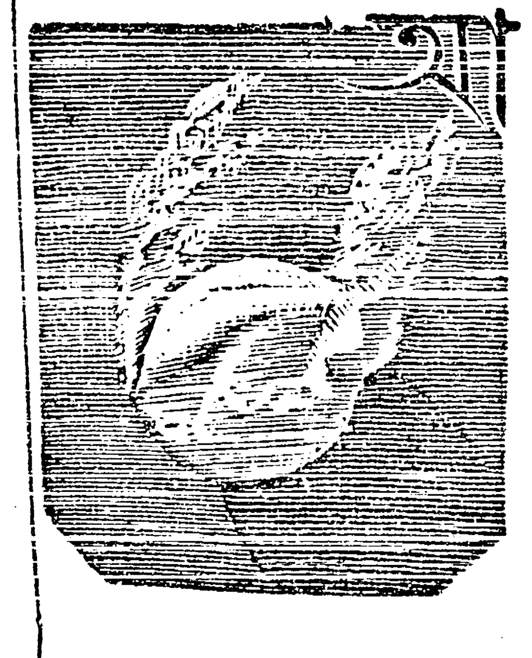

আমরা দেখিয়া থাকি অনেক বালক বালিকা প্রজাপতি, ফড়িঙ, পিপীলিকা বা ছারপোকা দেখিতে পাইলেই তাহাদিগের প্রাণবধ করে বা তাহাদিগকে ধরিয়া অন্য প্রকারে অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করে। তাহারা মনে করে ইহাদের যেন কোন প্রকার যন্ত্রণা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। এই সকল বালক বালিকাদিগের প্রাণী বৃত্তান্ত শাস্ত্রে একটু জ্ঞান থাকা কর্ত্তব্য। আমরা যে যন্ত্রণাদি অনুভব করি তাহা শিরা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কোন স্থানে আঘাত করিলে সেই স্থানের শিরা সকল কম্পিত হয়। এবং সেই কম্পন অন্যান্য শিরা দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হইলেই আমাদিগের সেই আঘাত জ্ঞান ও তদনুসঙ্গিক যন্ত্রণা বোধ হয়। যেমন তারের সংবাদ বিদ্যুৎযোগে তারের কম্পন দ্বারা মুহূর্ত্ত মধ্যে দূরদেশে যায়, সেইরূপ দূর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির খবর যাহাতে শীঘ্র মস্তিষ্কে যাইতে পারে তজ্জন্য পরমেশ্বর শরীরের মধ্যে তার খাটাইয়া রাখিয়াছেন; এবং সেই তারই শিরা। মানব শরীরে এই শিরার সংখ্যা ৫২৯ এর অধিক নহে। কিন্তু লিওনেট সাহেব গণনা করিয়া দেখিয়াছেন একটা ফড়িঙের শরীরে শিরার সংখ্যা মস্তকে ২২৮, দেহে ১৬৪৭, এবং পাক-যন্ত্রের চতুর্দ্দিকে ২১৮৬। ইহাতেই শিরার সংখ্যা সমুদায়ে ৪০৬১ হইল। নিষ্ঠুর বালক বালিকাগণ! এখনও কি মনে করিবে যে ফড়িঙ, ছারপোকা, পিপীলিকা, প্রজাপতি ইহাদিগের যন্ত্রণা বুঝিবার ক্ষমতা নাই?

ধাঁধা।

নূতন।

আমি বড় দয়ালু আমাকে যাহা দেখাইবে আমি তাহাই দিব। কিন্তু যদি আমার পিটি চুলকাইয়া দেও তবে হাজার চেষ্টা করিলেও আমার নিকট হইতে কিছু পাইবে না। বলত আমি কে?

হেঁয়ালি।

গত জুন মাসের হেঁয়ালির উত্তর।*

ছায়া

* এবারে এত অধিক সংখ্যক গ্রাহক হেঁয়ালির উত্তর দিয়াছেন যে, সকলের নাম "সখায়" প্রকাশ করা কঠিন। সুতরাং এবারে আমরা কাহারও নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না; গ্রাহকগণ ক্ষমা করিবেন। স, সঃ—

সখা
সপ্তম ভাগ। ৮ম সংখ্যা।
আগষ্ট, ১৮৮৯।

বিবিধ।

অন্যের জীবন রক্ষার জন্য যাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকে, নিজ জীবনের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়াও যাহারা অন্যের জীবন রক্ষা করে, বিলাতে তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবার জন্য একটী সভা আছে। সেটীর নাম "রয়াল হিউম্যান সোসাইটী।" সোণা, রূপা এবং ব্রোঞ্জ নামক এক প্রকার মিশ্র ধাতু দ্বারা মেডেল তৈয়ার করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে তাহা দ্বারা পুরস্কৃত করা হইয়া থাকে। একখানি যুদ্ধ জাহাজের এলবার্ট বেটীসন্ নামক একটী সতের বৎসর বয়স্ক বালক, তের বৎসর বয়স্কা একটী বালিকার প্রাণ রক্ষা করিয়া এই সভার একটী সোণার মেডেল পুরস্কার পাইয়াছে। একটা স্থানের জল জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছিল, বালিকাটী সেই বরফের উপর দিয়া পার হইয়া যাইতেছে, এমন সময় হঠাৎ এক স্থানের বরফ গলিয়া গিয়া বালিকাটী একেবারে ৬। ৭ হাত জলের নীচে ডুবিয়া গেল। এক জন লোক ইহা দেখিয়া তাহাকে তুলিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল বটে কিন্তু বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিল। তখন সেই সতের বৎসরের বালক বেটীসন সাহস করিয়া সেই বরফের মধ্যে ডুব দিয়া প্রবেশ করিল, ইহাতে তাহার নিজের জীবনও যাইতে পারিত। বেটীসন বালিকাটীকে পাইয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া বরফ-রাশির মধ্য হইতে উঠাইয়া তীরে আনিল। বরফের মধ্য হইতে উঠিবার সময় মাথা দিয়া বরফ-রাশি ভাঙ্গিয়া পথ করিয়া লইতে হইয়াছিল।

* *

সম্প্রতি আলেকজাণ্ডার সাদারল্যাণ্ড নামক আর একজন বালক দশ বছরের একটী বালককে রক্ষা করিয়া এই সভা হইতে একটী রূপার মেডেল পাইয়াছে। বালকটী একটা পোলের উপর বসিয়া মাছ ধরিতেছিল; হঠাৎ জলের মধ্যে পড়িয়া যায়, সেখানকার জলের স্রোত অত্যন্ত ভয়ানক ছিল। বালকটীকে যখন তীরে আনা হইল, তখন সে একেবারে অজ্ঞান। এতদ্ভিন্ন আরও ২৫টী ব্রোঞ্জ মেডেল পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছে। প্রতি মাসেই উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে গুণানুসারে এই সভা হইতে পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে।

* *

কলিকাতার শোভাবাজারের কুমার নীলকৃষ্ণ ও বিনয়কৃষ্ণের যত্নে শোভাবাজার দাতব্য সভা নামে একটী সভা কয়েক বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। এই সভা হইতে অনাথ দরিদ্রদিগকে নিয়মমত সাহায্য করা হইয়া থাকে। এই সভার পঞ্চম বার্ষিক কার্য্য বিবরণে দেখা যায় যে, ৫৯ জন প্রতি মাসে এই সভা হইতে নিয়মিতরূপে সাহায্য পাইতেছে। ইহাদের মধ্যে ২০টী অনাথা বিধবা, ৫ জন অন্ধ, ৭ জন রোগে অচল, এবং ২৭টী স্কুলের ছাত্র। এতদ্ভিন্ন প্রতিদিন দরিদ্রদিগকে ভিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে; এবং দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দৈব ঘটনায়ও যথাসাধ্য সাহায্য করা হইয়া থাকে। কুমার নীলকৃষ্ণ ও বিনয়কৃষ্ণের উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়। ধনীর সন্তান হইয়া এ প্রকার দেশ-হিতকর কার্য্যে তাঁহাদের এ প্রকার যত্ন ও চেষ্টা সকল ধনী সন্তানেরই অনুকরণ যোগ্য।

* *
*

জাপান রাজ্যের বর্ত্তমান মহারাণী অতিশয় দয়ালু। জাপানের রাজধানী টোকীও নগরে স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগের জন্য হাঁসপাতাল আছে। অর্থাভাবে এই সকল হাঁসপাতালের কার্য্য ভালরূপ চলিতেছে না দেখিয়া তিনি ইহার উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন। মহারাণী হাঁসপাতালের উন্নতির জন্য প্রথমে নিজেই অনেক অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। মহারাণী অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, ইহা একটা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু কি প্রকারে এই অর্থ দিতেছেন, তাহাই আমাদের উল্লেখ করা উদ্দেশ্য। তিনি এক বৎসরে প্রায় দুই লক্ষ টাকা সাহায্য করিয়াছেন, এবং এই সমস্তই তাঁহার নিজের অত্যাবশ্যকীয় খরচ হইতে বাঁচাইয়া দিয়াছেন; নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে না চাহিয়া, যাহারা অনাথ নিরাশ্রয়, তাহাদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য সেই অর্থ ব্যয় করা সামান্য প্রশংসার কথা নহে।

* *
*

মান্দ্রাজের একজন ডাক্তার বিলাতের বৃটীশ মিউজিয়মে দেড় হাজার রকম মৎস্য উপহার দিয়াছেন। এই দেড় হাজার রকমের মৎস্যই সমস্ত তিনি আমাদের এই দেশ হইতে লইয়া গিয়াছেন।

* *
*

খড়ের দ্বারা এক প্রকার বারুদ তৈয়ার হইতেছে। ইহাতে প্রচলিত বারুদের মত ধোঁয়া বা আগুন বাহির হয় না, এবং বন্দুকের নল উত্তপ্তও হয় না। ইহাতে শব্দও খুব কম হয়, এতদ্ভিন্ন প্রচলিত বারুদ অপেক্ষা ইহা আরও অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।

* *
*

আমেরিকার ক্যালিফরনিয়া দেশে দেবদারু জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ আছে, সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যে ইহা অপেক্ষা বৃহৎ বৃক্ষ আর নাই। একটী বৃক্ষ সম্প্রতি মাপিয়া দেখা হইয়াছে, সেটী প্রস্থে ১১৬ হাতেরও কিঞ্চিৎ অধিক। ব্যাপার নিতান্ত সামান্য নহে; ১১৬ হাত প্রস্থে একটী বৃক্ষ আমরা ধারণা করিতেই পারি না।

নারিকেল, তাল ও খেজুর।

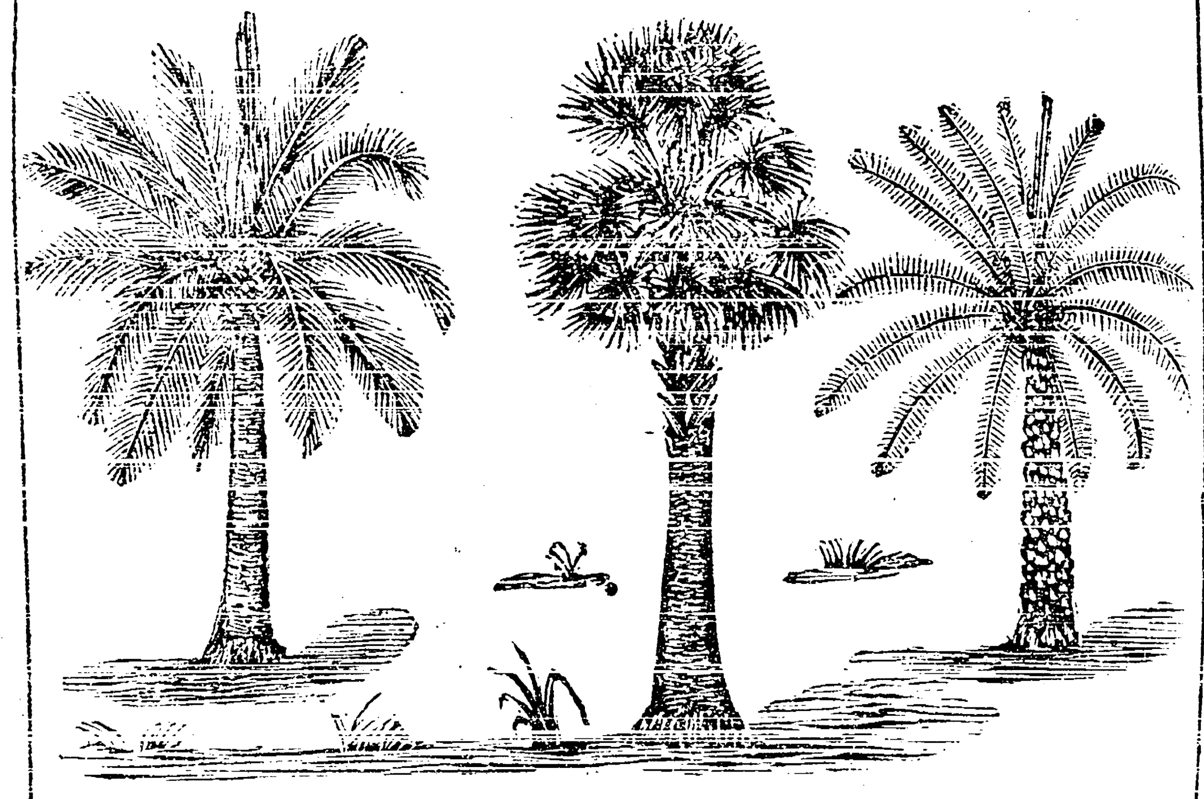

সখার পাঠক পাঠিকা! তোমাদিগের মধ্যে বোধ হয় এমন কেহই নাই যে নারিকেল, সুপারি, তাল, খেজুর কাহাকে বলে জান না। এই সকল ফল কোন না কোন আকারে তোমাদিগের নিকট বিলক্ষণ পরিচিত; আর বুঝাইয়াও দিতে হইবে না কেমন করিয়া,—এইত সে দিন মাত্র জন্মাষ্টমী গিয়াছে। ফলগুলির সঙ্গে ত পরিচয় আছেই, এই সকল ফলের গাছও বোধ হয় সকলে দেখিয়াছ, কারণ বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রেই জন্মিয়া থাকে, তবে কোন স্থানে কম, কোন স্থানে বেশী। উপরে যে তিনটি গাছের চিত্র দেখিতেছ তাহার মধ্যে কোন্‌টি কি জান? তোমরা আপনা হইতেই ঠিক করিয়া লইতে পারিবে জানিয়া আমরা বলিয়া দিলাম না।

নারিকেল,—যে কয়েক প্রকার ফলের উল্লেখ করা হইল তাহার মধ্যে নারিকেল প্রধান। বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই নারিকেলের গাছ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু বাখরগঞ্জ, যশোহর, ঘাটাল, বারাসত এবং ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি স্থানে যত পরিমাণে জন্মে তত অন্য অন্য স্থানে নয়। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব এবং পশ্চিম উপকূলদ্বয়েও যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে। যে দেশ সমুদ্র তট হইতে যত দূর এবং যত উচ্চ সেখানে তত অল্প নারিকেল গাছ জন্মে। বেশী উচ্চ এবং শীত প্রধান দেশে একেবারেই জন্মে না। ইউরোপ প্রভৃতি শীত প্রধান পর্ব্বতময় দেশ সকলে নারিকেল কিম্বা ঐ জাতীয় অন্য কোন গাছ নাই। ভারতবর্ষ ভিন্ন লঙ্কা দ্বীপ, লাক্ষা দ্বীপ, নারিকেল দ্বীপ এবং ভারত মহাসাগরের দ্বীপ পুঞ্জের স্থানে স্থানে এবং ব্রাজিল দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। নারিকেল যেমন সুখাদ্য তেমনি পুষ্টিকর। গ্রীষ্মকালে ডাবের জলের যে কত আদর তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। ডাব যত পুষ্ট হয় জল তত কমিয়া যায় এবং শাঁস বৃদ্ধি ও সুমিষ্ট হয়। এই শাঁস হইতে নানা প্রকার উপাদেয় মিষ্টান্ন ও পিষ্টক প্রস্তুত হয়। এখন বুঝিতে পারিতেছ কেন বলিয়াছিলাম যে এই সকল ফল তোমাদিগের নিকট বিলক্ষণ পরিচিত। খাদ্য ভিন্ন নারিকেল হইতে আরও কত প্রকার উপকারী এবং আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

নারিকেল তৈল,—সকলেই দেখিয়াছ, হয়ত অনেকে ব্যবহার করিয়াও থাক। পরিষ্কার এবং ঠাণ্ডা বলিয়া অনেকে শরিষার তৈলের পরিবর্ত্তে নারিকেলের তৈল মাখিয়া থাকেন। ইহার আলো বেশ উজ্জ্বল অথচ কেরোসিনের মত প্রখর নয়; চক্ষুর কোন অপকার হয় না। ইহা দ্বারা নানা প্রকার ঔষধও প্রস্তুত হয়। অনেক ডাক্তার কড্ মাছের তৈলের (Codliver oil) পরিবর্ত্তে পরিষ্কার নারিকেল তৈল ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। লৌহ এবং ইস্পাত নির্ম্মিত যন্ত্র এবং অস্ত্র শস্ত্র পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত নারিকেল তৈল ব্যব-

হৃত হয়। মষিনা ও শরিষার তৈল যেমন পেষণ দ্বারা নির্গত হয় নারিকেলের তৈলও সেই রূপে প্রস্তুত হয়। যেখানে কল কারখানা নাই সেখানে এই পেষণ কার্য্য মান্ধাতার আমলের ঘানির দ্বারা হইয়া থাকে। কলিকাতা সহরে আজ কাল অনেক ছোট ছোট তৈলের কল হইয়াছে এবং এই সকল কলে বৎসর বৎসর অনেক তৈল প্রস্তুত হইতেছে, এবং যাঁহারা কল কারখানা চালাইতেছেন তাঁহাদের দশ টাকা বেশ লাভও হইতেছে। তোমরা যদি কোন কলে গিয়া দেখ তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, কত ঝুনা নারিকেল দুই ভাগ করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে, যখন এই সকল উপযুক্ত মত শুষ্ক হয় তখন সে গুলিকে আরও খণ্ড খণ্ড করিয়া ঘানি কিম্বা কলে ফেলিয়া পেষা হয়। মষিনা ও শরিষার খলির মত নারিকেলের খলিও অনেক কাযে লাগে।

গৃহ পালিত জন্তুদিগের পক্ষে ইহা পুষ্টিকর এবং সুখাদ্য, ফল ও ফুলের গাছের পক্ষে সুসার! নারিকেলের ছোবড়া তুচ্ছ মনে করিও না। ইহা দ্বারা দড়ি কাছি প্রভৃতি নানা প্রকার আবশ্যকীয় বস্তু প্রস্তুত হয়। দড়ি আমাদের কত কাযে লাগে, গৃহ নির্ম্মাণ, বেড়া বাঁধা এই দড়িতে যেমন শক্ত হয় পাটের দড়িতে তত হয় না। বড় বড় নৌকা এবং জাহাজ বাঁধিয়া রাখিবার নিমিত্ত নারিকেলের কাছির বড়ই আবশ্যক। আবার এই নারিকেলের ছোবড়াতে কেমন সুন্দর সুন্দর গদি প্রস্তুত হয়, আমরা তাহার উপর বসিয়া কিম্বা শয়ন করিয়া কত আরাম পাই। নারিকেল একেবারে ঝুনা হইয়া গেলে তাহার ছোবড়ায় ভাল দড়ি কিম্বা কাছি হয় না বলিয়া ব্যবসায়ীরা অপেক্ষাকৃত অপক্ক অবস্থায় নারিকেল পাড়িয়া লয়। যে সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল জন্মায় সেখানকার ব্যবসায়ীরা নারিকেলের ছোবড়ায় দড়ি কাছি প্রস্তুত করিয়া থাকে, কিন্তু প্রস্তুত প্রণালী অতি নিকৃষ্ট। লৌহ শলাকা দ্বারা ছোবড়া ছাড়াইয়া একটা গর্ত্তে ভিজাইয়া রাখে, পরে কিঞ্চিৎ পচিলে গর্ত্ত হইতে উঠাইয়া কাঠের বড় বড় মুদ্গার দ্বারা উহাকে খুব জোরে পিটায়, এইরূপ পিটানতে ছোবড়া যখন বেশ নরম হইয়া আইসে তখন দড়ি কাছি হাতে পাকাইতে সুবিধা হয়। অধিকাংশ কায হাতে করিতে হয় বলিয়া বিলম্বও হয়, কাযও পরিষ্কার হয় না। বিলাতেও নারিকেলের দড়ি কাছি প্রস্তুত করিবার অনেক কারখানা আছে, সেখানে কিন্তু হাতে এসকল কায হয় না, কলে হয়। এই দড়ি কাছির নিমিত্ত বিলাতে প্রতি বৎসর প্রায় এক কোটী বিশ লক্ষ নারিকেলের আমদানি হয়। এত নারিকেলের ছোবড়া ছাড়াইয়া হাতে দড়ি কাছি প্রস্তুত করা কি সহজ কথা! কিন্তু যাহা সহজ নয় তাহাকে সহজ করা ইংরেজদিগের একটি প্রধান প্রকৃতি, কাযেই সহজে দাড় কাছি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কল কারখানা করিয়াছে যে, যে সকল দেশে প্রচুর নারিকেল জন্মে সেই সকল দেশ হইতে বিলাতে নারিকেলের আমদানি হয়। সেখানে নারিকেলের শাঁসে বিস্‌কিট এবং ছোবড়াতে দাড় কাছি প্রস্তুত হইয়া পৃথিবীর নানা দেশে রপ্তানি হয়, যে সকল দেশ হইতে নারিকেল আমদানি হয় সে সকল দেশেও যায়। তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, লঙ্কা দ্বীপ এবং লাক্ষা দ্বীপ প্রভৃতিতে যথেষ্ট নারিকেল জন্মে এবং সেখানকার লোকেও দড়ি কাছি প্রস্তুত করে কিন্তু প্রস্তুত প্রণালী অতি নিকৃষ্ট বলিয়া ভাল দড়ি কাছি হয় না; আর এক কথা, কলে যত

শীঘ্র শীঘ্র কায হয় হাতে তা হইতে পারে না, হাতে যদি একদিনে একশত লোকে পঞ্চাশ মন দড়ি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হয়, কলে এক দিনে দেড় হাজার মন হয়, দেখ কত বিভিন্নতা! কলের দ্বারা যে কেবল অল্প সময়ের মধ্যে অধিক জিনিষ প্রস্তুত হয় তা নয়, জিনিষগুলি পরিষ্কার হয়, এবং অল্প খরচে হয়, আর অল্প খরচে হয় বলিয়া ব্যবসায়ীরা সস্তা দামে বিক্রয় করিতে পারে। এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, ঐ সকল দ্বীপের লোকে কেন কলে, দড়ি কাছি প্রস্তুত করে না? এই খানেইত গোল! কল কারখানা করিতে ও চালাইতে যে জ্ঞান ও বিজ্ঞতার আবশ্যক তাহা ঐ সকল দ্বীপবাসী লোকের নাই, চিরদিন যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহারা তাহাই করিয়া থাকে। তোমরা আবার জিজ্ঞাসা করিতে পার, লঙ্কা ও লাক্ষা দ্বীপ বিলাত অপেক্ষা ভারতবর্ষের নিকট, তবে কেন সেখানকার নারিকেল ভারতবর্ষে না পাঠাইয়া বিলাতে চালান করে? ঐ সকল স্থান হইতে ভারতবর্ষে নারিকেল না আসুক দড়ি, কাছি অনেক আসে। আমরা এখানকার বাজারে সচরাচর যে সকল নারিকেলের দড়ি কাছি দেখিতে পাই তাহার অনেক ঐ সকল দ্বীপের। কিন্তু ঐ দ্বীপের মত ভারতবর্ষেও দড়ি কাছি প্রস্তুত করিবার কল কারখানা নাই বলিয়া এখানে নারিকেল বড় একটা আমদানি হয় না, দেশে যাহা জন্মে তাহাই দেশের অভাবের পক্ষে যথেষ্ট। নারিকেল ত দূরের কথা, এমন অনেক দ্রব্য এই ভারতবর্ষে এত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় যাহা অন্য দেশে তত হয় না, কিন্তু দেশে কল কারখানার অভাবে সেই সকল দ্রব্য বিলাতে রপ্তানি হইতেছে এবং আমাদিগের ব্যবহারের উপযুক্ত বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। তোমরা সকলেই জান ইংলণ্ড কেমন সুসভ্য এবং সমৃদ্ধিশালী দেশ, এই সভ্যতা এবং ধনের প্রধান কারণ ঐ দেশের বাণিজ্য এবং কল কারখানা।

নারিকেলের খোলাতেও ঘটী, বাটী, গেলাশ প্রভৃতি গৃহস্থের আবশ্যকীয় নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত হয়। মান্দ্রাজ অঞ্চলে নারিকেলের খোলা নির্ম্মিত ঐ প্রকার ঘটী, বাটী বাজারে বিক্রয় হয়। আর এক জিনিষ হয় তা আর বলিয়া কায নাই। নারিকেলের এমন অংশ নাই যাহা কোন না কোন কাযে না লাগে। ইহার পাতার শীরগুলিতে মার্জ্জনি (ঝাঁটা) হয়। কাণ্ড পুরাতন হইলে অনেক কাযে লাগে।

নারিকেল গাছগুলি দেখিতে অতি সুন্দর আর এত উপকারী যে, তোমাদের অনেকের নারিকেল বাগান করিতে ইচ্ছা হইতে পারে। যদি এমন ইচ্ছা হয় তাহা হইলে এই কয়েকটী কথা মনে রেখ। বালি মিশ্রিত খলি মাটিতে এই গাছ বেশ হয়। কিন্তু যদি এরূপ জমি না পাও তাহা হইলে যে জমিই হউক না কেন তাহার সহিত কিছু বালি এবং আটাল মাটি মিশ্রিত করিলেই হইবে। বালি শূন্য আটাল মাটিতে কখন নারিকেল গাছ লাগাইওনা। গাছ লাগাইবার জন্য গর্ত্ত করার পর চারি পাঁচ দিন সেটিকে খুলিয়া রাখিবে, যাহাতে গর্ত্তের মধ্যে বেশ বাতাস পায়; তাহার পর গাছ লাগাইবার সময় অর্দ্ধেক গর্ত্তের মাটি এবং অর্দ্ধেক বালি মিশাইয়া লাগাইবে। বালির সঙ্গে কিছু লবণ মিশ্রিত করা ভাল, কারণ তাহা হইলে অঙ্কুরে পোকা লাগে না।

ক্রমশঃ—

এলিজাবেথ ফ্রাই।

(৫৪ পৃষ্ঠার পর।)

(অনিবার্য্য কারণবশতঃ এলিজাঁবেথ ফ্রাইএর জীবনী ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হয় নাই। ফ্রাইএর জীবনী এইবারেই শেষ করিয়া দেওয়া গেল।)

কোন কার্য্য না থাকাতে ইহারা অতি উচ্ছৃঙ্খল ভাবে অতিবাহিত করিতেছে। অবিশ্রান্ত কলহ বিবাদ এবং নানা প্রকার অসৎকাজে লিপ্ত হইয়া ইহারা দিন দিন আরও অধঃপতিত হইতেছে। তিনি দেখিলেন কোন কার্য্যে ইহাদিগকে নিযুক্ত না রাখিতে পারিলে, তাঁহার সকল চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম বিফল হইবে। অনেক চিন্তার পর এলিজাবেথ ফ্রাই, সেখানকার প্রধান রাজকর্ম্মচারী, জেলের অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং মহিলাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, স্ত্রী কয়েদীদিগের সংশোধনের জন্য এবং তাহাদিগকে শিক্ষিত ও কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার জন্য দ্বাদশটী নিয়ম বিধিবদ্ধ করিলেন। সেইগুলি পড়িলে বুঝিতে পারা যায় কারাবাসীদিগের উদ্ধারের জন্য তিনি কত চিন্তা করিয়াছিলেন, এবং কারা-সংস্কার কার্য্যে তাঁহার কতদূর অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। সমস্ত স্ত্রী-কয়েদীদিগের তত্ত্বাবধারণের জন্য একজন স্ত্রীলোক নিযুক্ত হইল। বার জন করিয়া কয়েদী লইয়া এক একটী শ্রেণী হইল, কয়েদীদিগের মধ্যে যাহারা একটু ভাল এমন কয় জন বাছিয়া, এক এক জনকে এই সকল এক এক শ্রেণীর ভার দেওয়া হইল। নিয়ম হইল, কেহ ভিক্ষা চাহিতে পারিবে না (দর্শক দেখিলেই ইহারা ভিক্ষা চাহিত)। তাস ও জুয়া খেলিতে পারিবে না এবং শপথ করিতে বা কলহ বিবাদ করিতে পারিবে না; যে সমস্ত পুস্তক পড়িলে কুফল হইবার সম্ভাবনা, সে সমস্ত পুস্তক কেহ পড়িতে পারিবে না। এই সকল নিয়ম অবহেলা করিলে তাহার জন্য শাস্তিরও ব্যবস্থা হইল। সেলাইএর কাজ, ছুঁচের কাজ এবং পশমের কাজ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। প্রতিদিন কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ইহাদিগকে একস্থানে একত্রিত করিয়া বাইবেল হইতে কিছু কিছু ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হইতে লাগিল। ইহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, কলহ বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া স্থির ও সৎপ্রকৃতি সম্পন্ন হইয়া, নিজ নিজ কার্য্য মনোযোগের সহিত যাহাতে সম্পন্ন করে, প্রত্যেক শ্রেণীর পরিদর্শকদিগের উপর সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য আদেশ হইল। পরিদর্শকদিগকে ইহাদিগের প্রত্যেকের প্রতিদিনের কাজের হিসাব এবং স্বভাব চরিত্রের বিবরণ রাখিবারও আদেশ হইল। অল্পকাল মধ্যেই এই সকল নিয়ম অনুসারে কারাগারের কার্য্য চলিতে লাগিল; এবং ইহাদ্বারা যে সুফল ফলিয়াছিল ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যেস্থান কলহ বিবাদ উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অশান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল, এখন তাহা শান্তির আবাস হইয়া উঠিল। উপদেশ ও শিক্ষার গুণে অনেকের চরিত্র সংশোধিত হইতে লাগিল, এবং সেলাই ও ছুঁচের কাজ প্রভৃতি দ্বারা ইহারা যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহাতে ইহাদের অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ দূর হইয়া অবস্থারও অনেক উন্নতি হইল। কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে ইহারা কলহ বিবাদ করিবার বা অসৎভাবে সময় কাটাইবার আর অবসর পাইত না;

তদ্ভিন্ন একটী বিশেষ উপকার এই হইয়াছিল যে, কারামুক্ত হইয়া ইহারা ইহাদ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া, সৎপথে থাকিয়া জীবন যাপন করিতে পারিত।

ক্রমে নিউগেট কারাগারে সংস্কার ও কারাবাসীদিগের অবস্থার উন্নতিতে সাধারণের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট সভা হইতে একটী কমিটী গঠিত হয়। এলিজাবেথ ফ্রাই কি উপায় অবলম্বনে নিউগেট কারাগারের সংস্কার এবং কারাবাসিনীদিগের অবস্থার এত উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই কমিটীর উপর সেই সমস্ত অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হইল। কমিটীর সভ্যগণ কারাসংস্কার কার্য্যে এলিজাবেথ ফ্রাইএর অভিজ্ঞতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ইহার পর হইতেই দেশের লোকের এবং গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এই দিকে অধিকতররূপে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আমাদের বর্ত্তমান বড় লাট ল্যান্সডাউনের পিতা মার্কুইস অব ল্যান্সডাউন কারাগারের অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। এই উপলক্ষে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহাতে, এলিজাবেথ ফ্রাই নিউগেট কারাগারের সংস্কার এবং কারাবাসিনীদিগের অবস্থার উন্নতি করিয়া দেশের যে অশেষ উপকার করিতেছিলেন, তাহা উল্লেখ করিয়া তাঁহার যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করেন।

এই সময় হইতে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এই দিকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইল। রাজ্যের কারাগার পরিদর্শন এবং তাহার সংস্কারে গভর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইলেন। একজন স্ত্রীলোকের কার্য্য এবং দৃষ্টান্তে একটী মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত হইল।

ইহার কিছুকাল পরে এলিজাবেথ ফ্রাই একবার স্কটলণ্ডে গিয়াছিলেন। সেখানে যাইয়াও সেখানকার কারাগারগুলি পরিদর্শন এবং তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি যেখানেই যাইতেন সেইখানেই প্রচার করিতেন,—শাস্তির উদ্দেশ্য পীড়ন করা নহে, সংশোধনই শাস্তির একমাত্র উদ্দেশ্য।

যে সমস্ত অপরাধিনীদিগকে গুরুতর অপরাধের জন্য দ্বীপান্তরিত করা হইত, এলিজাবেথ এই সময় তাহাদিগের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। এই অপরাধিনীদিগকে পশুর ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া জাহাজে লইয়া যাওয়া হইত; জাহাজে কোন প্রকার শৃঙ্খলা বা বন্দোবস্ত ছিল না। নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ভাবে এবং নানা প্রকার অসৎ কার্য্যে ইহারা সময় কাটাইত। যে স্থানে ইহাদিগকে লইয়া যাওয়া হইত, সেখানে যাইয়া ইহারা কোথায় থাকিবে, কি আহার করিবে, কি প্রকারেই বা দিনপাত করিবে, তাহার কোন প্রকার বন্দোবস্তই ছিল না। এলিজাবেথ ফ্রাই দেখিলেন এ অতি শোচনীয় অবস্থা, ইহাদিগের দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিয়া তিনি একান্ত ব্যথিত হইলেন, এবং ইহাদিগের এই দারুণ দুর্দ্দশা মোচনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি ইহাদিগের দুর্দ্দশার কথা গভর্ণমেণ্টের গোচর করিলেন এবং ইহার প্রতিকারের জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন। ক্রমে তাঁহার চেষ্টার সুফল ফলিল। এই সকল অপরাধিনীদিগের থাকিবার জন্য বাসস্থান নির্ম্মিত হইল, এবং নিউগেট কারাগারে তিনি যে প্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, সেই প্রকার বন্দোবস্ত এখানেও করা হইল। ফ্রাই তাঁহার এই কার্য্যের দ্বারা দেশের যে কি

মহৎ উপকার করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

দুঃখীর দুর্দ্দশা মোচনের জন্য তাঁহার হৃদয়ে যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে চারিদিকে প্রসারিত হইয়া পড়িল; বাল্যকালে যে ক্ষুদ্র দয়ার স্রোত তাঁহার হৃদয়ে বহিয়াছিল, তাহা ক্রমে অতিশয় বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এলিজাবেথ ফ্রাই ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড এবং আয়র্লণ্ডের কারাগারগুলি একে একে প্রায় সমস্ত পরিদর্শন করিলেন। এবং এই সকল কারাগারের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই খানেই তাঁহার কার্য্য শেষ হয় নাই। রুষিয়া, জর্ম্মনি, ফ্রান্স, প্রুসিয়া প্রভৃতি ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজ্য হইতে তিনি পত্রাদি পাইতে লাগিলেন। এলিজাবেথ ফ্রাই দেখিলেন তাঁহার চেষ্টার ফল ফলিতেছে। সমস্ত ইউরোপের লোকের হৃদয়ে হতভাগ্য কারাবাসী ও কারাবাসিনীদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার ইচ্ছা উদয় হইয়াছে। অপরাধীদিগকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সংশোধন করাই কারাবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য; নির্দ্দয়ভাবে শাস্তি দেওয়াতে কেবল কুফল ফলিতেছে এবং তাহাতে দেশের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই হইতেছে, ইহা ইউরোপের লোকে বুঝিতে পারিয়াছে দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না।

এলিজাবেথ ফ্রাই ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইউরোপে গিয়াছিলেন; ইহার পর আরও চারিবার তিনি ইউরোপে যান। এই পাঁচবারে তিনি ইউরোপের প্রায় সমস্ত রাজ্যেই গিয়াছিলেন। সকল স্থানেই মহা সম্মান প্রাপ্ত হন। রুসিয়া, জার্ম্মেনি, প্রুসিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হলাণ্ড প্রভৃতি সমস্ত রাজ্যের রাজারাই তাঁহাকে অতিশয় সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন। এই সম্মান পাইয়াও তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য গর্ব্বিত বা অহঙ্কৃত হন নাই; দেশ বিদেশে রাজা রাণী সম্রাটদিগের নিকট এত সম্মান লাভ করিলেও তাঁহার সেই সরলতা, বিনয় এবং নম্রতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। ফ্রাই ইউরোপের প্রত্যেক রাজ্যের কারাগার এবং কোন কোন স্থানের হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিয়া, সেই সকল কারাগারের যাহাতে সংস্কার হয়, কারাবাসী এবং কারাবাসিনীদের দুর্দ্দশা যাহাতে মোচন হয়, সে বিষয় যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের রাজা ও রাজকর্ম্মচারিগণ আগ্রহের সহিত তাঁহার নিকট কারাসংস্কার বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার পরামর্শ অনুসারে নিজ নিজ রাজ্যের কারাগারগুলির সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে এলিজাবেথ ফ্রাইএর চেষ্টায় এবং যত্নে ইউরোপের বহু সংখ্যক কারাগারের অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি শেষবার ইউরোপে যান। এই সময় এলিজাবেথ ফ্রাইএর বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন তাঁহার দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, তাঁহার শক্তি সামর্থ্য ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। তিনি দেখিলেন মৃত্যুর ছায়া ক্রমে তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। কিন্তু পরোপকারের জন্য হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা, তাহার বিন্দুমাত্রও হ্রাস হয় নাই, বরং বয়সের সঙ্গে সে আকাঙ্ক্ষা আরও যেন বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু যাহাই হউক জীবনের শেষ দিন সন্নিকট অনুভব করিয়া ফ্রাই কারাবাসী ও কারাবাসিনীদের আশীর্ব্বাদ এবং দেশের লোকের ও রাজন্যবর্গের সম্মানে ভূষিত হইয়া গৃহে ফিরিলেন।

গৃহে ফিরিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না।

দেশের কারাগার এবং পাগলা-গারদগুলির উন্নতির জন্য তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত চিন্তা এবং যত্ন ও চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য প্রকার দেশহিতকর কার্য্যেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। এতদ্ভিন্ন ফ্রান্স, জর্ম্মেনি, প্রুসিয়া, ডেনমার্ক, সুইজর্লাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহার নিকট প্রায় প্রতিদিনই পত্র আসিত। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করাতে সেই সকল দেশের কারাগারগুলির যে উন্নতি হইয়াছিল এবং তাহাতে যে সুফল ফলিয়াছিল, এই সকল পত্রে তাহা লিখিত থাকিত। এবং সময়ে সময়ে তাঁহার পরামর্শও জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান হইত। কারাগারের সংস্কার ও উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার মতামত এই সময়ে তিনি একখানি পুস্তকে প্রকাশ করেন। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে কারাগারের সংস্কার হইতে পারে, কারাবাসী ও কারাবাসিনীদিগের অশেষ দুঃখ দুর্দ্দশার হ্রাস হইতে পারে, তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হইতে পারে, এবং কি প্রকার শিক্ষা দিলে এই হতভাগ্য এবং হতভাগিনীগণ কারামুক্ত হইয়া, সংসারে গিয়া সৎপথে থাকিয়া জীবন যাপন করিতে পারে, এই সমস্ত বিষয়ে তাঁহার মত এবং অভিজ্ঞতা এই পুস্তকে বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছিল। কারাসংস্কারের কার্য্যে গভর্ণমেণ্ট এই পুস্তক হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন, এবং এই পুস্তকে লিখিত নিয়ম অবলম্বনে কারাগারগুলির উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে লাগিল।

এলিজাবেথ ফ্রাই যে কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার সুফল এবং তাহার বিবরণ আমরা এই খানেই শেষ করিলাম। আর দুই একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াই আমরা তাঁহার এই আদর্শ-জীবনী শেষ করিব।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এলিজাবেথ ফ্রাই অতিশয় সরল, বিনয়ী, ধর্ম্মভীরু এবং পরোপকারী ছিলেন; তাঁহার চরিত্র আদর্শ চরিত্র ছিল। ফ্রাই সমস্ত জীবন দেশহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াও সাংসারিক কর্ত্তব্য কখনও অবহেলা করেন নাই। তাঁহার অনেকগুলি পুত্র কন্যা ছিল। তিনি ইহাদিগের শিক্ষার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার পুত্র কন্যাগণ যাহাতে সচ্চরিত্র হয়, যাহাতে ধর্ম্মভীরু হয় সে জন্য তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। জীবনের শেষভাগে নানা প্রকার দুর্ঘটনায় তাঁহাকে পড়িতে হয়। সন্তানের মৃত্যু, সাংসারিক অবস্থার পরিবর্ত্তন প্রভৃতি নানা প্রকার দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু এই সকল দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যেও তিনি স্থিরভাবে থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য করিয়া গিয়াছেন। শেষ জীবনে তাঁহাকে অশেষ কষ্ট এবং দুঃখে পতিত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু ফ্রাই ধীরভাবে এই সকল দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, এই সকল দুঃখ কষ্টে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া ধীরভাবে সমস্ত দুঃখ কষ্টই সহ্য করিয়াছিলেন; এবং ধর্ম্মে মতি ও অচল বিশ্বাস রাখিয়া জীবনের কর্ত্তব্য করিয়া গিয়াছেন। ফ্রাই কোয়েকার সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। সেই সম্প্রদায়ের নিয়ম অনুসারে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহাও তিনি কখনও অবহেলা করেন নাই। সম্প্রদায়ের নিয়ম অনুসারে তিনি মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারও করিতেন।

কারাগারের সংস্কার এবং পাগলা-গারদের উন্নতি ভিন্ন, এলিজাবেথ ফ্রাই আরও অনেকগুলি দেশহিতকর কার্য্যে নিজ জীবন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। জাহাজের নাবিক এবং তাহাদিগের সন্তান সন্ততিদিগের শিক্ষার জন্য তিনি অনেক

গুলি পুস্তাকালয় স্থাপন করেন। গভর্ণমেণ্ট হইতে অর্থ সাহায্য এবং অন্য প্রকারে চাঁদা তুলিয়া তিনি একার্য্য সম্পন্ন করেন। সর্ব্বশুদ্ধ ৬২০ টী পুস্তকালয় স্থাপিত হয় এবং ইহাতে ৫২৪৬৪ পুস্তক সংগৃহীত হয়। ভৃত্যদিগের জন্য একটী সভা স্থাপন করেন। যাহারা ভৃত্যের কাজ করিবে, অথচ আপাততঃ নিরাশ্রয়, তাহাদিগকে এই সভা হইতে আশ্রয় দেওয়া হইত এবং তাহাদিগকে কাজ কর্ম্ম জোগাড় করিয়া দেওয়া হইত। তদ্ভিন্ন রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত কতকগুলি স্ত্রীলোক শিক্ষিতা করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া, সেইটী যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় সে বিষয়ে যথেষ্ট যত্ন ও সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহারাই "সিষ্টার্স অব মার্সি" (Sisters of mercy) নামে পরিচিত। হাঁসপাতালে রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষা করা ইহাদিগের কার্য্য।

ক্রমে এলিজাবেথ ফ্রাইএর শেষদিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, শেষ জীবনে তাঁহার কয়েকটী সন্তান এবং পৌত্র ও কয়েকজন আত্মীয়ের মৃত্যুতে এবং কতকগুলি সাংসারিক দুর্ঘটনায় তাঁহাকে একান্ত শোকগ্রস্থ হইতে হইয়াছিল। যে কার্য্যে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার সুফল প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি যেমন সুখী হইয়াছিলেন, এবং দেশের ও ইউরোপের প্রায় সমস্ত রাজাদিগের নিকট অশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তেমনি পারিবারিক এবং সাংসারিক দুর্ঘটনাতেও তাঁহাকে শেষ জীবনে একান্ত শোকগ্রস্থ করিয়াছিল। বিপদের উপর বিপদ এবং শোকের পর শোকের আঘাতে তিনি নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শোকে অধীর হইলেও ঈশ্বরের উপর তাঁহার যে অটল বিশ্বাস এবং নির্ভর ছিল তাহা তিনি কখনও হারান নাই। দুঃখে সুখে শোকে তিনি তাঁহার উপরই নির্ভর করিয়া রহিয়াছেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে এক স্থানে লইয়া যাওয়া হইল; কিন্তু তাহাতে অতি সামান্য উপকারই হইয়াছিল। রোগ শোকে তিনি এই সময় নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ের যে আকাঙ্ক্ষা তাহার হ্রাস হয় নাই; রোগ শয্যায়ও তাঁহার ঐ চিন্তা;—মৃত্যুর সময়ও ঐ চিন্তা করিতে করিতেই তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্য লাভের আশায় আরও দুই একবার বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই আর তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর অতি প্রত্যূষে শোকের আঘাত এবং রোগ যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া এলিজাবেথ ফ্রাই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী হইল এলিজাবেথ ফ্রাইএর মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু যে মহৎ কার্য্যে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং তাহা হইতে যে সুফল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

আগ্রা।

জানুয়ারী মাসে তোমাদিগকে এলাহাবাদের কথা বলিয়াছি। চল পাঠক পাঠিকা এবার আমরা আগ্রা যাই। আগ্রা এলাহাবাদ হইতে ১৪০ ক্রোশ দূরে; এটী বাদসাহী আমলের সহর। আগ্রায় কোন দিন হিন্দুদের রাজত্ব ছিল কি না তাহা জানা যায় না। মোগলদিগের পূর্ব্বে লোদীবংশীয়েরা আগ্রায় রাজত্ব করিত। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে মোগল রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা বাবর আগ্রা অধিকার করিয়া সেই স্থানেই রাজধানী স্থাপন করেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র হুমাউন আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু হুমাউনের পুত্র আকবর দিল্লী হইতে পুনরায় আগ্রায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। বর্ত্তমান আগ্রা আকবর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। আগ্রা নগরী যমুনার পশ্চিম তীরে স্থিত। আকবর ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে একটী বৃহৎ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। আকবরের রাজত্বকালে আগ্রাই ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। মোগল সম্রাটদিগের প্রথা অনুসারে, দুর্গ মধ্যেই রাজপ্রাসাদ এবং অন্যান্য অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। মোগল রাজত্বের শেষ ভাগে আগ্রা মহারাষ্ট্রীয়দিগের দ্বারা অধিকৃত হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্ত হইতে আগ্রা ইংরেজদিগের হস্তে যায়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজেরা উত্তর পশ্চিমের রাজধানী, এলাহাবাদ হইতে আগ্রায় স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর রাজধানী পুনরায় এলাহাবাদে স্থানান্তরিত হয়।

এলাহাবাদ হইতে আগ্রায় অনেক বেশী দেখিবার জিনিস আছে। চল একে একে সেগুলি তোমাদিগকে দেখাই। আগ্রার অভিমুখে অগ্রসর হইলে যমুনার পশ্চিম তীরে আকবর নির্ম্মিত আগ্রার দুর্গ এবং তাহার অনধিক এক ক্রোশ দক্ষিণে জগৎ বিখ্যাত তাজমহল দেখিতে পাইবে। আগ্রার দুর্গ রক্ত প্রস্তর নির্ম্মিত। দুর্গের তিনদিক গভীর পরিখায় বেষ্টিত, এবং পূর্ব্বদিক দিয়া যমুনা বহিয়া যাইতেছে। বাদসাহগণ কর্ত্তৃক দুর্গ মধ্যেই রাজপ্রাসাদ, মসজিদ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল; তার মধ্যে দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস্, জেনানা, মতি মসজিদ, নগ্‌দাম মসজিদ ও শিশমহল ইত্যাদিই প্রধান দেখিবার জিনিস।

দেওয়ানী আম্—বাদসাহের প্রকাশ্য দরবার। এই দরবার গৃহ ১২০ হাত দীর্ঘ এবং প্রস্থে ৪০ হাত। ইহা সুবর্ণ খচিত এবং নানা প্রকার কারুকার্য্যে সুসজ্জিত ছিল, ভারতবর্ষে ইহা অপেক্ষা জমকাল দরবার গৃহ আর নাই। এই দরবার গৃহের পূর্ব্ব প্রান্তে আকবরের সিংহাসন রাখিবার মঞ্চ।

দেওয়ান খাস—বাদসাহের গোপনীয় দরবার। আকবর এই দরবার গৃহে, তাঁহার প্রধান সেনাপতি মহারাজা মানসিংহ এবং রাজস্ব মন্ত্রী মহারাজা টোডর মল্লের সহিত রাজ্যশাসন সম্বন্ধে

পরামর্শ করিতেন। এটীও দেখিতে অতিশয় সুন্দর।

জেনানা—একটী অতি মনোহর গৃহ। এই স্থানে আকবর বিখ্যাত "নৌরোজার" মেলা মিলাইতেন।

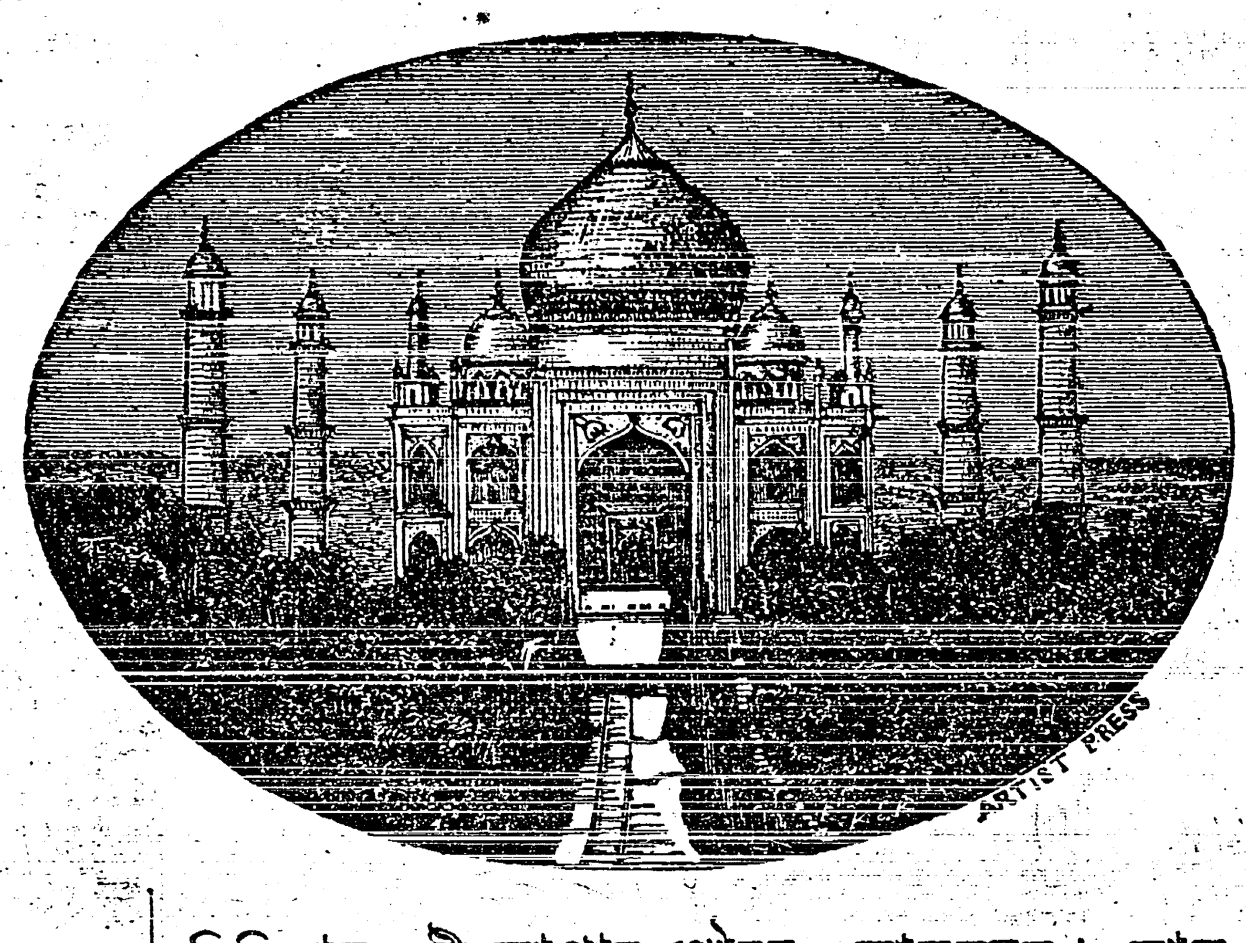

মতি মস্‌জিদই—দুর্গ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর অট্টালিকা। আকবরের পৌত্র সাজাহান বাদসাহ প্রায় এক কোটী টাকা ব্যয় করিয়া ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে বেগমদিগের উপাসনার জন্য এই মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। এই মসজিদটী সম্পূর্ণ শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার তিনটী প্রকাণ্ড শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত গম্বুজ আছে এবং তিনটী স্বর্ণ চূড়া এই তিনটী গম্বুজের উপর শোভা পাইতেছে; গম্বুজগুলি দুর্গের সমস্ত অট্টালিকা অপেক্ষা উচ্চ। প্রাতঃ সূর্য্যের কিরণ যখন এই গম্বুজগুলির উপর পতিত হয়, তখন বোধ হয় যেন সত্য সত্যই সেগুলি স্বর্ণনির্ম্মিত।

শিশমহল—বেগমদিগের স্নানাগার ছিল। শিশমহলের প্রাচীর পরকলায় খচিত, একটী আলো জ্বলিলে বোধ হয় যেন প্রাচীরের গায়ে সহস্র সহস্র আলো জ্বলিতেছে।

সোমনাথের সেই চন্দন কবাটও দুর্গ মধ্যে, দরবার গৃহের এক পার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কবাট প্রায় ৮ হাত উচ্চ এবং প্রস্থে ৬ হাত। মহম্মদ ঘোরী সোমনাথের মন্দিরের এই চন্দন কবাট তাঁহার রাজধানী গজনীতে লইয়া যান। ইংরেজেরা পরে তাহা গজনী হইতে পুনরায় ভারতে আনিয়াছেন এবং আগ্রা-দুর্গ মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন।

পাঠক পাঠিকা! উপরে যে মনোহর অট্টালিকা দেখিতেছ, বল দেখি ওটী কি? যদি তোমাদের মধ্যে কেহ আগ্রায় যাইয়া থাক তবে অবশ্যই চিনিয়াছ ওটী আগ্রার গৌরব—তাজমহল। তাজমহল যে কেবল আগ্রার গৌরব তাহা নহে। সমস্ত ভারতবর্ষের গৌরব। পৃথিবীতে এমন সুন্দর কারুকার্য্য-পূর্ণ অট্টালিকা আর নাই, তাজমহলে শিল্পের পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে। তাজমহলের বিবরণ দ্বিতীয় ভাগ "সখায়" প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং আমরা ইহার আর বিস্তৃত বিবরণ দিলাম না। যাঁহারা দ্বিতীয় ভাগ "সখা" পড়েন নাই, তাঁহাদিগের জন্য সংক্ষেপে দুই এক কথা লিখিত হইল। মোগল সম্রাট আকবর বাদসাহের পৌত্র সাজাহান, তাঁহার প্রিয়তমা বেগম মমতাজমহলের সমাধির উপর এই মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। বিশ সহস্র শিল্পী সতের বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে। জয়পুর হইতে শ্বেত প্রস্তর এবং ফতেপুর সিক্রী হইতে রক্ত প্রস্তর আনীত হইয়া তাজমহল নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা নির্ম্মাণ করিতে দুই কোটী টাকা ব্যয় হয়। সাজাহান তাঁহার বেগমের নাম অনুসারে ইহার নাম তাজমহল রাখেন। আগ্রার এক ক্রোশ দক্ষিণে যমুনার-তীরে, তাজমহল শোভা পাইতেছে। ইহার

প্রবেশ দ্বার রক্ত প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং অতিশয় প্রকাণ্ড এবং দেখিতেও অতি সুন্দর। প্রবেশ করিয়া দেখ সম্মুখে একটী পরম রমণীয় উদ্যান; উদ্যান মধ্যে একটী শ্বেত প্রস্তরের কৃত্রিম পুকুর রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে কতকগুলি ফোয়ারা। উদ্যানের বৃক্ষ শ্রেণীর ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখ, তাজমহলের অপূর্ব্ব দৃশ্য তোমার চক্ষে পড়িবে। প্রথমে তের চৌদ্দ হাত উচ্চ এবং প্রায় সাত শত হাত প্রস্থে রক্ত চন্দনের একটী ভিত্তি; তাহার উপর দশ হাত উচ্চ এবং দীর্ঘ প্রস্থে

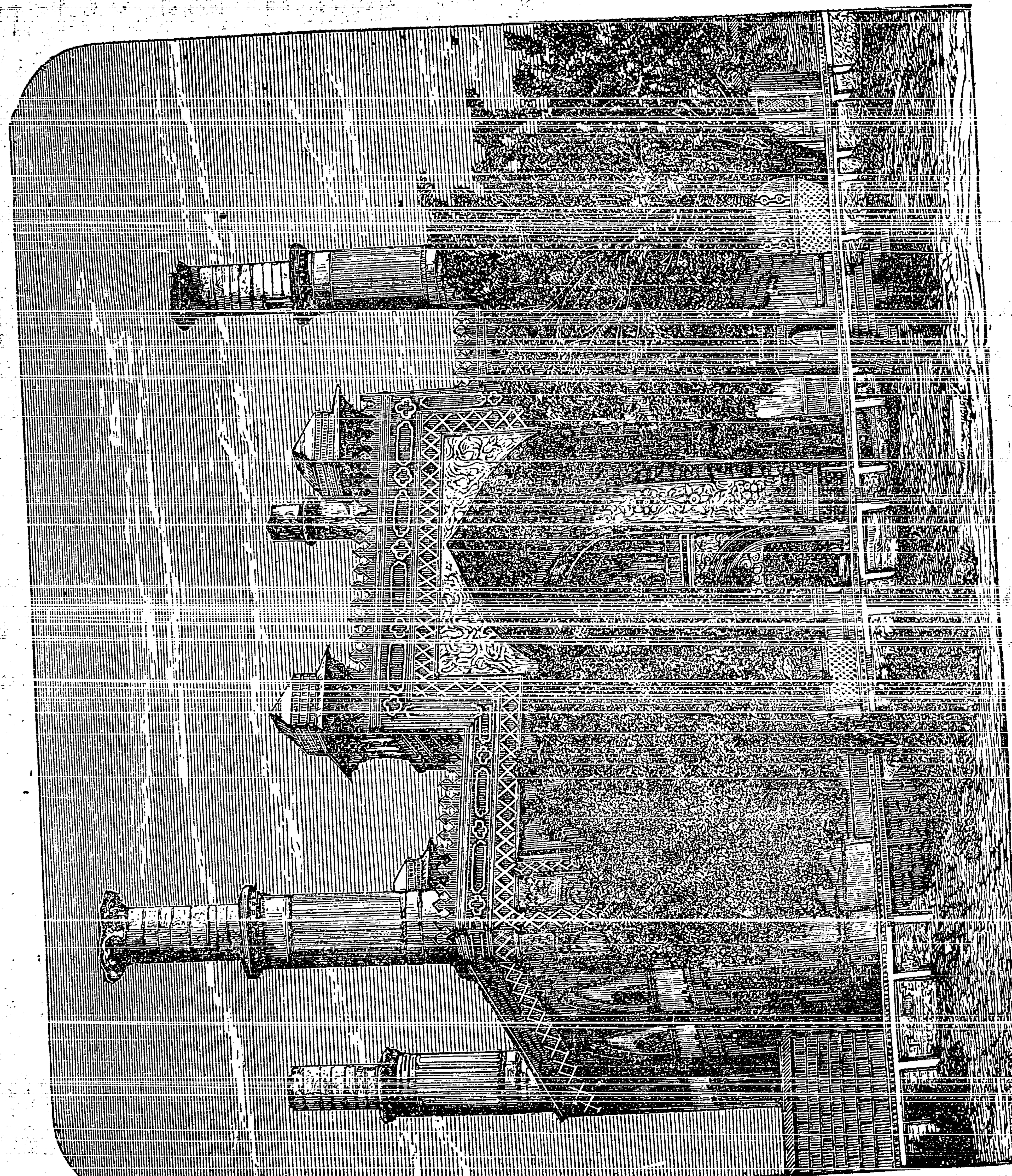

সেকেন্দ্রা প্রবেশদ্বার।

দুই শত হাত একটী শ্বেত প্রস্তরের ভিত্তি। ইহার উপর বিশুদ্ধ শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত তাজমহলের অপূর্ব্ব অট্টালিকা। ইহার চারি কোণে চারিটী স্তম্ভ, প্রত্যেকটী ১৫০ হাত উচ্চ। চক্ষে না-দেখিলে তাজমহলের সৌন্দর্য্য লিখিয়া বুঝান যায় না। চন্দ্রের উজ্জ্বল শুভ্র জ্যোৎস্না যখন তাজের শুভ্র দেহে পতিত হয় তখন ইহা অতি মনোহর দেখায়; চন্দ্রালোকে তাহার শোভা অবর্ণনীয়। তাজমহলের উপর ও মধ্যভাগ নানাবিধ মূল্যবান প্রস্তর এবং অতুলনীয় সূক্ষ্ম শিল্প ও মনোহর কারুকার্য্যে পরিপূর্ণ। প্রাচীরের শ্বেত প্রস্তরে নানাবর্ণের বহুমূল্য প্রস্তর দ্বারা লতা পাতা এবং ফুল খোদিত হইয়াছে। এই ফুল, পাতা ও লতাগুলি এমন সুন্দর এবং এমন স্বাভাবিক যে বোধ হয় যেন পার্শ্বস্থ উদ্যান হইতে এইগুলি তুলিয়া শ্বেত বরফ রাশির উপর কেহ বসাইয়া রাখিয়াছে। দরজাগুলি সমস্ত চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত। তাজমহলের নিম্নতলে মমতাজমহলের সমাধি এবং সেই সমাধির পার্শ্বেই স্বামী সাজাহানের সমাধি। সমাধিমঞ্চ দুইটী বহুমূল্য প্রস্তরে সুশোভিত। তাজমহলের দ্বিতল গৃহের প্রাচীর আরও সুন্দর এবং আরও মনোহর ও মূল্যবান প্রস্তরে সুশোভিত। এই দ্বিতল গৃহেও সাজাহান এবং তাঁহার পত্নীর কৃত্রিম সমাধিমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে যেরূপ কারুকার্য্য আছে, তাহা কল্পনায়ও ধারণা করা যায় না! মোগল রাজ্যের শেষ ভাগে জাঠ জাতি আগ্রা আক্রমণ করিয়া তাজমহলের মূল্যবান প্রস্তর ও রত্নরাজি অপহরণ করে। কিন্তু এখনও তাজের যে সৌন্দর্য্য আছে, তাহা জগতে অতুলনীয়।

আগ্রায় আরও অনেকগুলি দেখিবার জিনিস আছে, তন্মধ্যে জুম্মা মসজিদ্ এবং সেকেন্দরাই প্রধান। জুম্মা মসজিদ্ একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা। ইহার চারিকোণে চারিটী স্তম্ভ আছে।

সেকেন্দরা আগ্রা হইতে কয়েক মাইল দূরে। সেকেন্দরা মোগলকুলতিলক আকবরের সমাধি স্থান, ইহার সমস্তই রক্ত প্রস্তরে নির্ম্মিত। সেকেন্দরা প্রবেশদ্বারের চিত্রটী আমরা দিলাম। ইহার চারি কোণে চারিটী প্রকাণ্ড স্তম্ভ; ইহার একটী এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেকেন্দরা একটী প্রকাণ্ড চৌতল গৃহ, মস্‌জিদের আকারে নির্ম্মিত। ইহার চৌদ্দটী চূড়া আছে। দ্বিতলে আকবরের কৃত্রিম সমাধিমঞ্চ নানা প্রকার কারুকার্য্যে সুশোভিত। নিম্নতলে একটী অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আকবরের প্রকৃত সমাধিমঞ্চ, মোগলকুলতিলক আকবর সেই স্থানে চির নিদ্রায় অভিভূত। সেই ঘরে গান গাহিলে যেন বীণা ধ্বনি হয়। চৌতলে যে কৃত্রিম সমাধিমঞ্চ আছে, তাহার চারি পার্শ্বে কোরাণে লিখিত ঈশ্বরের একশত আট নাম লিখিত আছে। ইহারই মধ্যস্থলে কহিনুর মণি সংস্থাপিত ছিল—সেস্থান এখন শূন্য পড়িয়া আছে।

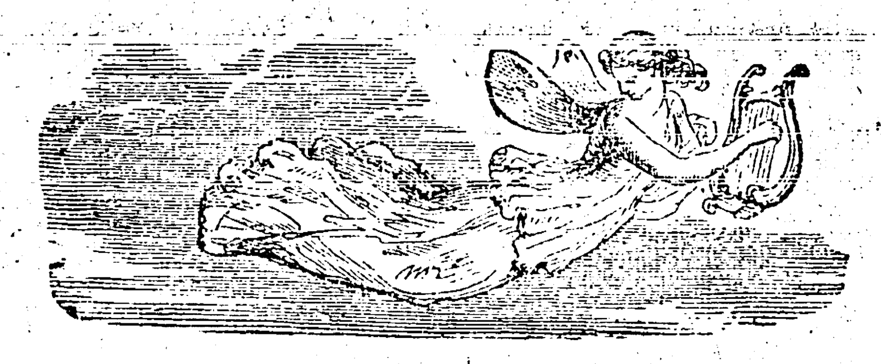

সীতাকুণ্ড।

(২৫ পৃষ্ঠার পর।)

দ্বিতীয় সংখ্যার "সখা"তে প্রস্রবণের উৎপত্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ভূগর্ভ হইতে জল উত্থিত হওয়াতে জলে নানা প্রকার খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকে। বিভিন্ন স্থানের মৃত্তিকার তারতম্যে বিভিন্ন স্থানের প্রস্রবণের জলে বিভিন্ন প্রকার পদার্থ মিশ্রিত হয়। নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত থাকে বলিয়া, অনেক প্রস্রবণের জল ঔষধ-স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। হাজারিবাগ হইতে ২৭ মাইল উত্তরে এক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। তাহার জলে গন্ধক মিশ্রিত আছে। এজন্য তথাকার লোকেরা কোন প্রকার চর্ম্মরোগ হইলে ঐ জলে অবগাহন করে। সিন্ধু দেশে ও পঞ্জাবের উত্তরাংশে লবণাক্ত প্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়। নীলগিরিতে ও হিমালয়ে কয়েকটিতে লৌহ পাওয়া যায়। লৌহ-মিশ্রিত জল স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে বিশেষ উপকারী।

আমরা যাবতীয় প্রস্রবণ ভিন্ন ভিন্ন খনিজ পদার্থ ধরিয়া ভাগ করিতে পারি। কোনগুলিতে বা লবণ, কোন গুলিতে বা গন্ধক, কোন গুলিতে বা লৌহ, কোন গুলিতে বা অপর কোন দ্রব্য মিশ্রিত থাকাতে, প্রস্রবণ সমুদায় ঐ ঐ দ্রব্য ধরিয়া শ্রেণী বিভাগ কারতে পারা যায়। আবার, কোন কোন প্রস্রবণের জল উষ্ণ, কাহারও বা জল শীতল। অতএব আমরা উষ্ণ ও শীতল, এই দুই শ্রেণীতেও যাবতীয় প্রস্রবণ বিভক্ত করিতে পারি।

প্রস্রবণ-সম্বন্ধে স্থূল স্থূল বিবরণ প্রদত্ত হইল। ভারতের সমুদায় প্রস্রবণের বিষয় বর্ণনা করিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। এখানে কেবল মুঙ্গেরের ও চট্টগ্রামের প্রস্রবণ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া গেল।

মুঙ্গের হইতে ৫ মাইল পূর্ব্বে সীতাকুণ্ড নামক উষ্ণ প্রস্রবণ। অনেকের বিশ্বাস যে, প্রস্রবণ উষ্ণ হইলেই লোকে তাহাকে সীতাকুণ্ড বলে, এবং দুই একটি প্রাকৃত-ভূগোল গ্রন্থকারও এই ভ্রমে পড়িয়াছেন। বস্তুতঃ, সীতাকুণ্ড প্রস্রবণ-বিশেষের নাম মাত্র। সীতাকুণ্ড, ঋষিকুণ্ড, ভীমকুণ্ড, মণিকর্ণ, নাগকুণ্ড, বাড়বকুণ্ড প্রভৃতি বহুবিধ নামে প্রস্রবণ

সকল পরিচিত আছে। আমাদের দেশে সামান্য রকম প্রাকৃতিক ব্যাপার পাইলেই তাহা কোন না কোন তীর্থ স্থান বলিয়া অজ্ঞ লোকেরা বিশ্বাস করে। কাযেই প্রায় যাবতীয় উষ্ণ প্রস্রবণ-সম্বন্ধে পাণ্ডা ব্রাহ্মণেরা কোন না কোন পৌরাণিক ইতিহাস বর্ণনা করিয়া থাকে। এইরূপে তাহারা বিলক্ষণ দুপয়সা উপার্জ্জনও করিয়া থাকে।

মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে সময়ে সময়ে হাজার হাজার যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। তথাকার প্রবাদ এই যে, রামচন্দ্র লঙ্কা জয় করিয়া ঐ স্থানে সীতার অগ্নি-পরীক্ষা করেন। সীতা ঐ খানে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বাহিরে আসাতে, তথা হইতে নির্ম্মল ও উষ্ণ জলের ঝরণা বা প্রস্রবণ উৎপন্ন হয়। এই জন্যই ঐ প্রস্রবণের নাম সীতাকুণ্ড।

চট্টগ্রাম জেলায় সীতাকুণ্ড-সম্বন্ধেও উপরি উক্ত প্রবাদ প্রচলিত আছে। তবে দুঃখের বিষয়, চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ড নামক কোন কুণ্ড বা প্রস্রবণই দেখিতে পাওয়া যায় না। চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ড নামক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, এরূপ ধারণা অনেকের আছে। এমন কি, বিখ্যাত হাণ্টার সাহেব তাঁহার চট্টগ্রামের বিবরণে ঐ সীতাকুণ্ডের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয়, পূর্ব্বে কোন কালে তথায় উষ্ণ প্রস্রবণ ছিল, তাহাতেই সেই স্থানের নাম সীতাকুণ্ড হইয়াছে। এক্ষণে সীতাকুণ্ড চট্টগ্রামের একটি মহকুমার নাম। তথায় চন্দ্রনাথ নামক এক পাহাড় আছে। তাহার উপর চন্দ্রনাথ নামে এক শিব আছেন। ঐ শিবের মোহন্তকে সীতাকুণ্ড প্রস্রবণ দেখাইয়া দিতে বলাতে, তিনি জঙ্গলপূর্ণ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী একটি গভীর স্থান দেখাইয়া দিলেন। প্রস্রবণ কোথায়, জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে, কোন কালে বোধ হয় ঐ স্থানে

প্রস্রবণ ছিল, এখন সেই স্থানটি মাত্র আছে, প্রস্রবণ নাই। যাহা হউক ঐ চন্দ্রনাথ পাহাড়ের গায়ে স্থানে স্থানে আগুনের ফোয়ারা আছে। তদ্বিষয় পরে বলা যাইবে।

মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডের চারিদিক ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রায় যাবতীয় বড় বড় প্রস্রবণ বা ঝরণার চারিদিক ইঁট পাথর ইত্যাদির দ্বারা বাঁধিয়া রাখাতে, বোধ হয়, প্রস্রবণের একটি নাম কুণ্ড হইয়াছে। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডের আয়তন প্রায় ১২ চতুরস্র হাত। উহা একটি উষ্ণ প্রস্রবণ। কিন্তু উহার জলের উষ্ণতা সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। সচরাচর উহার উষ্ণতা শতাংশিক তাপমান যন্ত্রের * ৫০°। ৬০° শ দেখা যায়।

মুঙ্গেরে সীতাকুণ্ড ব্যতীত আরও কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। মুঙ্গের হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে ঋষিকুণ্ড নামে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। তাহার জলের উষ্ণতা শতাংশিক তাপমানের ৪৮°শ বলিয়া একবার পরীক্ষিত হইয়াছিল। মুঙ্গেরের মহাদেব পাহাড়ের তলদেশ হইতে ভীমবাঁধ নামক একটি কুণ্ড আছে। উহার জলের উষ্ণতা প্রায় ৬২° শ।

মুঙ্গের ভিন্ন হাজারিবাগ ও বীরভূমেও দুই একটি প্রস্রবণ আছে। হাজারিবাগে সূর্য্যকুণ্ড, ইন্দ্রজবা নামক গন্ধক প্রস্রবণ, গন্ধমিয়া, কিশোধি প্রভৃতি কতকগুলি ছোট ছোট উষ্ণ ও শীতল প্রস্রবণ আছে। পালামোর মণ্ডল গ্রামে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। তাহার জলের উষ্ণতা প্রায় ৮২°শ এবং তাহাতে লৌহ আছে বলিয়া বোধ হয়। বীরভূমে কয়েকটি গন্ধকাক্ত প্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ জেলার তাঁতিপাড়া গ্রামের দক্ষিণে বক্কেশ্বর নালার তটে কতকগুলি ছোট ছোট ঝরণা আছে। উহাদিগকে সাধারণতঃ বম্ বক্কেশ্বর বলে।

ক্রমশঃ—

* সখার পাঠকগণের স্মরণার্থ বলা আবশ্যক যে, গলন্ত বরফের উষ্ণতা শতাংশিক তাপমানের ০° এবং ফুটন্ত জলের উষ্ণতা ১০০°। শতাংশিক তাপমান যন্ত্রের অন্যান্য বিবরণ কোন ভাল পদার্থ-বিজ্ঞানে দেখ।

হেঁয়ালি।

গত জুলাই মাসের হেঁয়ালির উত্তর।

দেশলাইয়ের কাঠি।

ধাঁধা।

গত জুলাই মাসের ধাঁধার উত্তর।

আয়না।

নূতন।

আমরা দুই যমজ ভাই, পদ মর্য্যাদায় ভারি বড় লোক। আমরা জগতের আদিতে আছি, পৃথিবীতে আমাদিগকে খুঁজিয়া পাইবে না। অথচ আমরা দুই ভাই জলধর বাবুর জমিতে বাস করি। বলত আমরা কে?

সখা
সপ্তম ভাগ। ৯ম সংখ্যা।
সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯।

বিবিধ।

বিলাতে গ্লাসগো নগরের একজন দোকানদারের কেট্ ওয়াট্সন নামক একটী কন্যা এক স্থানে সমুদ্র জলে স্নান করিতেছিলেন। সমুদ্র জলে স্নান শরীরের পক্ষে খুব উপকারী। সেখানে আরও অনেকে স্নান করিতেছিল। কেট্ ওয়াট্সন্ স্নান করিয়া যখন কাপড় ছাড়িতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন যে, দুইটী বালক ও একটী বালিকাকে স্রোতে অনেকদূর ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, এবং তাহারা জলে ডুবিবার উপক্রম হইয়াছে। বালিকাটী এবং বালক দুইটীর এই বিপদ দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, এবং অনেক কষ্টে এক জনকে তীরের নিকটে লইয়া আসিলেন। কিন্তু ইহাতে এত দূর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তীরে আসিতে না আসিতে তিনি জলমগ্ন হইয়া গেলেন। বালক দুইটী এবং বালিকাটীর জীবন রক্ষা হইল বটে, কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও কেট্ ওয়াট্সন্‌কে পাওয়া গেল না। গত বৎসর ঠিক এই স্থানে অনেকে জলে ডুবিয়া গিয়াছিল, স্থানটা বড় ভাল নহে, স্রোতটা বড় খারাপ। কিন্তু এই সদাশয় মহিলা তাহা জানিয়াও নিজের জীবনের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, এই অনাথ বালক বালিকাদের রক্ষার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, এবং নিজ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

* *
*

ফরাসী দেশের রাজধানী পারিস নগরের এক হাঁসপাতালে, একটী অদ্ভুত রোগীনী আসিয়াছে। এই রোগীনী একটী পোনের বৎসর বয়স্ক বালিকা। ইহাকে দেখিলে বুদ্ধিমতী বলিয়া বোধ হয়, এবং দেখিতেও সুন্দর। এক এক সময়ে হঠাৎ তাহার মুখখানি বিকৃত হইয়া উঠে এবং দেখিতে বালিকার সেই সুন্দর মুখ বিড়ালের মুখের মত হইয়া যায়। কেবল যে মুখখানা বিড়ালের মত হইয়া যায়, তাহা নহে, সেই সময় বালিকার প্রকৃতিও বিড়ালের ন্যায় হয়। সে তখন চারি পায় চলিতে আরম্ভ করে, দ্রুতবেগে এদিক ওদিক দৌড়াইতে থাকে, বিড়ালকে আদর করিলে যেমন এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দ করে, ইহাকে আদর করিলে তেমনি শব্দ করিতে থাকে। রাগ হইলে আঁচড়াইয়া দেয়, ধরিলে কখনও হাত চাটিতে থাকে, কখনও কামড়াইয়া দেয়, বিড়ালের মত মিউ মিউ করিয়া ডাকিতে থাকে, সকল বিষয়েই বিড়ালের

মত ব্যবহার করিতে থাকে। কিছুকাল এই ভাব থাকে, পরে আবার সে যে মানুষ সেই মানুষ হয়। সেই বিড়ালের মুখ আবার মানুষের মুখ হয়, এবং বালিকাও বিড়ালের প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া স্থির শান্ত হয়। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে পূর্ব্বের কথা কিছু আর মনে করিয়া আনিতে পারে না, ঐ অবস্থায় যে সমস্ত কাজ সে করে তাহা তাহার কিছুই মনে থাকে না। বরং নিজের হাতে পায়ে আঁচড়ের দাগ এবং কাপড় প্রভৃতি ছেঁড়া দেখিয়া সে আরও আশ্চর্য্য হয়। বহুকাল পূর্ব্বে ফরাসী দেশের আর এক স্থানে এই রকম কয়েকটী স্ত্রীলোক দেখা গিয়াছিল, তখন তাহাদিগকে ডাইনী বলিয়া জীবন্ত পোড়াইয়া মারিয়া ফেলা হয়। কিন্তু এই বালিকাটীকে দেখিয়া ডাক্তারেরা বলিয়াছেন যে, ইহা এক প্রকার হিষ্টিরিয়া রোগ। প্রসিদ্ধ এবং বিজ্ঞ ডাক্তারগণ ইহার চিকিৎসার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন।

* * *

আমেরিকার এক স্থানে একটী মহিলা পক্ষী জাতির জন্য এক হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়াছেন। এইখানে রোগগ্রস্ত পক্ষীগণের চিকিৎসা হইবে। অনেক স্থানে মানুষেরই অনেক সময় চিকিৎসা হয় না, বিনা ঔষধে কত দুঃখী অনাথের জীবন যায়!

* * *

আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেটে তিন হাজার স্ত্রী-ডাক্তার আছেন। আমেরিকায় স্ত্রী-শিক্ষক, স্ত্রী-উকীল, স্ত্রী-ব্যারিষ্টার অনেক আছেন। গভর্ণমেণ্ট এবং অন্যান্য আফিসেও স্ত্রী-কর্ম্মচারীর অভাব নাই।

* * *

বোম্বাই প্রদেশের এক স্কুলে একটী সেভিং ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। বালকেরা এক পয়সা করিয়া এই ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া থাকে। এই ব্যাঙ্ক দ্বারা বেশ কাজ হইতেছে। বালকেরা নিজে খরচ করিবার জন্য যাহা পায় তাহা হইতে কিছু কিছু এই ব্যাঙ্কে জমা রাখে। ইহাতে তাহারা বাল্যকাল হইতেই মিত ব্যয় শিখিতেছে। ব্যাঙ্কে কিছু পয়সা জমিলে তাহা দ্বারা তাহারা ভাল ভাল পুস্তক কিনিয়া থাকে এবং অনাথ দুঃখীকে দান করিয়া থাকে।

* * *

আজ কাল অল্প বয়সেই অনেককে চস্‌মা চখে দিতে দেখা যায়। বালক এবং যুবকদের মধ্যে যাঁহারা চস্‌মা চখে দেন, তাঁহাদের অনেকেরই দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে বলিয়া দিয়া থাকেন—কেহ কেহ সখ্‌ করিয়াও দিতে আরম্ভ করেন, পরে সেই সখের জন্য চক্ষুদুটী পর্য্যন্ত হারাইয়া থাকেন। সে যাহাই হউক পূর্ব্ব হইতেই যদি সাবধান হওয়া যায় তাহা হইলে আর অল্প বয়সেই চক্ষের দৃষ্টি হারাইতে হয় না। একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার চক্ষের দৃষ্টি রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন।

(১) ক্ষীণ আলোকে কখনও পড়িবে না।

(২) আলোটা সম্মুখ বা পশ্চাৎ হইতে আসা উচিত নয়, পড়িবার সময় এক পাশ হইতে আলো আসা উচিত।

(৩) শরীর খুব যখন ক্লান্ত বোধ করিবে, অথবা রোগের জন্য শরীর যখন দুর্ব্বল রহিয়াছে, এমন অবস্থায় পড়িবে না।

(৪) কখনও শুইয়া পড়িবে না।

(৫) নিকটের কোন জিনিসের উপর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চাহিয়া থাকিবে না, যদি তাহা থাকিতে হয় তবে মধ্যে বিশ্রাম দিবে।

(৬) পড়িবার সময় উপুড় হইয়া পড়িবে না, অথবা মস্তকে যাহাতে অধিক রক্ত জমা হয় এমন কিছু করিবে না।

(৭) খারাপ ছাপা বা ক্ষুদ্র অক্ষরে ছাপার বই পড়িবে না।

(৮) রীতিমত শারীরিক পরিশ্রম করিবে।

(৯) কখনও তামাক এবং মদ খাইবে না।

সীতাকুণ্ড।

(১২৮ পৃষ্ঠার পর।)

এক্ষণে চট্টগ্রামের প্রস্রবণ বিষয়ে বলা যাইতেছে। চট্টগাম সহর হইতে ২৪ মাইল উত্তরে সীতাকুণ্ড নামক স্থান। উপরে বলিয়াছি যে, সীতাকুণ্ডের পাহাড়ের নাম চন্দ্রনাথ। তথায় এক শিবলিঙ্গ আছে। চন্দ্রনাথ পাহাড় হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে বাড়বকুণ্ড নামক এক প্রস্রবণ আছে। উহার আর একটি নাম বাড়বানল। চন্দ্রনাথের আবার তিন মাইল উত্তরে লবণাখ্য ও সূর্য্যকুণ্ড নামক আর দুইটি প্রস্রবণ আছে। এই তিনটি প্রস্রবণের জল শীতল। কিন্তু উহাদিগের জলের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার দাহ্যমান গ্যাস উথিত হইতেছে। ঐ ঐ স্থানের পাণ্ডারা ঐ গ্যাসকে দিবা রাত্রি জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। প্রস্রবণ বা ঝরণা বলিলে, পাঠক যেন মনে না করেন যে, জল উপর দিকে বেগে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। বর্ষাকালে প্রায় সমুদায় নদীর ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝরণা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ ঝরণার চারিদিক বাঁধাইয়া দিলে জল সেই কুণ্ডের মধ্যে প্রথমতঃ সঞ্চিত হয় এবং পরে জল বেশী হইলে নালা দিয়া নদীতে চলিয়া যায়। সর্ব্বত্রই এইরূপ ঝরণা বা প্রস্রবণ হইতে ধীরে ধীরে জল উপরে উঠিতেছে। তবে আইসল্যাণ্ড নামক দ্বীপের 'গাইসার' নামক উষ্ণ প্রস্রবণ হইতে জলের ফোয়ারার ন্যায় প্রবলবেগে উষ্ণ জল উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

বাড়বকুণ্ডের চারিদিক পাকা গাঁথুনি করিয়া একটি ছোট চৌবাচ্চা করা হইয়াছে। কয়েকটি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া জলে উপস্থিত হওয়া যায়।

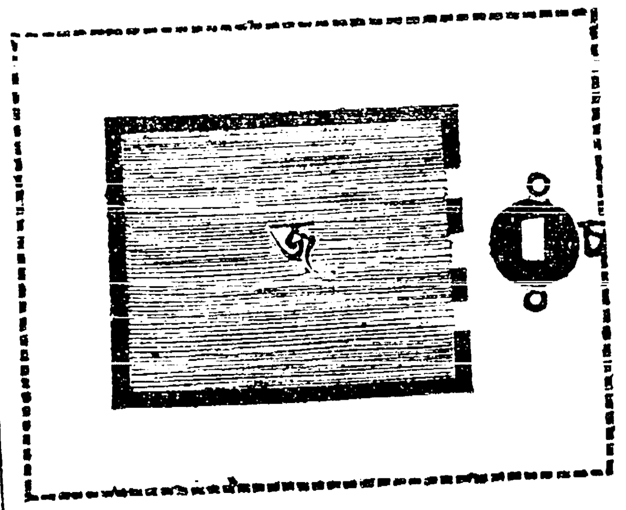

পার্শ্বের চিত্রে উহার জলের কুণ্ড এবং চুলি দেখান গেল। জ চৌবাচ্চায় জল এবং চ চুলি। চৌবাচ্চার দক্ষিণে আগুনের চুল্লি আছে, তাহা হইতে অনবরত আগুনের শিখা উঠিতেছে। নীচে, পার্শ্বে শীতল জল; জলের উপর আগুণের শিখা! অজ্ঞ লোকেরা একেবারে অবাক্‌ হইয়া যায়। লোকে এই ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয় যে, যে জলের উপর দিবা রাত্রি আগুন জ্বলিতেছে, সে জল উষ্ণ না হইয়া সাধারণ জলের ন্যায় শীতল হইল কিরূপে!

আর জল হইতে আগুণ উঠা, অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার! অবশ্য কোন পাতালপুরী দেবতার মহিমা! এই বিস্ময় জন্মাইতে তথাকার পাণ্ডা-ঠাকুরেরা বিশেষ যত্নবান। তাঁহারা যাত্রীকে অম্লান বদনে বলিবেন যে, চিরকাল এইরূপ তথাকার জলের উপর আগুণ জ্বলিতেছে। কেহ কখন জ্বালাইয়া দেয় নাই এবং কেহ কখন ঐ আগুণ নিবাইতে পারিবে না। তাঁহারা আগুণের উপর জল ছিটাইয়া দেখাইবেন যে, জলের দ্বারা ঐ আগুণ নিবাইবার নহে। যাত্রীরা ভয়ে বিস্ময়ে ঐ তীর্থ-স্থান চৌবাচ্চায় স্নান পূজাদি করে। অবগাহন করিবার সময় বাহ্মণ ঠাকুরেরা আরও বিস্ময় ও ভয় জন্মাইবার নিমিত্ত চৌবাচ্চার জল চুল্লির নিকট হইতে টানিয়া আনেন। তাহাতে জলের সঙ্গে সঙ্গে আগুণের শিখা আসিয়া স্নানকারীর গাত্রে লাগিয়া ক্ষণমাত্র জ্বলিয়া অন্তর্দ্ধান হয়। ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার আর কি হইতে পারে! ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা তথায় উপস্থিত থাকাতে আমরা বিশেষ কিছু পরীক্ষা করিতে পারিলাম না। কিন্তু সূর্য্যকুণ্ডে ও লবণাখ্যে পরীক্ষা করিবার বিশেষ সুযোগ হইল। ঐ দুই কুণ্ডের জলও শীতল এবং কুণ্ডের দক্ষিণে আগুণের চুল্লি। উহাদিগের জল অত্যন্ত লবণাক্ত। শুনা যায়, কুকী নামক তথাকার পাহাড়িয়া জাতিরা পূর্ব্বে ঐ জল ফুটাইয়া ব্যবহারোপযোগী লবণ বাহির করিত। এখন সে জল বৃথা নষ্ট হইতেছে। মোহন্ত অধিকারীগণ এক এক ঘর নির্ম্মাণ করিয়া কুণ্ডকে ঘরের ভিতর ফেলিয়াছে। আমরা প্রত্যূষে লবণাখ্য ও সূর্য্যকুণ্ড দেখিতে যাই। সেখানে লোকজন তখন কেহ ছিল না। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া চুলির উপর আগুণের শিখা দেখিতে পাইলাম। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা বলিয়াছিলেন যে, ঐ আগুণ কিছুতেই নিবাণ যায় না। আমরা ঐ কুণ্ডের জল লইয়া আগুণের চুলির উপর ছড়াইতে লাগিলাম। দুই চারিবার জল ঢালিবার পর দেখিলাম যে, সে সমস্ত কথা মিথ্যা। আগুণ নিবিয়া গিয়াছে। আমাদের নিকট দেশালাই ছিল। কুণ্ডের চুল্লির উপর দেশালাই জ্বালিয়া ধরিবামাত্র দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পুনর্ব্বার ঐ আগুণ নিবাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে কপাট বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিলাম। পথে অধিকারী ব্রাহ্মণদের সহিত দেখা হইল। তাঁহারা কয়েকটি যাত্রীকে জলের উপর আগুণ জ্বলা ইত্যাদি অগ্নি-দেবের মহিমা দেখাইতে লইয়া যাইতেছিল। আগুণ জ্বলা না দেখাইতে পারিয়া তাঁহারা যার-পর নাই অপ্রতিভ হইবেন, এই ভাবিয়া হাসিতে হাসিতে আমরা ফিরিয়া আসিলাম। বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির কত স্থানে এইরূপ কত কত ব্যাপার অনবরত সংঘটিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে? আমাদের চক্ষের সম্মুখেই প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে যে সকল ব্যাপার ঘটিতেছে তৎসমুদয় কম বিস্ময়কর নহে। কেবল প্রাতিদিন দেখাতে, ঐ সকল তত নূতন বোধ হয় না। প্রতি দিবস, সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত দেখিতেছ। ঐ দুই ব্যাপার কত বিস্ময়কর, তাহা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?

তামাকের অপকারিতা।

নিউইয়র্ক মেডিকেল জর্ণাল নামক একখানি আমেরিকা দেশীয় চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রে একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, সুরভি ও পতাকা সেই প্রবন্ধটীর ভাব সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, আমরা তাহাই পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলাম।

তামাক খাওয়াতে শরীরের কোন অপকার হয় কি না, সে বিষয় আজ কাল খুব আন্দোলন চলিতেছে। তামাকের পক্ষপাতীরা বলিতেছেন, তামাক খাইলে দাঁতের গোঁড়া শক্ত হয় এবং অম্লরোগের উপকার হয়। তামাকের বিপক্ষগণ বলিতেছেন যে, তামাক খাইলে ক্ষুধা নষ্ট হয়, নাড়ী ক্ষীণ হয়, হৃৎপিণ্ড অর্থাৎ রক্তাধারের কার্য্যের ব্যাঘাৎ হয় এবং অন্যান্য প্রকারে শরীরের ক্ষতি হয়।

তামাক ব্যবহার করিলে, শরীরের কোন অপকার হয় কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ৩৮ টী বালক সংগ্রহ করা হয়। এই ৩৮ টী বালকই তামাক খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তামাক খাইতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ইহাদের শরীরের স্বাস্থ্য মন্দ ছিল না, সাধারণতঃ লোকের যেরূপ স্বাস্থ্য দেখা যায়, তাহাদের সেইরূপই ছিল। এই বালকদের মধ্যে কেহ বা দুই মাস, কেহ বা চারি মাস, কেহ বা এক বৎসর এবং কেহ বা দুই বৎসর পর্য্যন্ত তামাক খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল এই বালকদের মধ্যে ২৭ জনের শরীরের স্বাস্থ্য তামাক খাইতে আরম্ভ করিয়া খারাপ হইয়া গিয়াছে, শরীর পরিপুষ্ট হইতে পারে নাই এবং তাহারা আর বাড়েও নাই। বত্রিশ জনের হৃৎপিণ্ড অর্থাৎ রক্তাধারের কার্য্য ভালমত চলিতেছে না, পরিপাক শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং মদ খাইবার জন্য একটা ইচ্ছা জন্মিয়াছে। তের জনের নাড়ীর গতি ক্ষীণ ও অনিয়মিত হইয়াছে। একজনের যক্ষাকাশ জন্মিয়াছে।

এই ৩৮ টী বালকই শেষে তামাক খাওয়া পরিত্যাগ করে। তামাক ছাড়িবার ছয় মাস পরে, প্রায় অর্দ্ধেক বালক রোগ-মুক্ত হইল, সমস্ত উপসর্গ ক্রমে দূর হইল। এক বৎসর পরে অবশিষ্ট সকলেই আরোগ্য লাভ করিল।

নিউজিল্যাণ্ড দেশে মাউরী নামক এক জাতি বাস করে। ইহারা নিউজিল্যাণ্ডের আদিম নিবাসী। ইউরোপীয়গণ প্রথম যখন নিউজিল্যাণ্ডে যান, তখন তাঁহারা এই মাউরী জাতিকে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক বলশালী দেখিয়াছিলেন, ইহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সুগঠিত, পরিপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিল। কিছুকাল পরে দেখা গেল যে, এই মহাবল-শালী জাতি ক্রমে অত্যন্ত ক্ষীণবল হইয়া যাইতেছে। ইহাদের আকার খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে শরীরের তেজ ও শরীরের বল কমিয়া গিয়াছে। ক্রমে ইহাদের এতদূর অবনতি হইয়াছিল যে, মনুষ্য জাতির মধ্যে ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা হীন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, ইহারা তামাক খাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং অত্যন্ত তামাক প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশে এই তামাকের ব্যবহারটা বড় বেশী। চক্ষের উপর অহরহঃ তামাক খাইতে দেখিয়া, ইহাদ্বারা যে কোন ক্ষতি হইতে পারে, সে কথাই আমাদের মনে হয় না। আমরা অনেক অল্পবয়স্ক বালককে

এই কু-অভ্যাসে রত দেখিয়াছি ; জানিনা আমাদের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও এ কু-অভ্যাস

আছে কি না। কিন্তু সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, তামাক খাওয়াতে শরীরের কোন উপকারই নাই, আরও নানারকম ক্ষতি হইয়া থাকে। ব্যারামের অবস্থায় তামাকের দ্বারা উপকার পাওয়া গিয়া থাকে ; কোন কোন ব্যারামে ঔষধের ন্যায় ইহা কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু ব্যারামের অবস্থায় যাহা উপকারী সুস্থাবস্থায় তাহা সর্ব্বদাই অপকারী, এ কথাটী মনে থাকা উচিত। যে বিষ এক কোঁটা খাইলে মুহূর্ত্তে মানুষের জীবন যায়, রোগে সেই বিষই আবার রোগ দূর করিয়া জীবন রক্ষা করে। তাই বলিয়া কি বিষ খাওয়া অভ্যাস করা উচিত ? কলিকাতার রাস্তায় অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি অল্পবয়স্ক বালকেরা চুরুট মুখে করিয়া রেল গাড়ীর এঞ্জিনের ন্যায় অনবরত ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে চলিয়াছে। এই সকল বালকেরা জানে না যে, বাল্যকালে কু-সঙ্গের দোষে যে কু-অভ্যাস করিতেছে, ইহাতে তাহাদের আয়ু ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত ডাক্তার তামাকের সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ—

যে তামাক খাইলে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য ভালরূপ হয় না। সুতরাং শরীরের উপযুক্ত রূপ রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত হয়। স্মরণ শক্তি হ্রাস হয়, পরিপাক শক্তি নষ্ট হয়, মুখশোষ উপস্থিত হয়। বাল্য বয়সে তামাক খাইতে আরম্ভ করিলে শরীর বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হইতে পারে না আকার খাট হইয়া যায়।

কৃষক।

মানবের হিতকারী সুহৃদ সুজন,
কে আছে এমন আর কৃষক যেমন ?
দিবানিশি অবিরত করি প্রাণপণ,
কত মতে করিতেছে কল্যাণ সাধন !
আপনি জঠর-জ্বালা সহি অকাতরে,
উদর পূরিয়া অন্ন যোগায় অপরে !
যব, গম, ছোলা, ধান শস্য অগণন,
যা খাইয়া করি মোরা জীবন ধারণ,

রসনার তৃপ্তিকর নানা জাতি ফল,
আস্বাদন মাত্রে হয় শরীর শীতল !
জীবন ধারণ আর বিলাসের তরে,
সে সকল বস্তু চায় মানব নিকরে,
সকলি যোগায় ওই কৃষক সুজন !
এমন সুহৃদ বল আছে কোন্ জন ?
নাহি চায় বেশ-ভূষা সম্পদ-সম্মান !
সংসারের সুখ ভোগে নাহি যার প্রাণ !
মোটা চাল মোটা ভাত ব্যঞ্জন-বিহীন,
পরম অমৃত জ্ঞানে খায় চিরদিন !
হাল গরু "সার-গাদা" সম্বলের সার !
তাতেই সাধিছে কত পর উপকার !
পরের চিন্তায় সদা ব্যাকুল হৃদয়—
কেমনে রহিবে সুখে লোক সমুদয়,
কেমনে হইবে দেশে শস্য সু-প্রচুর,
দেশের এ অন্ন-জ্বালা হইবেক দূর !
দরিদ্র কাঙ্গাল আর দিন-হীন জনে,
উদর পূরিয়া অন্ন পাইবে কেমনে ?
হাহাকার যাবে দূরে উথলিবে সুখ,
দেখিবে সবার আহা হাসি ভরা মুখ !
এহেন ভাবনা যার অন্তরে সদাই,
তাহার সমান লোক পৃথিবীতে নাই !
অপরের দুঃখ দেখি যার কাঁদে প্রাণ,
তিনিই মহৎ ভাই তিনিই প্রধান !
সরল সুজন ওই কৃষকের মত,
একাধারে আছে বল কার গুণ এত ?
"চাষা" বলি যে তাহারে গালি দেয় ভাই,
তাহার সমান "চাষা" ত্রি-ভুবনে নাই।

দস্যুবীর তাঁতিয়া।

তাঁতিয়া ভীলের নাম তোমরা অনেকেই শুনিয়া থাকিবে। এতদিন পরে তাঁতিয়া ধরা পড়িয়াছে। এই চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত ইংরাজ পুলিষ এবং হোলকার রাজ্যের পুলিষের চখে ধূলা দিয়া দস্যুবীর তাঁতিয়া সদর্পে মধ্য ভারতবর্ষে দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেছিল ; সহস্র চেষ্টা করিয়া পুলিষ ইহাকে ধরিতে পারে নাই। ইহাকে ধরিতে যাইয়া ইহার চাতুরীতে পুলিষ অনেক সময়ে অনেক লাঞ্ছনা পাইয়াছে। মহাপরাক্রান্ত ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই ভীল দস্যুর উৎপাত, অত্যাচার, কৌশল ও চাতুরীতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দস্যুবীর তাঁতিয়া অল্পদিন হইল ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু সে পুলিষের কৌশল বা পুলিষের গুণে নহে, তাঁতিয়া নিজেই ধরা দিয়াছে বলিলে হয় !

তাঁতিয়াকে এখন জব্বলপুর জেলে রাখা হইয়াছে। সেইখানে পুলিষের নিকট সে নিজের জীবনের যে কাহিনী বলিয়াছে, তাহাতে তাহার জীবনের প্রধান প্রধান প্রায় সকল ঘটনারই উল্লেখ আছে। তাঁতিয়ার আত্ম-বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

"নিমার জেলার বিরোদা গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমার যখন ত্রিশ বৎসর বয়স তখন বিরোদা পরিত্যাগ করিয়া পোথার নামক স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করি। সেইখানে এক ব্যক্তির সঙ্গে একত্রে কতকগুলি জমি আমি চাষ করিতাম। কয়েকমাস পরে একটা অন্যায় কাজ করিয়া পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হই। মাজিষ্ট্রেট সাহেব

আমাকে কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক বৎসরের কারাদণ্ড দেন। নাগপুর সেণ্ট্রাল জেলে আমাকে লইয়া যাওয়া হইল, সে আজ পোনের বৎসরের কথা।

কারামুক্ত হইয়া আমি প্রায় তিন মাস পোথারে ছিলাম। কিন্তু পোথারের রাজপুতেরা কোন কারনে আমার চরিত্র বিষয় সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিল। আমি দেখিলাম পোথারে থাকিলে কোন একটা বিপদ ঘটিতে পারে, সুতরাং পোথার পরিত্যাগ করিয়া হরিপুর গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলাম। এই হরিপুর গ্রামে আমি প্রায় দেড় বৎসর ছিলাম। হরিপুরের কাছে, বারি গ্রামে একটা চুরী হয়। পুলিষ অনুসন্ধান করিয়া আমাকে এবং বীজনীয়া নামক আর এক জনকে সন্দেহ করিয়া চালান দেয়। পুলিষ এজাহার দেয় যে, আমরা চুরী করিয়াছি, এবং পুলিষ যখন আমাদিগকে ধরিতে যায় তখন তরওয়াল খুলিয়া আমরা তাহাদিগকে আক্রমণ করি। চুরীর দাবীতে আমরা খালাষ পাই, কিন্তু তরওয়াল খুলিয়া পুলিষকে বাধা দিয়াছিলাম, এই অপরাধে আমাদের তিন মাস করিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড হয়। কারামুক্ত হইয়া আমি হোলকার রাজ্যে সিউনা গ্রামে গিয়া বাস করি, এবং আবার চাস বাস আরম্ভ করি। একদিন সোভান ভীল নামক এক ব্যক্তির বাড়ী হইতে কতকগুলি জিনিস চুরী যায়। পুলিষ অনুসন্ধান করিয়া তাহার কতকগুলি পোথার গ্রামের জালিম নামক এক ব্যক্তির বাড়ী হইতে বাহির করে। জালিম বলে যে, আমি তাহাকে ঐগুলি দিয়াছি। সুতরাং পুলিষ আমাকে ধরিবার জন্য সিউনা গ্রামে আসে। পুলিষ সিউনা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি গৃহ ছাড়িয়া জঙ্গলে পলায়ন করিলাম। আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী ছিলাম, কিন্তু পুলিষের হাতে পড়িলে নিশ্চয়ই আবার জেলে যাইতে হইবে এই ভয়ে আমি পলাইয়াছিলাম। পোথারের রাজপুতদের আমার উপর পূর্ব্বের আক্রোশ ছিল; আমাকে জব্দ করিবার জন্য তাহারাই জালিমকে পুলিষের নিকট এ প্রকার বলিতে শিখাইয়া দেয়। প্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত আমি জঙ্গলে জঙ্গলে বেড়াইলাম। এই সময় আমি নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে চুরী ইত্যাদি করিয়া জীবন ধারণ করিতাম, কারণ তখন আর অন্য কোন উপায় ছিল না। সিউনা গ্রামে আমি চাস বাস করিতাম, স্থির শান্তভাবে সেখানে জীবন যাপন করিতেছিলাম। কিন্তু পুলিষের দৌরাত্ম্যে আমায় তাহা পরিত্যাগ করিতে হইল। সৎপথে থাকিয়া যে জীবন যাপন করিব সে পথ ক্রমে বন্ধ হইল। পোথারে যাহার সহিত আমি একত্রে চাস বাস করিতাম একদিন তাহার ভাই কালুকে, আমি যে বনে পলাইয়াছিলাম, সেই বন দিয়া যাইতে দেখিয়া, তাহাকে ধরিয়া ছয় দিন পর্য্যন্ত আটক করিয়া রাখিলাম। ছয়দিন পরে কালুর পিতা, মেহাল নামক এক ব্যক্তির হাতে আমাকে একশত টাকা পাঠাইয়া দিলে, আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। ইহারই অল্পদিন পরে মোহন পাটেল নামক পোথারের এক জন লোক সিউনাতে আসে। সিউনার নিকটস্থ বনমধ্যে একদিন আমার সহিত তাহার দেখা হয়, সে আমাকে বলে যে, তাহার মাতা তাহাকে প্রহার করিয়াছে, এই জন্য সে বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছে। সে আমার সহিত থাকিতে চাহিল। ইহার চারি দিন পরে আমরা খাজোরা গ্রামে বীজনীয়ার বাড়ীতে যাই, এবং সেখান হইতে পোথারে যাই। কালুর পিতা সরদার পাটেল পরদিন প্রাতঃকালে, মোহন এবং হিরবলের সঙ্গে আমার সহিত দেখা করিতে আসে। সরদার আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, আমি কেন এমন করিয়া বনে বনে বেড়াইতেছি। তাহাতে আমি বলিলাম যে, আমি আবার পোথারে আসিয়া বাস করিতে পারি যদি সে ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিয়া দেয় যে, আমি তাহার পুত্র কালুকে আবদ্ধ করিয়া রাখি নাই। সে সম্মত হইয়া আমাকে তাহাদের বাড়ীতে লইয়া গেল। তাহাদের বাড়ীতে পুলিষের লোক ছিল, আমি তাহা জানিতাম না। যাইবামাত্র পুলিষের হেড কনেষ্টবল আমাকে গ্রেপ্তার করিল, এবং আমার হাত পা বাঁন্ধিয়া খান্দোয়া চালান দিল। আমাকে আবার জেলে যাইতে হইল। দৌলিয়া নামক আর এক জনকেও এই সঙ্গে চালান দেয়, তাহারও মেয়াদ হইল। পরদিন বীজনীয়াকেও গ্রেপ্তার করিয়া জেলে দিল। আমরা তিনজনে তিনদিন পর্য্যন্ত জেলে ছিলাম। চারিদিনের দিন জেল ভাঙ্গিয়া আমরা তিনজনেই পলাইলাম। জেলের দেয়ালের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িবার সময় আমি চিৎকার করিয়া জেলের লোকদের ডাকিয়া বলিয়া গেলাম যে, আমরা পলায়ন করিলাম। জেল হইতে বাহির হইয়া আমরা মিনার জেলার ভাণ্ডারিয়া গ্রামের দিকে চলিলাম, এবং সেখান হইতে জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় লইলাম। ক্রমে অনেকগুলি ভীল আসিয়া আমার দলে যোগ দিল। প্রথমে চুরী আরম্ভ করিলাম, তাহার পর রাহাজানি, দস্যুবৃত্তি; তার পর রীতিমত ডাকাতি আরম্ভ করিলাম। এই এগারো বৎসর হইল খাণ্ডোয়া জেল হইতে আমরা পলায়ন করিয়াছি।

নিমার জেলায় ভিওইফল গ্রামে আমরা প্রথম ডাকাতি করি, এই ডাকাতিতেই প্রথম খুন হয়। বীজনীয়া দৌলিয়া এবং আরও পাঁচ ছয় জন ভীল সঙ্গে লইয়া আমি সন্ধ্যার সময় গ্রামে প্রবেশ করি। আমরা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী, বোম্বাই হইতে আসিতেছি, এই বলিয়া গ্রামের লোকদিগকে রসদ যোগাইতে বলি। তাহারা প্রথমে অস্বীকার করে, কিন্তু হিম্মত পাটেল আমাকে চিনিতে পারিয়া রসদ দিতে স্বীকার করে। বীজনীয়ার সঙ্গে হিম্মতের পূর্ব্বের বিবাদ ছিল, কথায় কথায় ইহাদের মধ্যে ঝগড়া উপস্থিত হয়, এবং বীজনীয়া হঠাৎ হিম্মতকে গুলি করিয়া ফেলে। বীজনীয়া অত্যন্ত বদরাগী লোক ছিল, রাগিলে আমি তাহাকে শাসন করিয়া রাখিতে পারিতাম না। ইহার পর দলের আর আর সকলে গ্রামে আগুন লাগাইয়া দিল, এবং লুঠপাঠ করিয়া আমরা তথা হইতে চলিয়া গেলাম।

হাঙ্গিরের ডাকাইতিতে আমি ছিলাম। আমরা গ্রামে আগুন লাগাইয়া দিয়া লুঠ করিতেছি, এমন সময় জব্বর সিং কতকগুলি লোক লইয়া আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল। জব্বর সিং গুলি করিয়াছিল বটে, কিন্তু আমাদের কাহারও গায়ে লাগে নাই; আমার দলের তিন জন তখন জব্বর সিংএর দলের উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। একটা গুলি জব্বর সিংএর গায়ে লাগে, শুনিয়াছি তাহাতেই পরে তাহার মৃত্যু হয়। আমি নিজে গুলি করি নাই। মূলগাঁয়ের ডাকাইতিতে আমি ছিলাম না। বদ্রিয়া তাহার নিজের দল লইয়া এই ডাকাতি করে, এই ডাকাতিতে একজন পুলিশ কনেষ্টবল খুন হয়। বদ্রিয়া আমার দলেই ছিল, কিন্তু বিবাদ করিয়া কিছুদিন পৃথক ভাবে ছিল। শেষে আবার আমরা একত্র হই। হোলকারের রাজ্যে মুকুন্দ ভীল আমার দলের লোকদের দ্বারা হত হয়। কিন্তু আমি সে সময় উপস্থিত ছিলাম না। মুকুন্দকে আমি চিনিতাম। সে

গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের সন্ধান বলিয়া বেড়াইত।

সুরগান বানজুরীর ডাকাতিতে আমি ছিলাম। বাপু মং কনেষ্টবল, ডুলিয়া ও উলিয়া নামক বদ্রিয়ার দুইজন আত্মীয়কে গ্রেপ্তার করাইয়া দেয় এই জন্য আমরা তাহার নাক কাটিয়া দি। আমি তাহার পোষাক এবং চাপরাস কাড়িয়া লই। পোথার গ্রামের মহিম পাটেলদের সঙ্গে আমার নিজের অনেকদিন হইতে বিবাদ ছিল। আমরা একদিন মহিমের মাতা ও তাহার স্ত্রীকে গ্রামের বাহিরে লইয়া গিয়া, মহিমের মাতার নাক কাটিয়া দি, এবং তাহার স্ত্রীর গহনা কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দি। বিদার জেলায় ও আমার দলের একজন লোক কনেষ্টবলের নাক কাটিয়া দেয়। আমরা দেখিলাম কনেষ্টবল সাহেব বনের মধ্যে রোঁদ ফিরিতে যাইতেছেন, আমরা তাহাকে ধরিয়া তাহার পোষাক চাপকান এবং বন্দুক কাড়িয়া লইয়া, নাক কাটিয়া ছাড়িয়া দি। হোসঙ্গোবাদ জেলায় এক বনের মধ্যে আমরা ছিলাম এমন সময় হঠাৎ পুলিষের

লোকেরা আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে। তাহারা আমাদিগের উপর গুলি করিয়াছিল, কিন্তু কিছু করিতে পারে নাই।

যে সকল ডাকাইতি আমি করিয়াছি বলিয়া লোকে জানে, তাহার অর্দ্ধেকেরও বেশী বদ্রিয়া তাহার নিজের দল লইয়া করিয়াছে; এবং অনেক লোকে আবার আমার নাম লইয়াও ডাকাতি করিয়াছে। প্রায় এক বৎসর হইল একটা সামান্য জিনিস লইয়া বদ্রিয়ার সহিত আমার বিবাদ হয়। এবং সে বার জন সঙ্গী লইয়া দল হইতে বাহির হইয়া যায়। আমার দলে নয় জন মাত্র থাকে। দেশীয় পুলিষ কনেষ্টবল ভিন্ন, কোন সাহেব কর্ম্মচারীর সহিত আমার কোন দিন সাক্ষাৎ হয় নাই। এইখানে তাঁতিয়া সত্য কথা বলে নাই। আমরা জানি অনেক সাহেব পুলিশের কর্ম্মচারী তাঁতিয়ার কৌশলে ও চাতুরীতে অনেকবার অপদস্থ হইয়াছেন। তাঁতিয়া বলিতেছে,—গত দুই বৎসর পর্য্যন্ত হোলকারের এবং ইংরাজ রাজ্যের পুলিষের দৌরাত্ম্যে আমি কোথাও স্থির হইয়া থাকিতে পারি নাই। এক স্থান হইতে আর এক স্থানে, এক জঙ্গল হইতে আর জঙ্গলে,—পুলিশের হাত এড়াইবার জন্য এই রকম ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। অবশেষে আমি এতদূর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, শেষে আমার ধরা দিবার জন্য একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল। এখন বয়সও হইয়াছে, চক্ষের দৃষ্টি শক্তিও কমিয়াছে; শরীরে আর তেমন পূর্ব্বের মত বল নাই। আমি প্রথমে যখন এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তখন আমি ত্রিশ ক্রোশ রাস্তা অনায়াসে চলিয়া যাইতাম, এখন আমি দশ ক্রোশের অধিক পারি না। গবর্ণমেণ্টের নিকট আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার করিবার নিমিত্ত আমি কত লোককে কত টাকা দিয়াছি। কিন্তু কেহই কিছু করে নাই। হোলকারের রাজ্যেই আমি অনেক সময় কাটাইয়াছি। সেখানে আমার কয়েকটী আশ্রয় স্থান ছিল। আমাকে রীতিমত কেহ কেহ টাকা ও রসদ যোগাইত। যখন অভাবে পড়িতাম, তখন রেলগাড়ী লুঠ করিতাম।

প্রায় ছয় মাস হইল হোলকারের অধিকার ভুক্ত গণপত নামক একজন রাজপুতের সহিত আমার পরিচয় হয়। তাহার নিকট হইতে আমি সময় সময় টাকা ও রসদ প্রভৃতি পাইতাম। গবর্ণমেণ্ট আমাকে যাহাতে ক্ষমা করেন, আমি সেই জন্য তাহাকে চেষ্টা করিতে বলিলাম। সে বলিল যে রস্থলদার মেজর ঈশ্বরী প্রসাদের নিকট বলিবে। পরে যখন আর একবার আমি গণপতের বাড়ী যাই, তখন সে বলে যে ঈশ্বরী প্রসাদকে সে বলিয়াছে, এবং ঈশ্বরীপ্রসাদ আমার সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছেন। আমি ঈশ্বরী প্রসাদের সহিত একস্থানে সাক্ষাৎ করিলাম। ঈশ্বরী প্রসাদ তিনশত লোক সঙ্গে করিয়া আমার সহিত দেখা করিতে আসিল, আমি একাকী এক পর্ব্বতের উপর থাকিয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিলাম। ঈশ্বরীপ্রসাদ বলিলেন যে এক মাস মধ্যে আমাকে সংবাদ দিবেন। এক মাস হইতে না হইতেই আমি ছয়জন অনুচর লইয়া গণপতের বাড়ী গেলাম। দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাবে জীবন যাপন করিবার জন্য আমার অত্যন্ত ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল। গণপত আমার সঙ্গের চারি জন লোককে গ্রামের মধ্যে রসদ আনিবার জন্য পাঠাইতে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল। আমি এবং ননকু নামক আমার একজন অনুচর কেবল গণপতের বাড়ী রহিলাম। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে ঈশ্বরী প্রসাদ এখনও

কোন সংবাদ পাঠান নাই। পরে কথায় কথায় আমার বন্দুকটা হাতে লইল, এবং হঠাৎ এক সংকেত করামাত্র ঈশ্বরী প্রসাদের লোকেরা আসিয়া আমাকে এবং ননকুকে বাঁধিয়া ফেলিল। আমাদিগকে বাঁধিয়া থারগাঁয়ে ঈশ্বরী প্রসাদের নিকট চালান দিল। গণপত আমার নিকট হইতে অনেক সময় অনেক টাকা পাইয়াছে। কিন্তু অবশেষে এই প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহার প্রতিফল দিল!

বদ্রিয়া বড় ভয়ঙ্কর লোক, সে মানুষ হত্যা করিতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। আমি নিজের হাতে কখনও নর হত্যা করি নাই। আমি ধনীর টাকা লইয়াছি, কিন্তু তাহা দরিদ্রদিগকে দান করিয়াছি। গত বৎসর নর্ম্মদা নদীর তীরে ব্রাহ্মণ এবং সাধুদিগকে আমি ছয় হাজার টাকা বিতরণ করিয়াছি। দরিদ্র চাসাদিগকে হাল গরু কিনিবার জন্য টাকা দিয়াছি, এবং গরীব দুঃখীদিগকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছি।

তাঁতিয়ার আত্মকাহিনী এইখানে শেষ হইয়াছে। তাঁতিয়া দস্যুবৃত্তি ডাকাতি প্রভৃতি নানা অপরাধে অভিযুক্ত, সুতরাং খুব কঠিন দণ্ড হইবারই কথা। কিন্তু তাঁতিয়া ডাকাইত হইলেও, তাহার প্রতি কেমন একটা সহানুভূতির ভাব হয়। ইহার কারণ এই যে, তাঁতিয়া কেবল ডাকাইত নহে, তাহার ভিতরে অনেকগুলি সদ্গুণ ছিল। তাহার অপরিমিত সাহস ছিল, এই সাহস এবং নিজ শরীরের উপর নির্ভর করিয়া সে অনেক অদ্ভুত কার্য্য করিতে পারিয়াছে। তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, চতুরতা ও কৌশলেই সে এতদিন পরাক্রান্ত ইংরাজ ও হোলকারের কর্ম্মচারীদিগের চক্ষে ধূলা দিয়া এবং পদে পদে অপদস্থ করিয়া নিজের ইচ্ছামত কাজ করিয়া বেড়াইতে পারিয়াছে। কিন্তু তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান গুণ এই যে সে দস্যু ডাকাতিদিগের ন্যায় নীচ ও নিষ্ঠুর হৃদয় ছিল না। দরিদ্রকে সে কখনও নিপীড়ন করে নাই। ধনীর অর্থ লুঠ করিয়া দরিদ্রদিগকে বিলাইয়া দিত। অভাবে লোককে আশ্রয় দিত, অনাথ অসহায় গরীবদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিত। ডাকাতি প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকাতে তাঁতিয়ার মনে মনে বোধ হয় অনুতাপ হইত। কারণ দস্যুবৃত্তি ও ডাকাতি পরিত্যাগ করিয়া সৎভাবে জীবন যাপন করিবার জন্য সে কতবার কত প্রকারে চেষ্টা করিয়াছে, এবং শেষে সেই চেষ্টা করিতে গিয়াই সে আজ ধরা পড়িয়াছে। ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাঁতিয়া ভীল আজ দস্যু ও ডাকাত;—অনুকূল ঘটনায় পড়িলে তাহার হয়ত অন্য প্রকার অবস্থা দেখিতাম!

রাজা বাবু।

হরিশপুরের চট্টোপাধ্যায়েরা বনেদি বড়লোক। দেশে প্রকাণ্ড তিন মহল বাড়ী; কলিকাতায়ও তিন চারিখানি বাড়ী আছে। জমিদারীতে সত্তর আশী হাজার টাকা বছর আদায় হয়; কিন্তু বাবুদের কর্ম্মচারী ও অনুগত লোকেরা বলে যে, বাবুর আয় লক্ষ টাকার কম নয়। বলুক সেজন্য তাদের সঙ্গে কলহ করার কোন দরকার নাই। বাবুরা যে বড়লোক এটা ঠিকই কথা। বাবুদের বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হয়, তা ছাড়া কলিকাতা হইতে বাবুর বন্ধুগণ মধ্যে মধ্যে হরিশপুরে গিয়া থাকেন, তাতেও এক একটা পার্ব্বণের অপেক্ষা বড় কম ঘটা হয় না। আর যখন জেলার মাজিষ্ট্রেট বা পুলিষ সাহেব বা কলিকাতার কোন সওদাগর দলের সাহেব শিকারে বা অন্য কোন কাজে হরিশপুর যান, তখন ত আর কথাই থাকে না। বাঙ্গালীর প্রধান উৎসব দুর্গোৎসবের অপেক্ষাও তখন প্রকাণ্ড উৎসবের আয়োজন হয়। এই গৌরাঙ্গদের উৎসবের কাছে তেত্রিশ কোটী দেবতার উৎসবও দাঁড়াইতে পারে না। রামজীবন বাবু অবিশ্রান্ত সাহেবদিগকে খানা নাচ এবং শীকারের জন্য ঘোড়া হাতী, লোকজন, গোলা গুলি প্রভৃতি যাবতীয় জিনিষ যোগাইয়া গভর্ণমেণ্ট হইতে রাজা বাহাদুর উপাধি পাইয়াছেন। সুতরাং এখন আর কেহ চাটুয্যে বাবুদের বাড়ী বলে না,—রাজাবাবুদের বাড়ী বলে। শুনিয়াছি না কি রামজীবন বাবু উপাধি পাইবার পর হইতে যদি কেহ চাটুয্যে বাবুদের বাড়ী বলিত, আর যদি সেই কথা তাঁর কানে উঠিত, তবে তিনি তাহাকে সে অপরাধের জন্য জব্দ করিতে ক্রটী করিতেন না। লোকে ঠেকিয়া শেখে, দেখিয়াও শেখে। গ্রামের কত লোক ঠেকিয়া শিখিল, বক্রী সকলে ইহাদের দেখিয়া শিখিল। আর কেহ চাটুয্যে বাবুদের বাড়ী ভুলিয়াও বলিত না। এখন রাজা বাবু নামই প্রসিদ্ধ। রাজাবাবুর দুই ছেলে এবং একটী মেয়ে, বড় ছেলের বয়স ২০।২১, ছোটটীর বয়স ১৫, মেয়েটী দশ বৎসরের। রামজীবন বাবুর পরিবার খুব বড় নয়; দুটী ছেলে একটী মেয়ে, স্ত্রী, এবং স্ত্রীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমেশ চন্দ্র, আর দূর সম্পর্কীয়া রামজীবন বাবুর এক ভগ্নী। বড় ছেলে দেবেন্দ্র নাথ কলিকাতার হিন্দু স্কুল হেয়ার স্কুল এবং আরও দুইটী স্কুল হইতে উপর্য্যুপরি চারিবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল হইয়া সম্প্রতি পরীক্ষার আশা ত্যাগ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ নরেন্দ্র নাথ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবেন। দেবেন্দ্র নরেন্দ্রতে সকল বিষয়েই তফাৎ। দেবেন্দ্র চারিবার পরীক্ষা দিয়াছেন বটে কিন্তু কি কি পুস্তক পড়িয়া পরীক্ষা দিতে হয় সে সকলগুলির নামও তিনি জানিতেন না। নরেন্দ্র বাল্যকাল হইতেই লেখা পড়ায় খুব মনোযোগী, সে প্রতিবার পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া পারিতোষিক পায়, স্কুলের মধ্যে সে সকলের চেয়ে ভাল ছেলে। প্রকৃতি সম্বন্ধেও দুই জনে অনেক প্রভেদ। বড় লোকের ছেলে বলিয়া দেবেন্দ্রের যথেষ্ট অহঙ্কার, নরেন্দ্র অতিশয় বিনয়ী; দেবেন্দ্র বড় লোকের ছেলেরা সাধারণতঃ যে প্রকার দয়া-মায়া-হীন, স্বার্থপর এবং অসৎ হইয়া থাকে তাই; কিন্তু নরেন্দ্র অতিশয় সৎ, লোকের জন্য তাহার খুব দয়া মায়া, অন্যের দুঃখ দেখিলে সে নিজের বস্ত্র খুলিয়া দেয়। রামজীবন বাবু ঘোর বিষয়ী লোক। প্রজাদিগকে যারপর নাই পীড়ন করেন, গরিব নিরন্ন প্রজা পীড়ন করিয়া টাকা আদায় করিয়া তাহা দ্বারা সাহেবদের ভোজ দেন; পৈতৃক বাসবাড়ী হইতে উঠাইয়া দিয়া নিজের আস্তাবল তৈয়ারী করেন। গরীব দুঃখী এক মুঠা অন্ন পায় না, কিন্তু সাহেবদের খানায়—বাবুদের ভোজে প্রতিদিন শত শত টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

(২)

হরিশপুরের পূর্ব্ব প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর। কুটীরখানির এক দিকের চালে খড় নাই, এবং

যে সামান্য বেড়া আছে তাহাও নিতান্ত জীর্ণ। একটী বিধবা স্ত্রীলোক নয় বৎসর বয়স্ক একটী কন্যা এবং চারি বৎসরের একটী পুত্র লইয়া সেই কুটীরে বাস করে। ইহারা অতি নিঃস্ব, মেয়েটী ও ছেলেটীকে যে দুবেলা দুমুঠা খাইতে দিবে বিধবার সে সংস্থান নাই। বাড়ীতে দুই চারিটী নারিকেল ও শুপারীর গাছ আছে, তাহাতে যে ফল হয়, তাহাই বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে দিন-পাত করে। হরিশপুরের রাজা বাবুরা ইহাদের জমিদার। আজ দুই বৎসর হইল বিধবার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে; তার পর হইতে ইহারা আর জমিদারের খাজনা দিতে পারে নাই। দুবেলা অন্ন জুঠে না, খাজনা দিবে কোথা হইতে? জমি-দারের পেয়াদা প্রতিদিন আসে প্রতিদিনই ফিরিয়া যায়। দিগম্বর সরকার তহশিলদার মহাশয় এক-দিন মহা বিরক্ত হইয়া পেয়াদাকে নায়েবী রকমের তিরস্কার করিয়া কড়া হুকুম দিয়া খাজনা আদায়ের জন্য পাঠাইলেন।

বেলা দুই প্রহর হইয়াছে। সেই কুটীর মধ্যে বিধবা এককোণে বসিয়া চক্ষের জল ফেলিতেছে, "মা খেতে দে, বড় ক্ষিধে পেয়েছে, মা খেতে দে," বলিয়া অবোধ বালক মাতাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, মাতা নীরবে ছেলের সেই অত্যাচার সহ্য করিতেছেন, ক্ষুধার্ত্ত ছেলের হাহা-কারে তাঁর বুক ফাটিয়া যাইতেছে। দুই প্রহর বেলা হইয়াছে ছেলেটীকে এখনও কিছু খাইতে দিতে পারেন নাই, ক্ষুধায় অস্থির হইয়া কাঁদিতেছে আর বলিতেছে, "মা খেতে দে।" অবোধ বালক জানে না যে, মা কোথা থেকে খেতে দেবেন। তিনি এক একবার ছেলেকে বুঝাইতেছেন "বাবা, লক্ষ্মী এই এলো আর কি, এলেই তোমাকে খেতে দেবো।" কিন্তু আবার ছেলের কষ্ট আর দেখিতে না পারিয়া নিজেই চক্ষের জল ফেলিতেছেন। বাহিরে শব্দ হইলেই বাহিরে গিয়া দেখিয়া আসিতে-ছেন, লক্ষ্মী এলো কি না, লক্ষ্মী বিধবার মেয়ে। কত-ক্ষণ এই ভাবে কাটিল, তার পর একবার সত্য সত্যই বাহিরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। লক্ষ্মী আসি-য়াছে মনে করিয়া ছেলেকে বলিলেন, "বাবা এই-বার তোমাকে খেতে দেবো," এই বলিয়া বিধবা তাড়াতাড়ি চক্ষের জল মুছিয়া বাহিরে আসিলেন। কুটীরের দরজায় আসিয়া আর তাঁহার পা চলিল না। তিনি অমনি বসিয়া পড়িলেন। দেখিলেন লক্ষ্মী নয়—জমিদারের পেয়াদা। নির্দ্দয় জমিদারের নির্দ্দয় পেয়াদা বিধবাকে যথেচ্ছা কটু বলিয়া তহ-শিলদার মহাশয়ের তিরস্কারের ঝাল ঝাড়িল, তার পর বলিল যে, খাজনা না দিলে আজ কোন মতেই ছাড়িব না, যে প্রকারেই হউক খাজনা দিতেই হইবে। পেয়াদা সাহেবের তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া ছেলেটী বাহিরে আসিল, সে লক্ষ্মীকে না দেখিয়া আরও কাঁদিয়া উঠিল, বলিল "কৈ মা আমায় খেতে দিলি না, দিদিত আসে নাই?" বিধবা চারিদিকে এই বিপদ দেখিয়া কেবল চখের জল ফেলিতে লাগিলেন। তিনি রামসিং পেয়াদাকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া বুঝাইলেন; বলিলেন, "বাপু রামসিং এই দেখ এত বেলা হইয়াছে, ছেলেটীকে জলবিন্দুও দিতে পারি নহে, ক্ষিধেয় ছেলেটা ছট্‌ফট্ করিতেছে, আমার কি কিছু আছে? আমি কোথা থেকে খাজনা দিব। আর কএকটা দিন বিলম্ব কর আমি চেষ্টা করিয়া দেখি।" রামসিং পেয়াদা তাহাতে ভুলিল না; বিধবার অনুনয় বিনয় বা চক্ষের জলে তাহার হৃদয় টলিল না। সে বলিল, "সে কথা আমি শুনিব না, তোমার ছেলে খাইতে পায় আর নাই পায় তাহাতে জমিদারের কি? জমিদারের

অধিকারে বাস করিতেছ, জমি ভোগ দখল করি-তেছ, খাজনা দেও; যদি না দিতে পার অন্যত্র চলিয়া যাও, খাজনা আজ দিতেই হইবে, আমি কোন মতেই ছাড়িব না, খাজনা দিয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও।"

এমন সময় লক্ষ্মী একটী টাকা আনিয়া মায়ের হাতে দিল। টাকা দেখিয়া রামসিং পেয়াদা বলিল "এখন কোথা হইতে টাকা আসিল; তোমরা জমিদারকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিতেছ, আজ হাতে হাতে ধরিয়াছি, দুই বৎসরে জমিদারের দুই টাকা খাজনা পাওয়া হইয়াছে, আজ একটী পয়সাও ছাড়িব না, অবিলম্বে টাকা দাও।" বিধবা বলিলেন, "রামসিং সত্য সত্যই আমার কিছু নাই; দেখ বাপু মেয়েটী এক হাতের এক গাছা বালা বেচিয়া এই টাকাটী আনিয়াছে; দেখ মেয়েটীর হাত শুধু হইয়াছে। এই টাকাটী ছাড়া আর একটী পয়সাও আমার নাই। ছেলেটা ক্ষুধায় দাপাদাপি করিতেছে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া মেয়েটার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। তুমি যদি টাকাটী লইয়া যাও, তবে এদের আমি কি খাওয়াইয়া বাঁচাইব?" রামসিং সে কথায় কর্ণপাতও করিল না; বলিল "কি খাওয়াইবে আমি জানি না, আমি মনিবের নিমক খাই, মনিবের কাজ হাসিল করিব, আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না, শীঘ্র টাকা দাও।" ছেলেটী এদিকে "মা খেতে দে, খেতে দে" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিধবা নিরুপায় হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, রামসিং অনুনয় বিনয় কিছুই শুনিল না, সেই টাকাটী বলপূর্ব্বক লইয়া জমিদারের বাড়ীতে চলিল। লক্ষ্মী দাঁড়াইয়া এতক্ষণ এই সকল দেখিতেছিল, কোন কথাই বলে নাই। রামসিং টাকাটী লইয়া চলিয়া গেলে, সেও আর কথাটীও না বলিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে এবং আর এক হাতের বালাগাছি খুলিতে খুলিতে বাড়ীর বাহির হইল।

খোকা বাবু।

পড়া শুনা সারা হল কাজ কর্ম্ম নাই
জয় ঢাকটা নিয়ে একটু খেলা করি ভাই।
কাঠি দিয়া দিচ্ছি টোকা একি চমৎকার
ঢ্যাং ঢ্যাং ঢ্যাং ঝ্যাটাং ঝ্যাটাং বেজে উঠে আর!
সাদাসিদে চারি দিক কল কৌশল নাই,
কোথা হ'তে শব্দ আসে ভাবিছ বসে তাই!
নিশ্চয় এর মধ্যে আছে সন্দেহ কি তার,
ঢ্যাং ঢ্যাং ঢ্যাং ঝ্যাটাং ঝ্যাটাং কোথায় থাকে আর?
ভেবে ভেবে খোকা বাবু বুদ্ধি ক'রে স্থির
তাড়াতাড়ি ছুরীখান করিল বাহির।
জয় ঢাকটা কাটা গেল আশার মুখে ছাই,
ঢ্যাং ঢ্যাং ঢ্যাং ঝ্যাটাং ঝ্যাটাং কিছুই যে নাই!
আমোদ টা মাটি হ'ল দুরাশার ছলে!
বেশী লোভে বেশী দুখ লোকে তাই বলে।

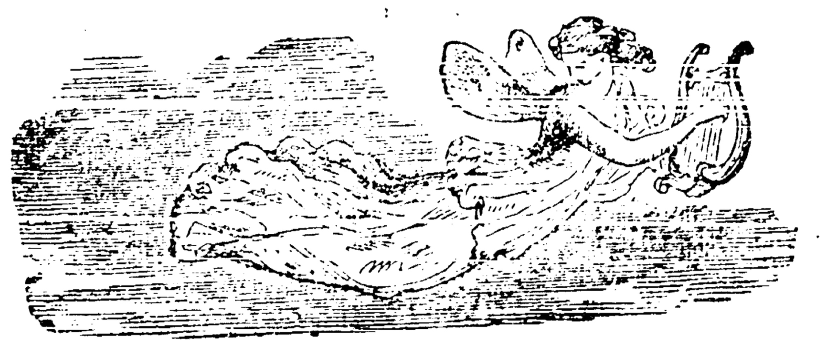

ছায়া পথ।

আকাশের তারা গণিতে পার? সাধারণ কথায় বলে যে,যে আকাশের তারা গণিতে পারে, ডুমুরের ফুল দেখিতে পারে সে রাজা হয়। ডুমুরের ফুলের কথা আজ থাক্, আকাশের তারাই গণা যাক। আমরা যন্ত্র ব্যবহার না করিয়া শুধু চোখে যে তারা দেখি তাহা অসংখ্য নহে। তবে এলো মেলো ভাবে আছে বলিয়া খুব বেশী বোধ হয়। তোমরা কতকগুলি পয়সা টেবিলের উপর এলো মেলো ভাবে ছড়াইয়া দেখিও অনেক বোধ হইবে। আমরা যে আকাশের নীচে বাস করি সেই আকাশের দিকে কোন যন্ত্র ব্যবহার না করিয়া তাকাইলে একজন যতগুলি তারা দেখিতে পারে তাহার সংখ্যা ২৩৪২। ইহার মধ্যে ৯টী তারা খুব উজ্জ্বল, ইহাদিগকে প্রথম শ্রেণীর তারা বলা যাইতে পারে; ৩৪টী তারা ইহাদিগের অপেক্ষা কম উজ্জ্বল, ইহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর তারা; ৯৬টী তারা আরও ছোট, ইহারা তৃতীয় শ্রেণীর তারা; চতুর্থ শ্রেণীর তারা ২১৪টী; পঞ্চম শ্রেণীর তারা ৫৫০টী; এবং অবশিষ্ট ১৪৩৯টী তারা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ইহারাই ষষ্ঠ শ্রেণীর তারা। অতএব আমাদিগের আকাশের তারা গণিলে সমুদায়ে ২৩৪২টী হয়!

এত গেল তারার কথা। যদি তোমরা পরিস্কার, মেঘশূন্য অন্ধকারময়ী রাত্রিতে আকাশের দিকে চাও—দেখিবে পাতলা শাদা মেঘের মত দাগ তোমার মাথার উপর দিয়া আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়াছে। সাধারণ কথায় ইহাকে 'যমের জাঙ্গাল' কহে। সাধারণ লোকে ইহাকে যাহার ইচ্ছা তাহার জঙ্গাল বলুক, কিন্তু তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি ইহা কি পাতলা সাদা মেঘ? না, ইহা কি তাহা তোমাদিগের অনুমানেই আসিবে না। ইহা বহু দূরস্থ বহু সংখ্যক তারার সম্মিলন। ঐ সকল তারা এত দূরে রহিয়াছে যে যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন তাহাদিগকে একটী একটী করিয়া দেখিবার যো নাই। তবে অনেকগুলি একসঙ্গে আছে বলিয়া তাহাদিগের সম্মিলিত দীপ্তিতে আকাশের ঐ অংশ জ্যোতির্ম্ময় মেঘে ঢাকা বলিয়া বোধ হয়। একদিন একজন জ্যোতির্ব্বিদ দূরবীক্ষণ যন্ত্র লইয়া ছায়া পথের এক অংশ পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি গণিয়া দেখিলেন ১৫ মিনিট সময়ের মধ্যে ৯০০০ নয় হাজার তারা তাহার চক্ষু অতিক্রম করিয়া গেল। এখন সমুদয় ছায়া পথে কত তারা থাকিতে পারে তোমরা মনে মনে একবার চিন্তা করিয়া দেখ। দেখিবে বিশ্বপতির সম্পত্তি কত অসীম ও অনন্ত!

পত্র প্রেরকদের প্রতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সখায় প্রকাশ করিবার জন্য পত্র বা প্রবন্ধ "সখা সম্পাদক" এই নামে পাঠাইতে হইবে। এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে। নতুবা কার্য্যের বিশেষ অসুবিধা হয়, এবং অনেক সময় এইজন্যই অনেক পত্র বা প্রবন্ধ মুদ্রিত অথবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশিত হয় না।

শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি চৌধুরাণী—আপনার প্রবন্ধটী মন্দ হয় নাই। কিন্তু গ্রেস ডারলিংএর আখ্যায়িকা সখার পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট নূতন হইবে না। উপদেশ পূর্ণ নূতন আখ্যায়িকা আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিব।

কুমার সতীপ্রসাদ গর্গ, মহিষাদল রাজবাটী—প[illegible]টী ঠিক সখায় প্রকাশ করিবার মত হয় নাই। সখার উ[illegible] করিয়া লিখিলে আমরা আহ্লাদের সহিত মুদ্রিত করি[illegible]।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ দাস—হেঁয়ালির সহিত তাহার উ[illegible] পাঠান আবশ্যক। উত্তর দেখিলে প্রকাশ করিবার উ[illegible] কি না বিবেচনা করা যাইতে পারে।

পি, এম, প্রামাণিক—একটী সপ্তম বর্ষীয় ভ্রাতার মৃত্যু উপলক্ষে একটী পদ্য লিখিয়াছেন। পদ্যটী অনেকদিন আমাদের হস্তগত হইয়াছে, এতদিন এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না করিয়া আমরা বিশেষ লজ্জিত আছি। ভাইয়ের মৃত্যুতে ভগ্নী মনের আবেশে পদ্যটী লিখিয়াছেন। সখায় প্রকাশের মত ঠিক না হইয়া থাকিলেও, মৃত ভাইয়ের জন্য ভগ্নীর স্নেহ এবং ভালবাসা, এবং তাহার মৃত্যুতে ভগ্নীর শোক কবিতাটীতে প্রকাশ পাইয়াছে।

ধাঁধা।

গত আগষ্ট মাসের ধাঁধার উত্তর।

জজ

সখা।
সপ্তম ভাগ। ১০ম সংখ্যা।
অক্টোবর, ১৮৮৯।

বিবিধ।

তাঁতিয়া ভিলের কথা গত সংখ্যায় লিখিত হইয়াছিল। তাঁতিয়ার বিচার হইয়া গিয়াছে। ডাকাতি, নরহত্যা প্রভৃতি অপরাধে তাঁতিয়া অভিযুক্ত হয়। তাঁতিয়া নরহত্যার অপরাধ স্বীকার করে নাই। তথাপি জব্বলপুরের সেসন আদালতের বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। সৎপথে থাকিয়া জীবন যাপন করিবার জন্য তাঁতিয়ার একটা বিশেষ আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। তাহাকে ক্ষমা করিলে হয়ত সে সৎপথে থাকিয়া ধীর শান্তভাবে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিত।

* *
*

কলিকাতার নিকটে খিদিরপুরে একটী প্রকাণ্ড ডক অর্থাৎ জাহাজ মেরামত ও নূতন জাহাজ তৈয়ারের জন্য একটী স্থান নির্ম্মিত হইতেছে। সম্প্রতি এই ডকের ওভারসিয়ার বাবু উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ট্রলি অর্থাৎ ঠেলাগাড়ী চড়িয়া যাইতেছিলেন। গাড়ী খুব দ্রুতবেগে চলিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একটী তিন বৎসরের বালক লাইনের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন গাড়ীর বেগ সামলাইবার আর কোন উপায় ছিল না। উপেন্দ্র বাবু মহা বিপদ দেখিয়া সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া ছেলেটীকে হাত বাড়াইয়া ধরিলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি গাড়ী হইতে পড়িয়া গেলেন। গাড়ী তাঁহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। তিনি ছেলেটীকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিলেন না; তাহাকে বুকের নীচে ধরিয়া রহিলেন। ছেলেটীর কিছু হয় নাই, কিন্তু উপেন্দ্র বাবুর শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। তিনি এখন হাঁসপাতালে। উপেন্দ্র বাবুর দৃষ্টান্ত অনুকরণ যোগ্য।

* *
*

মহারাণীর পৌত্র প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর কলিকাতায় আসিতেছেন। ৪ঠা জানুয়ারি তাঁহার কলিকাতায় পৌছিবার কথা আছে। ইহাঁর পিতা মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ পনর বৎসর পূর্ব্বে এদেশে আসিয়াছিলেন। সে সময় কলিকাতায় মহা ধূমধাম হইয়াছিল। শুনিতেছি এবার আর সে রকম কিছুই হইবে না।

* *
*

জানোয়ারদিগের মধ্যে কেবল উঁটেরা সাঁতার দিতে পারে না। ইহারা জলের মধ্যে পড়িবা-

মাত্র তৎক্ষণাৎ উল্টাইয়া যায়, এবং জীবন রক্ষার জন্য কোন চেষ্টাই করিতে পারে না।

* *
*

কতগুলি জীব নিজের শরীরের যত ওজন তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ জিনিশ আহার করিয়া থাকে। মাকড়সারা প্রতিদিন নিজের শরীরের ওজন অপেক্ষা ছাব্বিশ গুণ অধিক ওজনের জিনিশ আহার করে।

* *
*

আফগানিস্থান—অর্থাৎ কাবুলেদের দেশ উৎকৃষ্ট ফলের জন্য প্রসিদ্ধ। এই স্থানে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট ফল জন্মায়, কোথাও এমন জন্মায় না। আফগানিস্থানের হিরাট নগরে একটী অদ্ভূত প্রথা প্রচলিত আছে। হিরাটে কেহ বাজার হইতে ফল ক্রয় করে না; যাহার ফল খাইতে ইচ্ছা হয়, সে বাগানে যাইয়া গাছ হইতে ফল পাড়িয়া খায়। বাগানের অধিকারী ফল খাইবার আগে যে খাইতে যায় তাহাকে একবার ওজন করিয়া লয়; তারপর যখন তাহার খাওয়া হইয়া যায়, তখন আর একবার তাহাকে ওজন করে। আগের বারের অপেক্ষা শেষবারে ওজন যত অধিক হয়, তাহার কাছে সেই রকম দাম আদায় করিয়া লয়।

* *
*

খুব ঝড় উঠিয়াছে; নদীতে ভয়ঙ্কর তুফান, নৌকা আর বাঁচান যায় না। আরোহিরা আর কোন উপায় না দেখিয়া যে যাহা সম্মুখে পাইল, তাহা লইয়া জলে ঝাঁপ দিল। একজন সম্মুখে একটা নোঙ্গর পাইয়া তাহা লইয়াই ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

* *
*

শিক্ষক ছাত্রকে বলিতেছেন,—"তোমাকে যে প্রশ্ন করা যায় তুমি তাহার একটীরও উত্তর দিতে পার না।" ছাত্র উত্তর করিল—"মহাশয় আপনি যে প্রশ্ন করেন, তাহা যদি সকলই আমার জানা থাকিবে, তবে বাবা আর আমাকে আপনার কাছে কেন পাঠাইবেন?

* *
*

কাঁচি দিয়া কাঁচ কাটা যায় তা বোধ হয় তোমরা শুনিয়া থাকিবে। একখানা কাঁচ জলের নীচে ধরিয়া কাঁচি দিয়া কাট, দেখিবে কাপড়ের মত কাটিয়া যাইবে।

* *
*

গভর্ণমেণ্টের একজন প্রধান ভূতত্ত্ববিদ্ কিছু কাল পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত ভারতবর্ষে যত কয়লা আছে আমি নিজে সে সমস্ত কয়লা খাইতে প্রস্তুত আছি। তাঁহার একথা বলিবার কারণ এই যে তখন এদেশে কয়লা একপ্রকার পাওয়াই যাইত না; এদেশের কয়লার খনিগুলি তখন সকল আবিষ্কৃত হয় নাই। এখন সমস্ত ভারতে একশত পাঁচটী কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে; এই সকল খনি হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ৩৯২০০০০০ মন কয়লা উঠিতেছে। ভূতত্ত্ববিদ্ বহুদিন হইল এদেশ হইতে চলিয়া গিয়াছেন; এখানে থাকিলে এখন তিনি এ সামান্য কয়লাটুকু খাইতে প্রস্তুত ছিলেন কি না দেখা যাইত!

রাজা বাবু।

(৩)

সে আজ এক বৎসরের কথা। ১২৯৫ সনের আশ্বিন মাস; বঙ্গের গৃহে গৃহে আনন্দ উৎসব হইতেছে। বঙ্গের প্রধান উৎসব দুর্গোৎসবে, বঙ্গের প্রতি গৃহ আনন্দময় হইয়াছে, নিরানন্দ কেবল অর্থহীনের। শ্রাবণের অবিরল বারিধারা ক্ষান্ত হইয়াছে। আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, প্রভাতকালীন সূর্য্যের রক্তিম কিরণে পৃথিবী বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে,—শরতের প্রভাত বড়ই মনোহর। হরিশপুরের রাজাবাবুদের বাড়ী পূজা। পূজা খুব ধূমধামের সহিতই হইয়া থাকে। ধূমধাম এবার একটু বেশী, কেননা এবার জেলার মাজিষ্ট্রেট ও পুলিষ সাহেব এবং একজন নীল কুঠিয়াল এবার পূজার সময় রাজা বাবুদের বাড়ী শুভাগমন করিবেন। কলিকাতার সাহেবদিগের হোটেল হইতে খানা এবং যাত্রা নাচ থিয়েটার প্রভৃতি আসিয়াছে। সে সকল বন্দোবস্ত রামজীবন বাবুর বড় পুত্র দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ংই করিয়াছেন। তিনি এখন কলিকাতাতে নরেন্দ্রনাথের অভিভাবক এবং পিতার প্রতিনিধিরূপে বিরাজ করিতেছেন।

অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজাবাবুদের বাড়ীর নহবৎখানায় প্রভাতি বাজিয়া উঠিল। সেই মধুর সঙ্গীতে হরিশপুর নিবাসিগণ জাগিয়া উঠিল। বালকেরা নূতন কাপড় পড়িয়া দলে দলে রাজা বাবুদের বাড়ী প্রতিমা দেখিতে চলিল। সেই দরিদ্র বিধবার পাড়া প্রতিবেশীদের ছেলে মেয়েরাও নূতন কাপড় পরিয়া, লাল রুমাল কোমরে বাঁধিয়া, চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় যে রঙ্গিন ছাতি এবং বিবিধ বর্ণে চিত্রিত লাঠি কিনিয়াছিল, তাহাই হাতে করিয়া মহা উল্লাসে রাজাবাবুদের বাড়ীর দিকে চলিল। লক্ষ্মী এতক্ষণ নানা কথায় ভাইকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু পাড়ার ছেলে মেয়েরা যখন উল্লাসে কলরব করিতে করিতে বাহির হইল, তখন আর কোন মতেই তাহাকে বুঝাইয়া রাখিতে পারিল না। সেও পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে নূতন কাপড় পরিয়া প্রতিমা দেখিতে যাইবে এই জেদ্ ধরিল। লক্ষ্মী দেখিল মহা বিপদ কেমন করিয়া অবোধ বালককে বুঝাইবে বালিকার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

এদিকে কুটীর মধ্যে সেই বিধবা একটী ছিন্ন মাদুরের উপরে শুইয়া ছট্ ফট্ করিতেছেন। অনাহারে, চিন্তায় এবং আশু ক্লেশে তাঁহার দারুণ যক্ষ্মা রোগ জন্মিয়াছে। তিনি আজ এক মাস পর্য্যন্ত শয্যাগত, ঔষধ পথ্য কিছুই চলে না, দিনান্তে যাহারা একমুঠা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাহাদের আবার চিকিৎসা চলিবে কেমন করিয়া? রোগ যন্ত্রণা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। ভরসা একমাত্র কন্যা লক্ষ্মী। লক্ষ্মী সত্য সত্যই লক্ষ্মী। এই কোমল বয়সেই সে দুঃখ কি তাহা খুব বুঝিয়াছে। তাহার মুখে বাল্যের সে প্রফুল্লতা, সে উৎসাহ নাই, চিন্তায় চিন্তায় বালিকার প্রফুল্ল মুখ খানি মলিন হইয়া গিয়াছে। বাল্যের চঞ্চলতা কিছুই নাই, সে এই বয়সেই ধীর শান্ত এবং গম্ভীর হইয়াছে। বিধবার উঠিবার শক্তি নাই, দিবারাত্র রোগ যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছেন। বালিকা এক একবার দুরন্ত ভাইকে খেলা দিয়া রাখিতেছে, আবার আসিয়া মায়ের ধারে বসিয়া

মায়ের শুশ্রূষা করিতেছে। মায়ের চিকিৎসা হই-তেছে না, ঔষধ দিতে পারিতেছে না, তবুও তাহার বিশ্বাস মা মরিবেন না। সরলা বালিকা এখনও বুঝিতে পারে নাই যে, দুরন্ত যক্ষ্মা রোগে মাকে আক্রমণ করিয়াছে। সে প্রাণপণ করিয়া মার শুশ্রূষা করিতেছে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস সেই শুশ্রূষার গুণেই তাহার মা সারিয়া উঠিবেন। সে মনে মনে ভাবে "বাবা আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন, মা কেমন করিয়া আমাদের ছাড়িয়া যাইবেন; আমাদেরত মা ছাড়া আর কেহ নাই, মা তবে কেমন করিয়া আমাদের ফেলিয়া যাই-বেন, কার কাছে আমাদের রাখিয়া যাইবেন?" বালিকার বিশ্বাস, আর যখন তাহাদের কেহ নাই, তখন মা কখনই মরিতে পারেন না। লক্ষ্মী প্রতিদিন প্রাতঃকালে নারিকেল সুপারি প্রভৃতি যাহা কিছু থাকে, পাড়ার একজন লোকের কাছে তাহা দিয়া আসে। সেই লোকটী বাজারে তাহা বেচিয়া যাহা পায় বালিকাকে তাহা আনিয়া দেয়। লক্ষ্মী তাহা দ্বারা মাতার পথ্য দেয় এবং ভাইটীকে খাওয়ায়। নিজে আধপেটা খাইয়া থাকে; নিজে পেট ভরিয়া খাইলে দুরন্ত ভাই যখন আবার খাইতে চাহিবে তখন কোথা হইতে দিবে? লক্ষ্মী এখন ঘরের সকল কাজ করে, মার সেবা শুশ্রূষা ভাইয়ের লালন পালন, সকলই তাহাকে করিতে হয়। লক্ষ্মী খুব মন দিয়া মায়ের শুশ্রূষা করিতেছে, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস সেই শুশ্রূষার গুণেই মা বাঁচিয়া উঠিবেন। অবোধ বালিকা জানে না যে মা তাহাকে অবিলম্বেই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। দিন এই রকম করিয়া কাটিতেছে।

পাড়ার ছেলে মেয়েদের রাজাবাবুর বাড়ী যাইতে দেখিয়া, দুরন্ত ছেলে তাদের সঙ্গে যাই-বার জেদ ধরিল, লক্ষ্মী আর কিছুতেই তাহাকে বুঝাইয়া রাখিতে পারে না। অবশেষে অবোধ বালক মৃত প্রায় মাতাকে প্রহার আরম্ভ করিল। বিধবা তখন বলিতে লাগিলেন, "মা লক্ষ্মী, আমার আজ যেন কেমন ঠেকিতেছে, মনে হইতেছে যেন আমার সকল ব্যামো সারিয়া গিয়াছে। আমার আর কোন কষ্ট বোধ হইতেছে না ছেলেটা অত্যাচার করিতেছে, দেখ্‌ত মা কোন রকমে ওকে শান্ত করিতে পারিস্ কিনা। আমি একাকী থাকিতে পারিব, আজ আর আমার কোন কষ্ট বোধ হইতেছে না; তুই মা একবার দেখ কিছু করিতে পারিস কিনা"। লক্ষ্মী দেখিল সত্য সত্যই তার মা যেন সারিয়াছেন, মুখে আর রোগ যাতনার চিহ্ন নাই। মার সেই মলিন মুখ যেন অকস্মাৎ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সে ভাবিল আমি প্রাণপণ করিয়া শুশ্রূষা করিয়াছি, তাহার পুরস্কার পাইলাম, মা আমার সারিয়া উঠিলেন। সে বলিল "তবে মা তুমি ওকে একটু দেখো, আমি দেখি কিছু পারি কি না।" এই বলিয়া নিশ্চিন্ত মনে লক্ষ্মী গৃহের বাহির হইল।

লক্ষ্মীর একটী মাতুলী ছিল, সে সেটী পরিত না। তার যাহা ছিল সে সমস্তই বিক্রয় করিয়াছিল, কিন্তু এ মাতুলিটী সে এতদিন বিক্রয় করে নাই। এ মাতুলিটী তার বাবা তাকে নিজে হাতে করিয়া দিয়াছিলেন। কতদিন ভাবিয়াছে বিক্রী করিবে কিন্তু সেটী হাতে করিলেই তার বাবাকে মনে পড়িত, তাই বিক্রয় করিতে পারে নাই। আজ আর উপয়ান্তর না দেখিয়া লক্ষ্মী সেই মাতুলিটী লইয়া এক সেক্‌রার দোকানে গেল। সেক্‌রারা মাতুলি লইতে চাহিল না। বালিকা সেই মাতুলি চুরি করিয়া বেচিতে আনিয়াছে এই বলিয়া তাহাকে আটক করিয়া রাখিল। বালিকা অনেক

বলিল কিন্তু তাহারা তাহার কথা শুনিল না; নিরুপায় হইয়া বালিকা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন সেই স্থান দিয়া দেবেন্দ্র এবং নরেন্দ্র যাইতেছিলেন। ক্রন্দন শুনিয়া নরেন্দ্র বলিলেন "দাদা চল দেখিয়া আসি ওখানে কে যেন কাঁদিতেছে।" দেবেন্দ্র বলিলেন, "না এখন ওসব দেখিবার সময় নাই, এখনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং আরও কতকগুলি নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক আসিবেন, শীঘ্র বাড়ী চল, তাঁদের আদর অভ্য-র্থনা, খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কে কোথায় কাঁদিল, কে কোথায় মরিল, সে সব দেখিবার এখন সময় নাই।" নরেন্দ্র দাদার কথায় ব্যথা পাইয়া বলিলেন, "দাদা তুমি যাও আমি না দেখিয়া বাড়ী যাইব না।" এই বলিয়া নরেন্দ্র সেই সেকৃরার দোকানে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন দোকানের একধারে একটী বালিকা দাড়াইয়া কাঁদিতেছে। তাহার মুখ খানি শুকা-ইয়া গিয়াছে, পরিধানে অতি মলিন জীর্ণ এক খানি কাপড়। নরেন্দ্র সেক্‌রাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে বালিকা মাতুলি চুরি করিয়া বেচিতে আসিয়াছিল, তাই তাহারা তাহাকে ভয় দেখাইয়া আটক করিয়া রাখিয়াছে। বালি-কার আকার দেখিয়া নরেন্দ্রের সেকৃরাদের কথায় বিশ্বাস হইল না। তিনি তখন বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বালিকা সমস্ত ঘটনা তাঁর কাছে বলিল। নরেন্দ্র তখন সেই বালিকাকে সঙ্গে করিয়া তাহাদের বাড়ীর দিকে চলি-লেন। যাইবার সময় দুই খানি নূতন কাপড় সঙ্গে লইয়া চলিলেন। সেই কুটীরের নিকটে যাইয়া বালিকা বলিল, "এই আমাদের বাড়ী।" নরেন্দ্র তখন নূতন কাপড় দুখানি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, তোমার মার কাছে লইয়া যাও। বালিকা লইতে চাহিল না, অবশেষে বিশেষ পীড়াপীড়িতে কাপড় দুখানি লইয়া মার কাছে গেল। ঘরের মধ্যে যাইয়াই বালিকা চীৎ-কার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; সেই চীৎকার শুনিয়া নরেন্দ্রও কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখিলেন বিধবা মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিয়া-ছেন, এবং তাঁহার পার্শ্বে সেই দুরন্ত বালক খেলা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তিনি কাছে যাইয়া দেখিলেন তখনও মৃত্যু হয় নাই। অল্প অল্প শ্বাস বহিতেছে, লক্ষ্মী তখন "মা" "মা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল; ধীরে ধীরে বিধবা চক্ষু মেলিলেন। লক্ষ্মী বলিল "মা এই দেখ কাপড় আনিয়াছি; তুমিত বলিয়াছ যে তোমার ব্যামো সারিয়া গিয়াছে—কোন কষ্ট আজ আর নাই; তবে মা একবার ওঠ, উঠিয়া এই কাপড় খোকাকে পরাইয়া দাও, আমি রাজাবাবুদের বাড়ী প্রতিমা দেখাইয়া আনি। বিধবার মলিন মুখে একটু হাসি দেখা দিল; তিনি অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন "মা লক্ষ্মী, রোগ যন্ত্রণা আমার সত্য সত্যই ফুরাইয়াছে; মা তুমি বালিকা, আমার যে শেষ হইয়াছে তাহাত বুঝিতে পারিতেছ না! আর অধিক বিলম্ব নাই মা আমার মুখে একটু জল দাও, তারপর তোমার খোকাকে রাজাবাবুদের বাড়ী প্রতিমা দেখাইতে যাও।" লক্ষ্মী এই কথা শুনিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল! অবোধ বালিকা দেখিল মা তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছেন; সে আজ বুঝিল—মাও মরিতে পারেন। নরেন্দ্র দেখিলেন আর বিলম্ব নাই; তখন সেই রোগ শয্যার পার্শ্বে বসিয়া বিধবার মুখে একটু একটু জল দিতে লাগিলেন; জল খাইয়া তিনি আবার বলিলেন; "বাবা তুমি কে আমি জানি না, দুঃখিনীর এই

মেয়ে ও ছেলেটীকে একটু আশ্রয় দিও। রাজা-বাবুদের লোক কালই আসিয়া এ অনাথ দুঃখী দুটীকে তাড়াইয়া দিয়া, বাড়ী বিক্রয় করিয়া খাজনা আদায় করিয়া লইবে; ইহারা পথের ভিখারী হইবে। বাবা দুঃখীর মুখের দিকে চাহিও, দুঃখিনীর এই অনাথ সন্তান দুটীকে আশ্রয় দিও।" বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল—জীবন বাহির হইল। নরেন্দ্র নাথ ধনীও দরিদ্রের চিত্র দেখিয়া ব্যথিত হইলেন।

ঈশ্বরের প্রতি।

১

তোমারে পূজিতে নাথ!
এসেছি এ ধরাতলে,
কি ভুলে ভুলেছে মন
ডাকে না "আমার" বলে!

২

তোমার কোলেতে থাকি,
তোমারি আদর পাই,
কি জানি কেমনে তবে
তোমারে ভুলিয়া যাই!

৩

তুমিই দিয়াছ প্রাণ,
তুমিই গড়েছ দেহ;
"মানুষ" করিতে মোরে
মায়েরে দিয়েছ স্নেহ।

৪

অনল অনিল জল
রবি শশী-কর রাশি,
সাধিতে আমার কায
আপনি রয়েছে আসি।

৫

শ্যামল তরুর কোলে
গায় পাখী চারু গান,
ডালে ডালে ফোটে ফুল
যুড়ায় নয়ন প্রাণ!

৬

বরিষা বসন্ত সবে,
কত বার আসে যায়
কিসে যে কি কাজ মম
আমি তা জানিনে হায়!

৭

রাজা-মহারাজ তুমি
অসীম ব্রহ্মাণ্ড প'রে,
এক ফোঁটা আমি—তবু
খাটিছ আমার তরে!!

৮

এ বিশ্ব ভরিয়া দেব,
তুমিই রয়েছ মরি!
করিছে তোমায় নতি
সকল জগৎ ভরি!

৯

সোণামুখী উষা আসে
গাহিয়া তোমার গীতি
মুকুতা-মালিনী নিশা
তব নাম গায় নিতি।

১০

তোমার করুণা গাথা
সমীর ঢালিয়া যায়
বিহগ বিহগী মিলে
তোমারি মঙ্গল গায়।

১১

—শুধুই অধম আমি
হীন মতি ধরাতলে,
জানিনে ভকতি স্তুতি
কৃতজ্ঞতা কারে বলে (!)

১২

না চাহিতে পাই হেন
অমূল করুণা ধন,
কে যে সে করুণা সিন্ধু
বোঝে না অবোধ মন!

১৩

দাও ভিক্ষা দয়াময়,
দীন হীন অভাজনে,
থাকি যেন সত্য পথে
থাকে মতি ও চরণে!

১৪

এই ক্ষুদ্র হৃদি মম
এই দুরবল আশা,
এ সব ভরিয়া নাথ,
ঢেলে দাও ভালবাসা।

১৫

যা কিছু করিতে পারি
ক্ষুদ্রতর—ক্ষুদ্রতম,
তোমার আদেশ পালি
জীবন ফুরাক্ মম।

১৬

তোমার স্নেহের কোলে
পাই যেন শেষ ঠাঁই,
এ জগতে জগদীশ!
আর কিছু নাহি চাই।

দিল্লী।

অতি পুরাতন কাল হইতে দিল্লীই ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। এক্ষণে কলিকাতা সমুদয় ভারতবর্ষের রাজধানী; পূর্ব্বে এ নগর বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং তারপর মুসলমান রাজত্বকালেও কলিকাতা একটী সামান্য বন্দর মাত্র ছিল। দিল্লীর প্রাচীন নাম ইন্দ্রপ্রস্থ; যমুনার দক্ষিণ দিকে ইন্দ্রপ্রস্থ নগর স্থিত। বর্ত্তমান দিল্লী হইতে ইন্দ্রপ্রস্থ এক ক্রোশ দূরে। এই ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডু পুত্র যুধিষ্ঠিরাদি চন্দ্রবংশীয় হিন্দু রাজগণ

রাজত্ব করিয়াছিলেন। যবন রাজত্বের শেষ সময় পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ইংরেজ রাজ্য আরম্ভ পর্য্যন্ত, দিল্লী নগরী ভারতবর্ষের প্রধান রাজধানী ছিল। চল আমরা আজ ভারতের এই প্রাচীন রাজধানী দেখিতে যাই।

দিল্লী পঞ্জাব প্রদেশে স্থাপিত, কলিকাতা হইতে প্রায় ৪০০ মাইল দূরে। পূর্ব্বে এ নগরের শোভা সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। দিল্লী দুই ভাগে বিভক্ত, পুরাতন দিল্লী ও নূতন দিল্লী। পুরাতন দিল্লীতে এখন লোকের বসতি নাই, ছয় সাত ক্রোশ ব্যাপিয়া রাশি রাশি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে। কত অগণ্য মস্‌জিদ, কত শত শত পতনোন্মুখ সমৃদ্ধ প্রাসাদ অতীত ভূপতিগণের ঐশ্বর্য্য গৌরব, প্রাচীন স্থপতিগণের অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্য,জীবন সম্পদের অনিত্যতা অপরিস্ফুট গম্ভীর স্বরে দর্শকদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে। এই স্থানে অসংখ্য বার বিষম বিপ্লব হইয়া গিয়াছে। বিপক্ষের আক্রমণে কত শতবার ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া এ নগর নর-শোণিতে প্লাবিত হইয়াছে। কতবার ইহার ধনৈশ্বর্য্য অপহৃত ও শোভা সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে। কথিত আছে দিল্লী সাতবার ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ও সাতবার নির্ম্মিত হয়।

পুরাতন দিল্লীতে যাহা দেখিবার আছে নিম্নে লিখিত হইল। পুরাতন দিল্লীর যে স্থানকে কুতুব বলে, সে স্থানে কুতুব মিনার নামক পরম সুন্দর অত্যুচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত রহিয়াছে। কুতুব মিনার প্রায় ১৬০ হাত উচ্চ এবং ইহার পরিধি প্রায় ৬৭ হাত। এই মিনারটী পাঁচতালা, এক একটী তলা এক এক রঙ্গের প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার পরে উঠিলে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, নূতন দিল্লী এবং তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ পর্ব্বতগুলি অতি পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এক এক তালায় এক একটী কুঠুরী আছে, এবং উপরে উঠিবার জন্য ৩৭৬টী ধাপ বিশিষ্ট একটী সিঁড়ি আছে। ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা কে, সে সম্বন্ধে অনেক কথা প্রচলিত আছে। এই মিনার সম্বন্ধে নাগরী অক্ষরে লেখা আছে যে, "কোন হিন্দু রাজা, তাঁহার কন্যা সূর্য্য উদয়ের সময় উপর হইতে গঙ্গা দর্শন পূর্ব্বক উপাসনা করিবেন বলিয়া নির্ম্মাণ করেন।" কেহ বলেন উহা মুসলমানের নির্ম্মিত। মিনারের উত্তর দিকের দ্বারগুলি হিন্দু-দিগের দ্বারের ন্যায়, তদ্ভিন্ন আরও অনেক চিহ্ন আছে, যাহাতে ইহাকে হিন্দু নির্ম্মিত বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু অনেকের বিশ্বাস ইহা মুসলমান নির্ম্মিত। ১২৯৩ সালে মহম্মদের সেনাপতি কুতুবুদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কথিত আছে কুতুব মিনার তিনিই নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁহার জীবিত কাল মধ্যে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয় নাই। কথিত আছে, এই স্থানে যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল। পৃথ্বীরাজ হইতেই দিল্লীর হিন্দু রাজত্বের শেষ হয়। কুতুব মিনারের নিকটে একটী পরম সুন্দর প্রস্তরময় ভবনের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে, তাহাকে অনেকে পৃথ্বীরাজের ভবন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উক্ত ভবনের ভগ্ন অট্টালিকা ও তাহার পার্শ্বস্থ শ্রেণীবদ্ধ উচ্চ তোরণ সকলে চমৎকার কারুকার্য্য দৃষ্ট হয়। ইহার প্রাঙ্গনে একটী বৃহৎ লৌহ স্তম্ভ স্থাপিত আছে, স্তম্ভে কতকগুলি অক্ষর খোদিত আছে তাহা কেহ পড়িতে পারে না। চতুর্দ্দিকে পাষাণময় দেবমূর্ত্তি সকল পতিত আছে, ইহা ছাড়া হিন্দু রাজাদের অন্য কোন কীর্ত্তি এখন আর নাই, যবনেরা সমুদায় বিনাশ করিয়াছে। সম্রাট হুমায়ুন ও রাজগুরু মেজামদ্দিন আওলিয়া এবং নবাব সফদর

জঙ্গ প্রভৃতির সমাধি মন্দিরই পুরাতন দিল্লীর বিশেষ দর্শনীয়। হুমায়ুনের সমাধি মন্দিরটী অতি বৃহৎ; নির্ম্মাণ করিতে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই সমস্ত গোরস্থানের চারি দিকে সুন্দর বাগান আছে। বাগানের মধ্যে জলের ফোয়ারা দেখিতে পাওয়া যায়। বাগানের চারি দিকে প্রাচীর আছে, এবং প্রাচীরের উপর নানা রঙ্গের স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। এই তিনটি মস্‌জিদ বৃহৎ ও পরম সুন্দর। এখানে একটী প্রকাণ্ড ভগ্ন দুর্গও আছে। কলিকাতা হইতে দিল্লী ৯৫৪ মাইল।

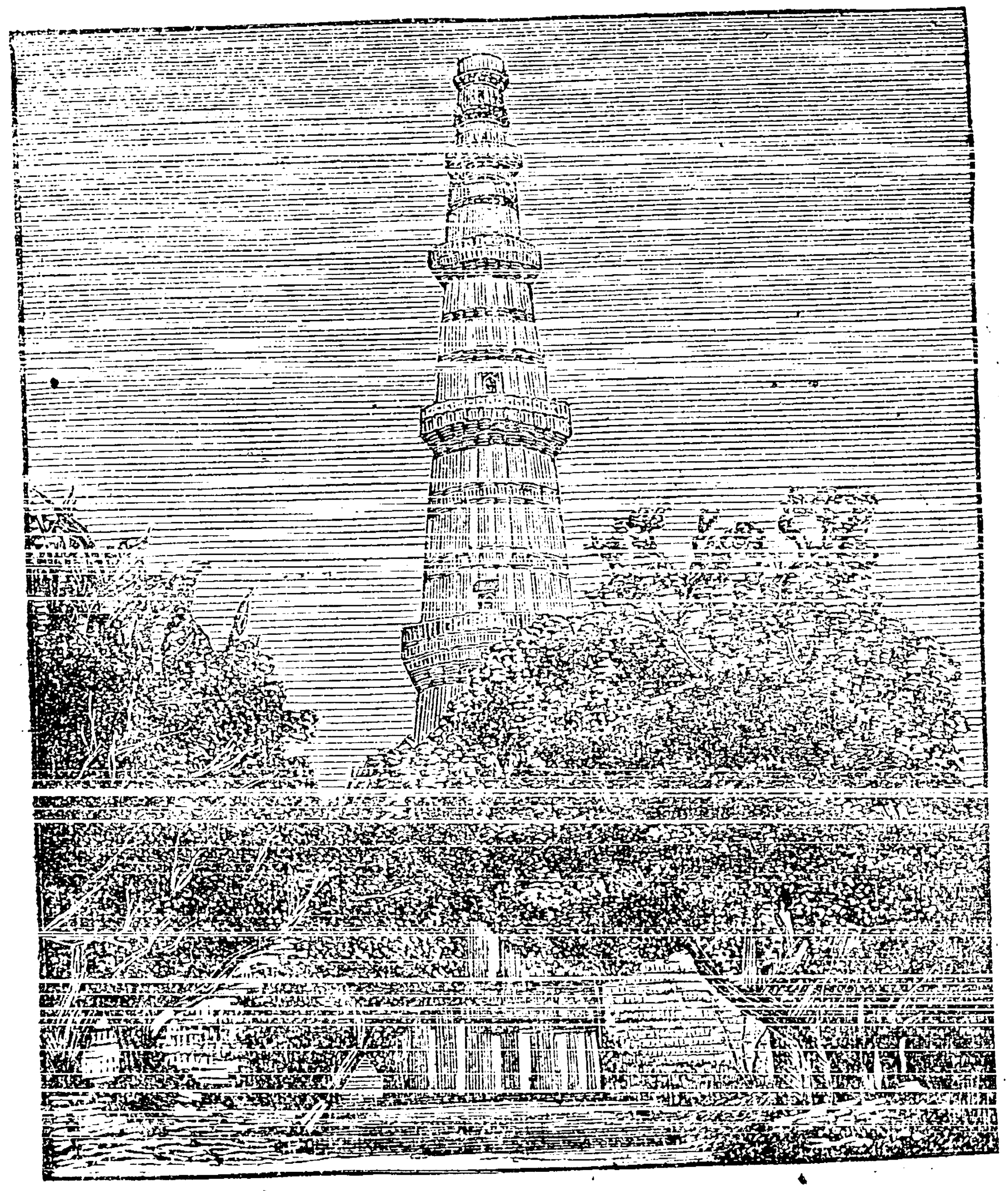

কুতুব মিনার।

পুরাতন দিল্লীর অদূরে যমুনা নদীর পশ্চিম কূলে নূতন দিল্লী, ইহা বিখ্যাত মোগল সম্রাট সাজাহান কর্ত্তৃক স্থাপিত। ইহার অন্যতর নাম সাজাহানাবাদ। দিল্লী নগর বহু বিস্তীর্ণ ও জনাকীর্ণ। ইহার চতুর্দ্দিক্ পরিখা ও প্রাচীর বেষ্টিত। নগরে প্রবেশের জন্য আজ্‌মির গেট, কাশ্মীর গেট প্রভৃতি সাতটী বৃহৎ গেট আছে। নগরের প্রাচীর প্রস্তরময়, অত্যুচ্চ ও দুর্ভেদ্য। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় দিল্লীর পূর্ব্ব শোভা অনেক বিনষ্ট হইয়াছে। বিদ্রোহী সিপাহীদিগের হস্ত হইতে দিল্লী উদ্ধার করিয়া গভর্ণমেণ্ট তোপের গুলিতে অনেক সুন্দর প্রাসাদ ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন। তথাপি এখনও দিল্লী একটী দর্শনীয় স্থান। জুম্মা মস্‌জিদ, কুইনস্ গার্ডেন, দুর্গ প্রভৃতি দিল্লীর দেখিবার জিনিস। জুম্মা-মসজিদের মত প্রকাণ্ড মসজিদ আজও নির্ম্মিত হয় নাই। মন্দিরটী মক্কার দিকে সম্মুখ করিয়া রহিয়াছে। রক্ত এবং শ্বেত প্রস্তরে মসজিদটী নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মস্তকে তিনটী লাল ও কাল পাথরের অতি উচ্চ স্তম্ভ আছে। ইহার ভিতরের কারুকার্য্য অতিশয়

মনোহর। ভারতের আর কোন স্থানেই এমন সুন্দর মসজিদ নাই। দিল্লীর দুর্গ-প্রাচীর রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং চল্লিশ ফিট উচ্চ। দুর্গটী দেড় মাইল বিস্তৃত। সাজাহান বাদসাহের প্রাসাদ এই দুর্গ মধ্যেই ছিল। অন্দরে জল লইয়া যাইবার জন্য বাদসাহ যে খাল খনন করিয়াছিলেন, তাহা আজও দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গের মধ্যে বাদসাহের দেওয়ান খানা অর্থাৎ সভামণ্ডপ এই খানে সাজাহান বাদসার বিখ্যাত ময়ূর-সিংহাসন থাকিত। দেওয়ান আম অর্থাৎ সাধারণ সভাগৃহ, মোতি মসজিদ, বেগমদিগের শিশ-মহল নামক দর্পণমণ্ডিত স্নানাগার প্রভৃতি প্রাসাদ অতি মনোহর। দিল্লীর অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান।

দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট সাহ আলম। ইনি নামে মাত্র দিল্লী-সম্রাট ছিলেন, ইহাঁর বল ঐশ্বর্য্য আধিপত্য মহারাষ্ট্রীয়দের দ্বারা খর্ব্ব হইয়াছিল। ১৮৫৭ সালে ইনি বৃদ্ধবয়সে বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিয়া স্বাধীন সম্রাট হইবার দুরাশায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া দ্বীপান্তরিত হন। সেনাপতি জেনারেল উইলসন সসৈন্যে পঞ্জাব হইতে আসিয়া ৬ দিন সংগ্রামের পর ২০ শে সেপ্টেম্বর বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে দিল্লী উদ্ধার করেন। নগর প্রবেশ করিতে গবর্ণমেণ্টের সেনাদিগকে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কাশ্মির গেটে ও প্রাচীরে অসংখ্য তোপ ও বন্দুকের গুলির চিহ্ন রহিয়াছে। অনেক কষ্টের পর সেনাগণ প্রাচীরের দুই স্থানে কিছু ভগ্ন করিতে পারিয়াছিল। দিল্লীতে যত ইংরেজ ছিল, পূর্ব্বেই বিদ্রোহীগণ তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিল। পরে ইংরেজ সৈন্যও দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া ভয়ানক হত্যাকাণ্ড উপস্থিত করে। মুসলমানদিগের কোনরূপে নিস্তার ছিল না, তখন অনেক মুসলমান দাড়ী কামাইয়া হিন্দু হইয়াছিল। ১৮৫৭ সালের যুদ্ধ জয়ের পরই দিল্লী সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিস অধিকার ভুক্ত হইয়াছে।

চক্ষু।

আমরা যখন বিদেশে বা দূর দেশে যাই, তখন পিতা মাতা, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন এবং যাহাদিগকে ভালবাসি ও স্নেহ করি, তাহাদিগকে কত দেখিতে ইচ্ছা করে। বহুদিন পরে যখন ইহাঁদিগকে আমরা আবার দেখিতে পাই, তখন কত সুখ—কত আনন্দ হয়। ছোট ছোট ভাই বোনগুলির প্রফুল্ল হাস মুখ দেখিয়া কত সুখী হই,—যাহাদিগকে ভালবাসি—স্নেহ করি, অনিমিষে তাহাদিগকে দেখি, দেখিয়া দেখিয়া যেন আর তৃপ্তি হয় না, যত দেখি ততই দেখিতে ইচ্ছা করে। নববসন্তের নব পল্লবিত বৃক্ষরাজি, নববিকশিত কুসুমরাশি তখন যেন আরও সুন্দর দেখি, চাঁদের জ্যোৎস্না, প্রভাতের অরুণ কিরণ, তখন যেন আমাদের চক্ষে আরও সুন্দর হইয়া উঠে। যাহা দ্বারা আমরা এত সৌন্দর্য্য উপভোগ করি, এবং সেই সৌন্দর্য্য উপ-

ভোগ করিয়া এত সুখ পাই, বিধাতার তাহা একটী আশ্চর্য্য সৃষ্টি। আমরা আজ সেই চক্ষের কথা বলিব।

যাহার চক্ষু আছে সে দেখিতে পায়, যে অন্ধ সে দেখিতে পায় না। মার স্নেহময়ী মূর্ত্তি, ভাই বোনের প্রফুল্ল আনন, প্রিয়জনের স্নেহমাখা মুখ, তাহার কাছে কল্পনার বস্তু। কুসুমের সৌন্দর্য্য, চাঁদের জ্যোৎস্না, প্রভাতের অরুণ কিরণ, এ সকল কিছুই সে দেখিতে পায় না, সে সৌন্দর্য্য সে মনেও ধারণা করিতে পারে না। আমাদিগের চক্ষু আছে, তাই চক্ষের মূল্য আমরা বুঝি না, যে অন্ধ সে জানে চক্ষু কি অমূল্য পদার্থ। সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর, সকলই আমরা দেখিতে পাইতেছি, দেখিয়া সুখী হইতেছি। আর যে অন্ধ, সে এ সকল হইতে চিরজীবনের মত বঞ্চিত!

আমরা উপরে বলিয়াছি,—যাহার চক্ষু আছে সে দেখিতে পায়, যে অন্ধ সে দেখিতে পায় না। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আবার যাহার চক্ষু আছে সেও দেখিতে পায় না। ইহাতে আমরা এই বুঝিতেছি যে, চক্ষু দ্বারাই কেবল আমরা পদার্থ সকল দেখিতে পাই; এবং পদার্থ সকল দেখিবার জন্য আলোকের দরকার। কারণ যেখানে আলোক নাই, ঘোর অন্ধকার, চক্ষু থাকিলেও সেখানে কিছু দেখিবার সাধ্য নাই। সুতরাং আমরা কেমন করিয়া দেখি, তাহা বুঝিতে হইলে আগে আলোক সম্বন্ধীয় গোটাকত নিয়ম জানা দরকার। গত বৎসরের জুলাই মাসের সখায় আলোক-বিজ্ঞান প্রবন্ধে আলোকের ধর্ম্ম তোমাদিগকে বলা হইয়াছে। তোমরা দেখিয়াছ যে, কোন পদার্থ হইতে আলোক নিঃসৃত হইলে তাহা সরল রেখাভিমুখে যাইতে থাকে, কিন্তু ইহার পথে বাধা পড়িলেই, অর্থাৎ আলোক রেখা যখন এক প্রকার পদার্থ হইতে অন্য প্রকার পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করিতে যায়, তখনই অন্যদিকে বাঁকিয়া যায়। নিম্নের চিত্র দেখ। ক ঘ খ জলের

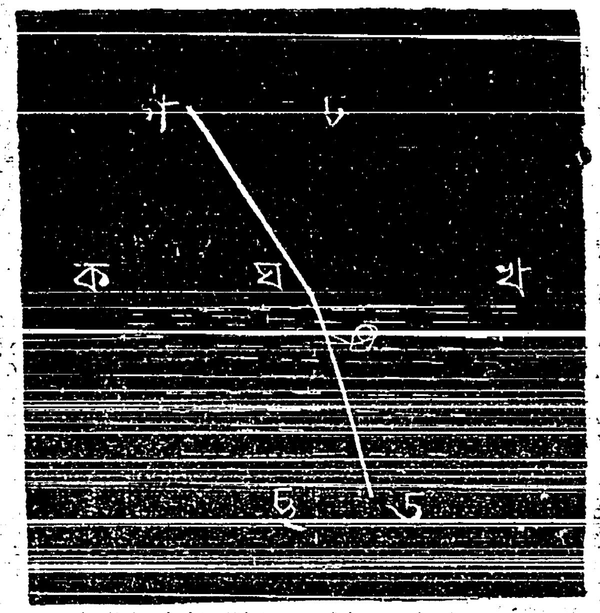

উপরিভাগ, গঘ আলোক রশ্মি বাতাসের ভিতর হইতে জলের ভিতর যাইতেছে। জল বাতাস অপেক্ষা ঘন, এইজন্য গ হইতে আলোক রেখা ঘ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া যে দিকে যাইতেছিল সে দিকে আর যাইতে না পারিয়া ড-র দিকে বাঁকিয়া গেল; অর্থাৎ চ ছ লম্বর দিকে সরিয়া গেল। তেমনি আবার যদি ড হইতে একটী আলোক রেখা বহির্গত হয়, তবে সে ঘ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া, চ ছ লম্ব হইতে দূরে সরিয়া গ-র দিকে বাঁকিয়া যাইবে; কারণ জল অপেক্ষা বাতাস লঘু। তবেই বুঝা গেল যে, এক পদার্থ হইতে তদপেক্ষা কোন ঘনতর পদার্থের ভিতরে—যেমন বায়ু হইতে জলে, বায়ু হইতে কাঁচে,—আলোক রশ্মি যাইবার সময়, চ ছ-র ন্যায় একটী লম্ব অঙ্কিত করিয়া লইলে, চ ছ-র দিকে বাঁকিয়া যাইবে, আবার এক পদার্থ হইতে তদপেক্ষা কম ঘন কোন পদার্থের ভিতরে—যেমন জল এবং কাঁচ হইতে বায়ুতে—যাইবার সময় চ ছ হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। যদি এটী বুঝিয়া থাক, তবে পর পৃষ্ঠার চিত্র দেখ, আর একটী কথা বুঝাই। একখানি ধারে সরু, মাঝখানটা মোটা কাঁচ লইয়া সূর্য্যকিরণে ধরা হইয়াছে।

কাঁচের উপর কতকগুলি অলোক-রেখা পড়িয়া, পূর্ব্ব লিখিত নিয়ম অনুসারে বাঁকিয়া গিয়া অব-

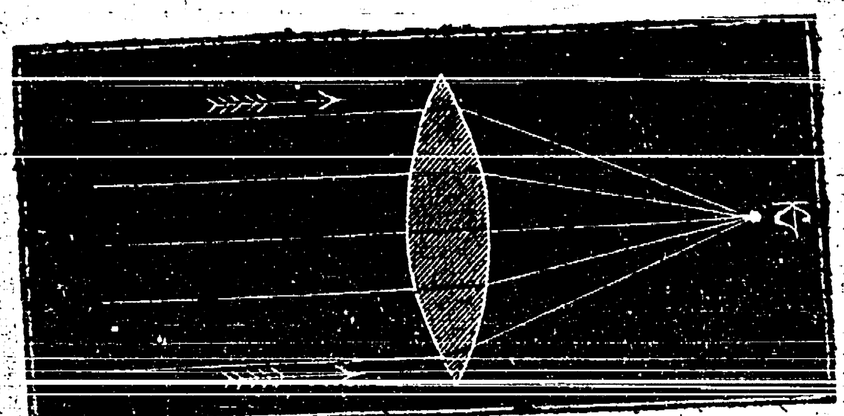

শেষে সকলগুলি একটী বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। এই বিন্দুকে ইংরাজিতে (Focus) বলে। আমরা এই বিন্দুকে অক্ষমধ্যস্থ বিন্দু বলিব। আলোকের ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপরে লিখিত কথা দুটী মনে করিয়া রাখিবে। চক্ষু কি কি পদার্থে গঠিত তাহা বুঝাইয়া, কি প্রকারে আমরা পদার্থ সকল দেখিতে পাই তাহা বুঝাইব, কারণ চক্ষুর গঠন না জানিলে, তাহা বুঝা কঠিন।

অস্থিনির্ম্মিত একটী কোটরে চক্ষু স্থাপিত। একটী গোলার ন্যায়। (পর পৃষ্ঠার চিত্র দেখ) একটী দৃঢ় আবরণ এই চক্ষু গোলকের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, কেবল সম্মুখভাগে কতকটা স্থানে নাই। ইহাকে চিত্রে 'ঘনত্বক' নাম দেওয়া হইয়াছে। চক্ষু গোলকের সম্মুখ-ভাগে যেস্থানে এই ঘনত্বক নাই, সেখানে অত্যন্ত উজ্জ্বল, নির্ম্মল, স্বচ্ছ ও কঠিন একটী ঝিল্লি আছে, ইহাকে 'অক্ষিতারকা' কহে। (চিত্র দেখ)। 'ঘনাবরণের' ঠিক ভিতরের দিকে আর একটী আবরণ আছে, চিত্রে ইহাকে 'কৃষ্ণাবরণ' বলা হইয়াছে। (চিত্র দেখ)। ইহা 'চক্ষুস্নায়ু' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ঘনত্বক' এবং 'অক্ষিতারকার' সন্ধিস্থলে, এবং সেখান হইতে 'অক্ষিযবনিকার' পশ্চাৎভাগ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া, অবশেষে 'শিলিয়ারী প্রোসেস্' নামক পদার্থ শেষ হইয়াছে। ইহা নিম্নস্থ 'অক্ষিজাল'কে উত্তপ্ত রাখে, কিন্তু ইহার প্রধান উপকারিতা এই যে, যখন চক্ষুতে অধিক আলোক পতিত হয়, তখন ইহার মধ্যে যে কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ সকল আছে, তাহা দ্বারা সেই অতিরিক্ত আলোক শোষিত হয়। অধিক আলোক চক্ষুতে পতিত হইলে ভাল রকম দেখিতে পাওয়া যায় না। 'কৃষ্ণাবরণে' এই কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ আছে বলিয়া, 'অক্ষিতারকা' কাল দৃষ্ট হয়। যাহাদিগের চক্ষের কৃষ্ণাবরণে, এই কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ নাই বা অল্প আছে, তাহাদিগের চক্ষু কটা রঙ্গের হয়। বিড়াল এবং পেঁচার চক্ষের কৃষ্ণাবরণে এই কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ নাই, এইজন্য তাহাদিগের চক্ষু কটা; এবং এইজন্যই তাহারা উজ্জ্বল আলোকে ভাল দেখিতে পায় না। পেঁচারা ত এইজন্য দিনের আলোকে একেবারেই বাহির হইতে পারে না। শরীরে লোম ও ত্বকের মধ্যে এই পদার্থ অধিক হইলে, কৃষ্ণাবরণেও ইহা বৃদ্ধি হয়; এইজন্য যাহারা গৌরবর্ণ তাহাদের চক্ষু প্রায়ই কটা, এবং যাহারা শ্যামবর্ণ তাহাদের চক্ষুতারকা খুব কাল।

'ঘনত্বক' এবং 'অক্ষিতারকা' যেখানে সংযুক্ত হইয়াছে, সেই সন্ধিস্থলের পশ্চাতে 'সিলিয়ারী' পেশী দেখিতে পাওয়া যায়। (চিত্র দেখ)। ইহা দ্বারা নিকটের এবং দূরের বস্তু দেখার সুবিধা হইয়া থাকে, তাহা পরে বুঝাইব।

কৃষ্ণাবরণের ঠিক নীচে 'অক্ষিজাল' দেখিতে পাইবে। (চিত্র দেখ)। মস্তিষ্ক হইতে দুইটী স্নায়ু নির্গত হইয়া, অস্থিনির্ম্মিত চক্ষুকোটরদ্বয়ের পশ্চাৎস্থিত ছিদ্র দ্বারা চক্ষু মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই 'অক্ষিস্নায়ু' চক্ষু মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্নায়ুর আকার পরিত্যাগ করিয়া একটী ঝিল্লির ন্যায় চক্ষু গোলকের অভ্যন্তরভাগে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহাই চিত্রের 'অক্ষিজাল'। কোন বস্তু দেখিতে হইলে প্রথমে এই অক্ষিজালেই

তাহার চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়, এবং তথা হইতে অক্ষিস্নায়ুর দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়; তখন আমরা একটী বস্তু দেখিতে পাই। চক্ষু হইতে কোন উত্তেজনা মস্তিষ্কে যাইতে হইলে, তাহাকে প্রথমে অক্ষিজালে যাইতে হয়। অক্ষিজালের ঠিক মধ্যস্থলে পীতবর্ণের একটী বিন্দু আছে; কোন বস্তুর প্রতিমূর্ত্তী যখন ঠিক এইস্থলে পতিত হয়, তখনই আমরা উত্তম রূপ দেখিতে পাই।

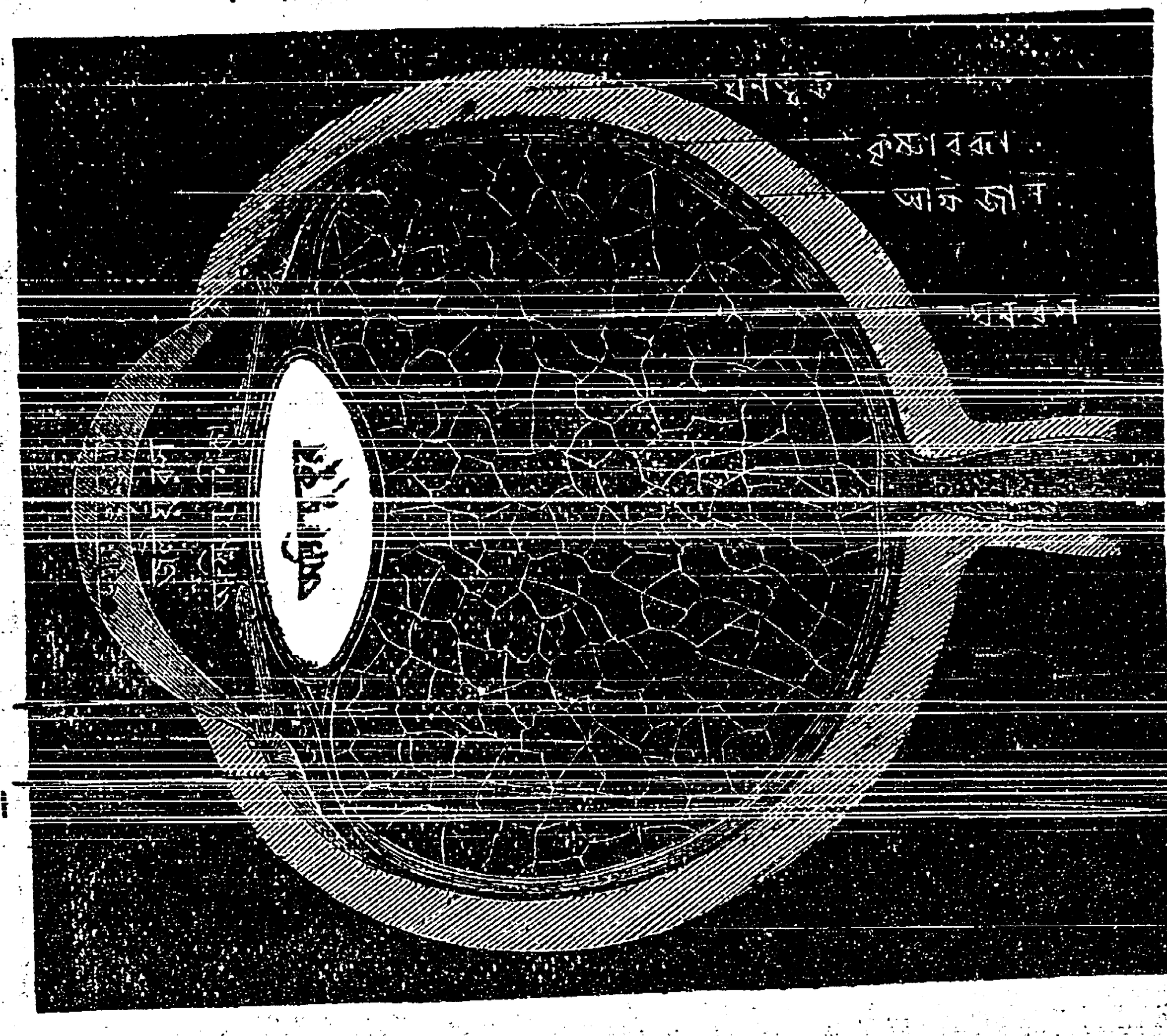

এখন দেখা গেল আমাদের চক্ষু-গোলক চারিটী আবরণে নির্ম্মিত। বাহিরে ঘণাবরণ ও অক্ষিতারকা, তাহার 'সিলিয়ারী প্রোসেস্' নীচে কৃষ্ণাবরণ এবং 'সিলিয়ারী পেশী'। তাহার নীচে অক্ষিজাল। এখন চক্ষু-গোল-কের ভিতরে কি কি পদার্থ আছে তাহা দেখা যাক্।

চক্ষু-গোলকের মধ্যে ডিমের ভিতরের সাদা পদার্থের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ আছে, তাহা-তেই ইহার গোলাকৃতি রক্ষিত হয়। এই পদার্থ দুই প্রকার, সম্মুখভাগ লবণাক্ত ও তরল এবং পশ্চাদভাগ ঘন। ইহাদিগের মধ্যে অক্ষিমুকুর অবস্থিত। সম্মুখভাগের তরল পদার্থকে চিত্রে 'জলীয় রস' এবং পশ্চাদভাগের ঘন পদার্থকে 'ঘন রস' বলা হইয়াছে। (চিত্র দেখ)। এই ঘনরসে চক্ষুগোলকের পশ্চাদভাগের অধিকাংশ পরিপূর্ণ, এবং একটী ঝিল্লি ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া ইহাকে সহস্র ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

উপরে লিখিত দুই রসের মধ্যে এক খানি পুরু কাচের মত যে ডিম্বাকার পদার্থ দেখিতেছ, তাহাকে 'অক্ষিমুকুর' বলে। এই 'অক্ষিমুকুর' স্থিতিস্থাপক, এইজন্য ইহার সম্মুখভাগ কখনও কিঞ্চিৎ চেপ্টা, কখনও বা গোলাকার ধারণ করে। স্থিতিস্থাপক বন্ধনী দ্বারা অক্ষিমুকুর রক্ষিত।

যে লবণাক্ত নির্ম্মল জলবৎ পদার্থ চক্ষু-গোলকের সম্মুখভাগ পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে তাহা আবার পেশী নির্ম্মিত 'অক্ষিযবনিকা' নামক একটী পদার্থ দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। (চিত্র দেখ)। এই অক্ষিযবনিকার যে প্রকার বর্ণ থাকিবে, চক্ষুও সেই বর্ণের দৃষ্ট হইবে। কৃষ্ণাবরণে যেমন কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ আছে, ইহাতেও সেই প্রকার কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ আছে, এই কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ থাকাতে আলোক-রশ্মি চক্ষে পতিত হইলে, ইহার ভিতরে প্রবেশ করিতে না পাইয়া, দুই পার্শ্বস্থিত 'অক্ষি-যবনিকা'র মধ্যস্থলে যে ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে তাহা দ্বারাই যতটুকু সম্ভব ভিতরে প্রবেশ করে। অক্ষি-যবনিকার মধ্যস্থলে যে ছিদ্র তাহাকে 'কনীনিকা' কহে। (চিত্র দেখ)। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে 'অক্ষিজাল' কতগুলি পেশী নির্ম্মিত; এই পেশী-গুলির সংকোচনে কনীনিকা কুঞ্চিত অর্থাৎ ছোট হয়। আবার ইহাদিগের প্রসারণে কনীনিকা প্রসা-রিত হয়। আলোক লাগিলে কনীনিকা কুঞ্চিত হয়।

ইহা তোমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবে যে, অধিক উজ্জ্বল আলোক লাগিলে চক্ষু যেন আপনিই সংকুচিত হইয়া আসে; আবার অন্ধকারে কনীনিকা প্রসারিত হয়। দূরের বস্তু দেখিতে হইলেও কনীনিকা প্রসারিত হয়; আবার অতি নিকটের বস্তু দেখিতে হইলে কনীনিকা কুঞ্চিত হয়। চক্ষুর বাহিরে এবং চতুঃপার্শ্বে কয়েকটী পেশী আছে, এই পেশীগুলির সাহায্যে চক্ষুকে ঊর্দ্ধে, নিম্নে, ভিতর ও বাহিরের দিকে ইচ্ছামত ঘুরাইতে পারা যায়।

চক্ষুর গঠন এবং কি কি পদার্থে চক্ষু গঠিত তাহা লিখিত হইল। এবার আমরা এই খানেই ক্ষান্ত হইলাম। আগামী বারে কি প্রকারে আমরা দেখিতে পাই, বুড়া হইলে কেন চক্ষের দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যায়, অনেকের আবার অল্প বয়সেই বা কেন দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয়, কি উপায়েই বা ইহার সংশোধন হয়, তাহা চিত্র দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

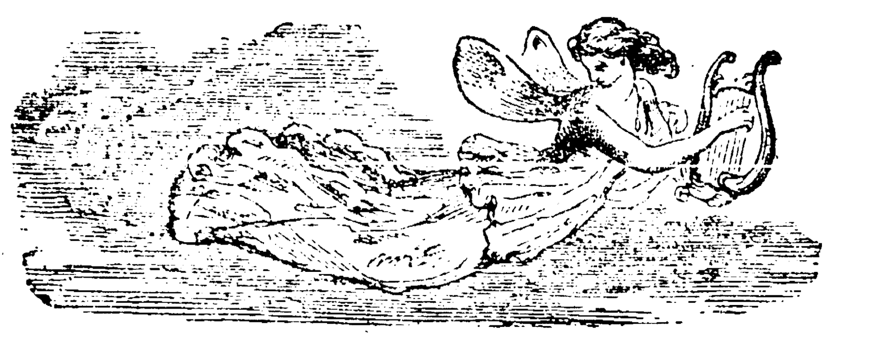

বালক কুশধ্বজ।

সেকালে হিন্দুরা অনেক যাগ যজ্ঞ করিতেন। রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি কত রকমের যজ্ঞ যে হইত, তাহা তোমরা রামায়ণ মহাভারতে পড়িয়া থাকিবে। সে সব যজ্ঞের এক মাত্র মতলব আপনার মহত্ত্ব প্রচার। রাজসূয় যজ্ঞে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রিত করা হইত। এইরূপে নিমন্ত্রিত রাজারা সেই যজ্ঞ স্থলে উপস্থিত থাকিয়া রাজসূয় যজ্ঞ-কারী রাজাকে ভেট দিতেন এবং তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া যাইতেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে একটী "সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্ত" ঘোটকের কপালে "যদি কেহ যোদ্ধা থাক ত এই ঘোড়া বান্ধ, নতুবা অধীনতা স্বীকার কর", এই লিখন লিখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ঘোড়া আপনার ইচ্ছামত ভ্রমণ করিত। রক্ষক সেনাপতি ও সেনাবর্গ তাহাকে বাধা দিত না। যে সমস্ত রাজার রাজ্য দিয়া ঘোড়া যাইত, তাহার অনেকে অধীনতা স্বীকার করিতেন। কেহ কেহ বা অশ্ব ধরিয়া রাখিতেন। তখন দুই পক্ষে খুব যুদ্ধ হইত। প্রায়ই অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠাতা জয় লাভ করিতেন। এইরূপে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজা পরাস্ত ও বশীভূত হইলে যজ্ঞ আরম্ভ হইত। যজ্ঞ-স্থলে সকল রাজা মুনি ঋষিরা উপস্থিত থাকিতেন; খুব সমারোহ হইত।

এই অশ্বমেধ, রাজসূয় যজ্ঞ ছাড়া অনেক সময় অনেক অদ্ভুত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত। অর্জ্জুনের নাম তোমরা মহাভারতে পড়িয়াছ এবং তাঁহার বিষয় সবিশেষ জান। সেই অর্জ্জুনের প্রপৌত্র জন্মেজয় একবার সর্প যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পরীক্ষিত সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করেন তাই সর্প-বংশের উপর তাঁহার বিজাতীয় ক্রোধ হয়। সর্প-বংশ ধ্বংশ করাই সর্প যজ্ঞের উদ্দেশ্য; কিন্তু প্রতিহিংসা যে কার্য্যের মূলে তাহা কখন সুসম্পন্ন হয় না; জন্মেজয়ের সর্প যজ্ঞও সুসম্পন্ন হয় নাই।

আর একটী সৃষ্টি ছাড়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান সেকালে হইয়াছিল। সেই যজ্ঞের বিবরণ দেওয়াই

এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। সে যজ্ঞটীর নাম—"নরমেধ যজ্ঞ"। নাম শুনিয়াই হয়ত বুঝিয়াছ ব্যাপারটা কি? মনুষ্যের মাংসের দ্বারা যজ্ঞের আহুতি দিতে হইবে। এ যজ্ঞ যে সম্পন্ন হয় নাই তাহা অনায়াসেই বুঝিতেছ। বিশেষ বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

পূর্ব্বকালে নহুস নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদা কল্পতরু হন। কল্পতরু কথাটা কি যদি কেহ না বুঝিয়া থাক, আমি উহার অর্থ দুকথায় বলিয়া দিব। কল্পতরু নামে স্বর্গে নাকি একটা গাছ আছে, তাহার কাছে গিয়ে যে যা চায় সে তখনই তাই পায়। সেই রকম দুই একজন রাজা মাঝে মাঝে কল্পতরু হইয়া বসিতেন অর্থাৎ তাঁহার কাছে যে যা চাহিত সে তাহাই পাইত। নহুস রাজা সেইরূপ কল্পতরু হইলে, নারায়ণ ঠাকুর বালকের বেশ ধারণ করিয়া, নহুস রাজার নিকট দ্বার দেশের পাশে এক বর্গ হস্ত ভূমি ভিক্ষা গ্রহণ করেন। জমীটুকু গ্রহণ করার পর নারায়ণ ঠাকুরের আর কোন খোজ রহিল না। তার পর একদিন নহুস রাজা ভুলক্রমে সেই নারায়ণ ঠাকুরের জমীতে হাত মুখ ধৌত করেন। হিন্দু শাস্ত্রে আছে দান করা জিনিস ফিরিয়া লইলে মহা পাপ হয়। নহুস রাজাও সেই পাপে নরকগামী হইলেন।

নহুসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র যযাতি পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু সিংহাসন প্রাপ্তির পর হইতে আর যযাতি রাজার রাত্রিতে নিদ্রা হইত না। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘুমের মধ্যে রাজা প্রত্যহ স্বপ্ন দেখিতেন, যেন তাঁহার মৃত পিতা যমালয়ে নরককুণ্ডে হাত পা বান্ধা অবস্থায় আছেন; যমদূত লৌহ মুদ্গর দ্বারা প্রহার করিতেছে এবং মৃত রাজা কাতর স্বরে তাঁহার পুত্র যযাতিকে নরক যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। প্রত্যহ এইরূপ স্বপ্ন দেখায় যযাতি রাজার মন খারাপ হইয়া গেল। তখন তিনি কুল পুরোহিতকে ডাকাইয়া স্বপ্নের কথা সকল খুলিয়া বলিলেন। কথিত আছে তখন ব্রাহ্মণদিগের এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তাঁহারা ধ্যান করিয়া ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান, সমস্ত কথা জানিতে পারিতেন। রাজকুল পুরোহিতও ধ্যান করিয়া দেখিলেন মৃত রাজা দত্তাপহারী পাপে কলুষিত হইয়া নরকগামী হইয়াছেন। তখন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহই তাঁহাকে এ পাপ হইতে মুক্ত করিতে পারেন না। কৃষ্ণ ঠাকুরও যাকে তাকে দর্শন দিতেন না, ভক্ত যে সেই তাঁহার দর্শন পাইত। বাস্তবিক কথা, ভক্ত ভিন্ন এ জগতে কেহ ঈশ্বর দর্শন পাইতে পারে না। দয়াময় ঈশ্বরকে সরল প্রাণে হৃদয় খুলিয়া ভাবিতে পারিলেই তিনি ভক্তের হৃদয়ে দর্শন দিয়া তাহার প্রাণ শীতল করেন। যাহা বলিতেছিলাম, কৃষ্ণ ঠাকুরত যার তার কাছে আসিবেন না, তবে কি উপায়ে তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইবে। অনেক চিন্তার পর রাজকুল-পুরোহিত স্থির করিলেন যে, কুশধ্বজ নামে এক ব্রাহ্মণ বালক আছে। সে পরম কৃষ্ণ-ভক্ত। কোন প্রকারে তাহাকে বিপদাপন্ন করিতে পারিলে নিশ্চয়ই কৃষ্ণ ঠাকুর দর্শন দিবেন। তখন তাঁহা হইতে মৃত নৃপতির উদ্ধার সাধন হইবে। এই স্থির করিয়া যযাতিকে বলিলেন,—মহারাজ আপনার পিতা ঘোরতর পাপে পাপী এবং সেই জন্য তিনি নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। তাঁহাকে উদ্ধার করিতে হইলে নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কুশধ্বজ নামা ব্রাহ্মণ বালককে এই যজ্ঞে বলি দিতে হইবে। এই কথা শ্রবণ মাত্র উপস্থিত সকলেই

স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু কুলপুরোহিতের কথা মতেই কার্য্য হইবে স্থির হইয়া গেল। কুশধ্বজকে ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল।

কুশধ্বজের পিতা বড় গরীব ছিলেন। ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পাইতেন, তাহা দ্বারা দুবেলা পেট ভরিয়া খাওয়া কুলাইত না। এত কষ্টের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াও কুশধ্বজের মুখ একটী দিনের জন্যও অপ্রসন্ন দেখা যায় নাই। সর্ব্বদাই মুখ যেন হাসি মাখান! কুশধ্বজ খেলা করিতে যাইত, তাহার মাতা সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম্ম করিতেন। অনেক সময়ে কুশধ্বজ খেলা ফেলিয়া মায়ের সঙ্গে গৃহ কর্ম্ম করিত। আর আর বালকের সঙ্গে খেলা করিবার সময়ও কুশধ্বজ নিজেদের গরুটী মাঠে লইয়া চরাইত। কুশধ্বজের সঙ্গে কোন বালকের কলহ, বিবাদ, বা মারামারি হইত না। এমন কি সে কাহাকে উচ্চ কথাটী বলিত না। মিষ্টি কথায় সকলকে ভাই ভাই বলিয়া সে সকল বালকের ভালবাসার পাত্র হইয়াছিল। দশ জন বালক একত্র হইলেই, প্রায়ই দেখা যায় কোন না কোন সময় কোন না কোন কথা লইয়া বিবাদ বাধিয়া যায়। এইরূপ বিবাদ উপস্থিত হইলে কুশধ্বজ দুই পক্ষের হাতে পায় ধরিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিত। এক কথায়,—ভাল ছেলের যে সব গুণ থাকা চাই, কুশধ্বজের সে সমস্তই ছিল। অধিকন্তু সে বড় কৃষ্ণভক্ত ছিল। যখন তখন তাহার মুখে কৃষ্ণ নাম উচ্চারিত হইত। কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন কুশধ্বজের নিত্য কার্য্য। তাহার সঙ্গে অনেক বালক কৃষ্ণ নাম করিতে ভালবাসিত।

কুশধ্বজ এইরূপ পিতা মাতার স্নেহে, এবং হরি নামে মত্ত হইয়া বাল্যকাল কাটাইতেছিল। এমন সময়ে রাজার প্রেরিত লোক তাহাদের কুটীরে দর্শন দিল; তাহার মাতা সে সময়ে কুটীরে ছিলেন না; কুশধ্বজও গরু লইয়া মাঠে খেলাইতে গিয়াছিল। তাহার পিতা কুটীর দ্বারে মলিন মুখে দূরদৃষ্টের কথা ভাবিতে ছিলেন। নদীর ঢেউর মত এক চিন্তার পর আর এক চিন্তা তাহার মনের উপর দিয়া যাইতেছিল। রাজদূত তাহাকে প্রণাম করিয়া পাশে দাঁড়াইয়া আছে, ইহা তিনি জানিতেও পারেন নাই। কিছুকাল বিলম্ব করিয়া রাজদূত বলিল—ঠাকুর ভাবিতেছেন কি? আপনার ভাগ্য আজ ফিরিয়াছে; আর ভিক্ষা করিয়া কাল কাটাইতে হইবে না। অট্টালিকায় বসিয়া রাজভোগ আহার করিয়া সুখে থাকিতে পারিবেন। এখন জিজ্ঞাসা করি আপনার কুশধ্বজ বালকটী কোথায়। ব্রাহ্মণ অপ্রতিভ হইলেন, নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া তাহাকে বসিতে বলিলেন এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দূত প্রকৃত কথা খানিকটা গোপন করিয়া বলিল, মহারাজ নিঃসন্তান, আপনার পুত্র কুশধ্বজকে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করিবেন, এবং আপনাকে এই দশ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। এখন আপনার ছেলেকে শীঘ্র আনিয়া দেন, বিলম্বে মহারাজ অসন্তুষ্ট হইবেন। আর যদি বেশী অর্থের প্রয়োজন হয়, আমার সঙ্গে চলুন রাজ-সরকার হইতে প্রাপ্ত হইবেন। আপনার ব্রাহ্মণী কোথায়; তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া কুশধ্বজকে আনিয়া দিন।

(আগামীবারে শেষ হইবে।)

সখা

সপ্তম ভাগ। ১১শ সংখ্যা।

নবেম্বর, ১৮৮৯।

বিবিধ।

রাজপৌত্র প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টর এই দেশে আসিতেছেন, গতবারে আমরা সে সংবাদ দিয়াছি। তিনি গত ২৪শে কার্ত্তিক শনিবার প্রাতঃকালে বোম্বাই সহরে পৌঁছিয়াছেন। বোম্বাই হইতে পুনা যাইয়া সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া, হায়দরাবাদে গিয়াছিলেন। হায়দরাবাদে নিজাম তাঁহার জন্য প্রতিদিন এক লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন। হায়দরাবাদ হইতে মাদ্রাজ গিয়াছিলেন, সেখান হইতে মহিসুরে গিয়াছেন। ইহাঁর অভ্যর্থনায় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হইতেছে, ইহাতে কত সৎকাজ হইতে পারিত। রাজপৌত্র শীঘ্রই কলিকাতায় আসিবেন।

* *
*

তাঁতিয়া ভীলের প্রাণ-দণ্ডের কথা ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি। হতভাগ্য জব্বলপুরের জুডিশিয়াল কমিসনারের নিকট আপিল করিয়াছিল; কিন্তু আপিলেও তাহার প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা রহিত হইল না। এখন যদি বড় লাট ইহার প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা রহিত করেন। শুনিতেছি অনেকে সেজন্য বিশেষ চেষ্টাও করিতেছেন।

* *
*

আমরা গতবারে লিখিয়াছিলাম যে, জলের ভিতরে কাঁচ কাঁচি দিয়া কাটা যায়। কয়েক জন সখার গ্রাহক আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে, জলের ভিতরে কাঁচ কাঁচি দিয়া কাটা যায় না। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, জলের ভিতরে কাঁচি দিয়া অনায়াসে কাঁচ কাটা যায়। কাঁচি খানি জলের উপরিভাগের সহিত ঠিক সমসূত্রে ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবেন আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা ঠিক।

* *
*

জাহাজ চালাইবার জন্য রেল প্রস্তুত হইবার কথা হইতেছে। সমুদ্র পথে অনেক সময়ে খুব ঘুরিয়া যাইতে হয়; এইজন্য যে স্থানে সমুদ্র-পথে যাইতে হইলে অধিক ঘুরিয়া যাইতে হইবে, সেই সকল স্থানে রেলে করিয়া জাহাজ চালাইবার কথা হইতেছে। এখন কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাইতে হইলে সমস্ত ভারতবর্ষটা ঘুরিয়া যাইতে হয়, কিন্তু

তখন আর তাহা যাইতে হইবে না। রেলে করিয়া জাহাজ বোম্বাইয়ে লইয়া যাওয়া হইবে। তারপর সেখান হইতে সমুদ্র পথে আবার চলিতে থাকিবে। বিজ্ঞানের উন্নতিতে কত কাণ্ডই দেখিতে পাইব।

* *
*

সচরাচর মানুষ চারি বৎসর বয়সে তিন ফিট লম্বা এবং চৌদ্দ সের ওজন হইয়া থাকে। ছয় বৎসরের সময় সাড়ে তিন ফিট লম্বা এবং একুশ সের ওজন, আট বৎসরের সময় চারি ফিট, এবং ২৮ সের, বার বৎসরের সময় পাঁচ ফিট এবং ৩৫ সের, ওজন হইয়া থাকে।

* *
*

আমেরিকার এক সহরের একজন ডাক্তার একটা মুর্গীর চক্ষুতারকা তাঁহার একটী রোগী চক্ষু রোগগ্রস্থ হওয়াতে তাহা উঠাইয়া ফেলিয়া তাহার স্থানে লাগাইয়া দিয়াছেন। রোগী এখন তাহাতে বেশ দেখিতে পাইতেছে।

* *
*

সারা মার্টিন।

ইংলণ্ডে ইয়ারমাউথ নামে একটী নগর আছে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে একটী রমণী বিশেষ গুরুতর অপরাধে ইয়ারমাউথ কারাগারে বন্দী হয়। ইহার একটী সন্তান জন্মিয়াছিল; মাতার স্নেহময়ী কোমল হৃদয়ে সন্তানের জন্য যে অপরিসীম স্নেহ মমতা, অভাগিনীর কঠোর হৃদয়ে তাহার কিছুই ছিল না। হতভাগিণী নিজ সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতাশূন্য হইয়া, লালন পালন বা যত্ন করা দূরে থাক্, নিষ্ঠুর ভাবে সর্ব্বদা তাহাকে প্রহার করিত। এই গুরুতর অপরাধে ইহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। মাতা অপত্য-স্নেহ বিস্মৃত হইয়া সন্তানের প্রতি এ প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারে, ইহা কেহ মনেও করিতে পারেন না। এই রমণীর এই অস্বাভাবিক ব্যবহারে সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ মহিলাগণের হৃদয়ে ইহার অমানুষিক ব্যবহারে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। কিন্তু একটী দুঃখিনী রমণীর কোমল হৃদয়ে এই ঘটনায় অতিশয় গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল। কারারুদ্ধ হতভাগিনীর নিষ্ঠুরতার কথা শুনিয়া, অন্যান্য রমণীগণের ন্যায় ঘৃণা, বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াই ইনি নিরস্ত হন নাই। হতভাগিণীর অন্তঃকরণে এই নিষ্ঠুর কার্য্যের জন্য যাহাতে ক্লেশের উদয় হয়, যাহাতে ইহার হৃদয়ে কঠোরতার স্থানে নারীজাতির স্বাভাবিক কোমলতা ও প্রীতির বিকাশ হয়, নিষ্ঠুরতার স্থানে স্নেহ মমতা স্থান পায়, অসৎপথ পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে সৎপথ অবলম্বন করে, সেই জন্য তাঁহার হৃদয় অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি অতিশয় দরিদ্র এবং সহায়হীন ছিলেন, কিন্তু সাহস, যত্ন, অধ্যবসায়, পরদুঃখ দূর করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা, পরহিত সাধনে ঐকান্তিক ইচ্ছায়, তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। সেই হতভাগিনী রমণীর কথা আর কেহই চিন্তা করিল না; কিন্তু এই নিঃসহায়া চিরদুঃখিনী রমণী কেবল মাত্র ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করিয়া, ইহাকে সুপথে আনিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

এই রমণীর নাম সারা মার্টিন। যে অতিশয় দরিদ্র, যাহার কোন সহায় সম্পদ নাই, লোকে যাহার নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই, এমন অতি সামান্য অবস্থার লোকের দ্বারাও কত বড় মহৎকার্য্য সাধিত হইতে পারে, সারা মার্টিনের জীবনের কার্য্যে আমরা তাহাই দেখিতে পাই। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে নরফোক নামক স্থানে সারা মার্টিনের জন্ম হয়। সারা মার্টিন তাঁহার পিতা মাতার এক মাত্র সন্তান। তাঁহার পিতা ইয়ারমাউথের নিকটে কেইষ্টার নামক স্থানে অতি সামান্য কার্য্য করিয়া সংসার চালাইতেন। বাল্যকালেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হন, এবং তাঁহার বৃদ্ধা পিতামহী তাঁহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন। এই বৃদ্ধা তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন, এবং যে যত্ন ও স্নেহে তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, সারা মার্টিন জীবনেও তাহা ভুলিতে পারেন নাই।

সারা মার্টিন গ্রামের বিদ্যালয়ে অতি সামান্য মাত্র লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। জীবিকা নির্ব্বাহের কোন সংস্থান ছিল না, এবং এমন কেহ সহায়ও ছিল না, যাহার সাহায্যে সংসার চলিবে। সুতরাং অতি অল্প বয়সেই অন্ন সংস্থানের জন্য তাঁহার চেষ্টা করিতে হইল। সারা মার্টিনের যখন চৌদ্দ বৎসর বয়স, তখন তিনি পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখিতে আরম্ভ করেন, এবং এক বৎসর বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত এই কার্য্য শিখিয়া, গ্রামের ভদ্র লোকদিগের বাড়ীতে যাইয়া পরিচ্ছদ প্রস্তুত দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তাহা দ্বারা নিজের এবং বৃদ্ধা পিতামহীর ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতেই পুস্তক পাঠ করিবার ইচ্ছা তাঁহার অতিশয় বলবতী ছিল। যে পুস্তক সম্মুখে পাইতেন তাহাই পড়িতেন; তাঁহার স্মরণশক্তিও খুব প্রবল ছিল। সেলাই প্রভৃতি কাজ এবং গৃহকর্ম্ম করিয়া যে অবসর পাইতেন, সে সময় বৃথা নষ্ট না করিয়া পুস্তক পাঠে ব্যয় করিতেন। বৃদ্ধা পিতামহীর শিক্ষার গুণে, বাল্য বয়স হইতেই সারা মার্টিন অতিশয় সৎ ও বিনয়ী হইয়াছিলেন; তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় কোমল এবং স্নেহশীল ছিল। ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি প্রথমতঃ কিছু উদাসীন ছিলেন। কিন্তু একদিন একটী ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া তাহার অতিশয় পরিবর্ত্তন হইল। সেইদিন হইতে মনোযোগের সহিত তিনি ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধীয় পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলেন; ক্রমে ধর্ম্মভাব তাঁহার মনে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। এই ধর্ম্ম ভাবের প্রভাব তাঁহার সমস্ত জীবনের কার্য্যে দেখিতে পাই।

এই পরিবর্ত্তনের পর হইতে সারা মার্টিনের জীবনে আমরা পরিবর্ত্তনের ফলও দেখিতে পাই। এই সহায় সম্পদহীন দুঃখিনী রমণী যে মহৎকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, এই সময় হইতে তাহার সূত্রপাত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সারা মার্টিনের প্রকৃতি অতিশয় স্নেহশীল ছিল। দুঃখী, অনাথ, অসহায়দিগের দুঃখ দূর করিবার জন্য, তাঁহার সামান্য শক্তিতে যতদূর সম্ভব, তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য,

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার নিতান্ত আগ্রহ ছিল। বিলাতে দরিদ্র ও অনাথ, অসহায় এবং অলস ও অসৎ লোকদিগের জন্য কারখানা (work house) বা দরিদ্রালয় আছে। অলস ও অসৎ লোকদিগকে এই স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া তাহাদিগের দ্বারা কার্য্য করাইয়া লওয়া হয়। যাহারা দরিদ্র, কোন সহায় সম্বল নাই, তাহারাও এই স্থানে যাইয়া কিছু কিছু কাজ করে এবং তাহার পরিবর্ত্তে ভরণপোষণ পায়। দেশের লোক চাঁদা দিয়া এই সকল দরিদ্রালয়ের ব্যয় চালাইয়া থাকেন।

ইয়ারমাউথের দরিদ্রালয়ের লোকদিগের দুরবস্থা দেখিয়া সারা মার্টিন অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে দরিদ্র ছিলেন, সুতরাং অর্থ দ্বারা দরিদ্রালয়ের সাহায্য করিবার সাধ্য তাঁহার ছিল না। কিন্তু অন্য প্রকারে তিনি এই দরিদ্রালয়ের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই দরিদ্রালয়ে একটী মহিলা বহুদিন পর্য্যন্ত রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। কোমল-হৃদয়া সারা মার্টিন এই দুঃখিনী রমণীর দুঃখে ব্যথিত হইয়া, প্রতিদিন ইহার রোগ শয্যার পার্শ্বে বসিয়া, ইহাকে সান্ত্বনা দিতেন এবং সেবা শুশ্রূষা করিতেন। সারা মার্টিনের বয়স এই সময় উনিশ বৎসর মাত্র। বহুদিন রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ঐ রমণীর মৃত্যু হয়। এই দুঃখিনী রমণীর জন্য সারা মার্টিন যে প্রকার যত্ন করিতেন, রোগে তাহাকে যে প্রকার সেবা শুশ্রূষা করিতেন—শোকে যে প্রকার সান্ত্বনা এবং ধর্ম্ম কথা বলিতেন, দরিদ্রালয়ের অধিবাসীগণ তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই দুঃখিনী রমণীর মৃত্যুর পর দরিদ্রালয়ের অনেকগুলি বৃদ্ধ ও রোগ-শোকাতুর লোক তাঁহাকে প্রতিদিন সেখানে আসিয়া ধর্ম্ম কথা বলিবার জন্য এবং রোগ শোকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিল। দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য, সন্তপ্তকে সান্ত্বনা দিবার জন্য, অনাথ অসহায়কে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, সুতরাং সারা মার্টিন নিরতিশয় আহ্লাদের সহিত তাহাদের কথায় স্বীকৃত হইলেন। তিনি ইহাই তাঁহার পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার মনে করিলেন। রোগে সেবা, শোকে সান্ত্বনা এই সময় হইতে তাঁহার নিত্যকর্ম্ম হইল। এতদ্ব্যতীত দরিদ্রালয়ের অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে, এবং একটী রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে (Sunday School) নিয়মিতরূপে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন সেলাইয়ের কার্য্য করিয়া যে অবসর পাইতেন, সেই অবসর সময়ে সারা মার্টিন এই সকল কার্য্য করিতেন। গৃহ কার্য্যও তাঁহাকে করিতে হইত—কারণ তাঁহার বৃদ্ধা পিতামহীর আর এখন কার্য্য করিবার শক্তি ছিল না।

কয়েক বৎসর এই ভাবে অতিবাহিত হইল। কিন্তু সারা মার্টিনের পরোপকারের প্রবৃত্তি ইহাতে তৃপ্ত হইল না। যে কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, এই সময় হইতে সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। কার্য্যানুরোধে অনেক সময় সারা মার্টিনকে ইয়ারমাউথ কারাগারের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতে হইত। প্রতিদিন কারাগারের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতে স্বভাবতঃই কারাগারের অপরাধীদিগের কথা তাঁহার মনে উঠিত। কারাগারের অপরাধীদিগের অবস্থা সে সময় অতিশয় শোচনীয় ছিল। এলিজাবেথ ফ্রাইএর জীবনীতে লিখিবার সময়, আমরা সে সময়ের কারাগারের দুর্দ্দশার কথা বর্ণনা করিয়াছি, সুতরাং এখানে আর পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। অপরাধীদিগকে কঠোররূপে শাস্তি দেওয়াই তখন

কারাগারের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। হতভাগ্যদিগের চরিত্র যাহাতে সংশোধিত হইতে পারে, এমন কোন উপায়ই করা হইত না। চরিত্র-সংশোধন দূরে থাক্, একবার যে কারাগারে প্রবেশ করিত, সে যে আর কখনও সৎপথে থাকিয়া জীবন যাপন করিবে, সে আশাও থাকিত না। অল্পবয়স্ক বালক বালিকারা এবং অন্যান্য যাহারা অতি সামান্য অপরাধে জেলে যাইত, অতি সামান্য চেষ্টাতেই তাহাদের চরিত্র হয়ত সংশোধিত হইতে পারিত। কিন্তু কারাগারের গুরুতর অপরাধীদিগের সংসর্গে ইহাদের চরিত্র অধিকতর অসৎ হইয়া উঠিত, কারামুক্ত হইয়া সৎপথে জীবন যাপন করা দূরে থাক্, ইহারা অধিকতর অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। কারাধ্যক্ষগণ ইহাদিগকে পশুবৎ দেখিতেন। হতভাগ্য হতভাগিনীগণ পেট ভরিয়া খাইতে পাইত না, শীত নিবারণ দূরে থাক্, লজ্জা নিবারণের জন্য উপযুক্ত বস্ত্র পাইত না। আলোক-শূন্য, বায়ু-শূন্য মনুষ্যের বাসের অযোগ্য সঙ্কীর্ণ গৃহে ইহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত।

এই হতভাগ্য হতভাগিনীদিগের কথা কেহ মনেও করিত না, ইহাদিগের শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা কেহ চিন্তাও করিত না। ইহাদিগের দুঃখে কাহারও হৃদয় ব্যথিত হইত না! ইহাদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচন করিবার জন্য কোন কথা উপস্থিত হইলে, অসাধ্য বলিয়া কেহই তাহাতে মনোযোগ করিত না। কিন্তু এই দরিদ্রা রমণীর পরদুঃখকাতর হৃদয় এই হতভাগা হতভাগিনীগণের দুঃখ দুর্দ্দশা দর্শনে নিরতিশয় ব্যথিত হইল। ইহাদিগের দুঃখ মোচনের জন্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। এলিজাবেথ ফ্রাই ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে নিউগেট কারাগারের সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু এই দরিদ্রা নিঃসহায়া পরোপকারিনী রমণী, তাহার পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ইয়ারমাউথ কারাগারের অপরাধী অপরাধিনীদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচন জন্য, এবং তাহারা যাহাতে সংশোধিত হইয়া সৎভাবে জীবন যাপন করিতে পারে সেজন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। কি উপায়ে তিনি তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধ করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। নিজে তিনি অতিশয় দরিদ্র এবং অতি সামান্য অবস্থার লোক। তাঁহার সহায় সম্পদ কিছুই নাই, তাঁহার নামও কেহ জানে না। কেমন করিয়া তিনি এত বড় কাজে একাকী অগ্রসর হইবেন, এবং কেমন করিয়াই বা তাঁহার মনের অভিলাষ পূর্ণ হইবে ভাবিয়া তিনি আকুল হইলেন। এলিজাবেথ ফ্রাই উচ্চবংশে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার সহায় ছিল, সম্পদ ছিল, কিন্তু সারা মার্টিন নিরতিশয় দরিদ্র, অতি সামান্য অবস্থার লোক। কে তাঁহার কথা শুনিবে, কে তাঁহাকে সহায়তা করিবে, কি প্রকারে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? কিন্তু পরহিতের জন্য তাঁহার হৃদয়ে যে প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছিল, এ সকল বিঘ্ন বাধাতে তাহার বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইল না। সারা মার্টিন ইহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন;—হতভাগা হতভাগিনীদিগের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন।

সারা মার্টিন নিজ সংকল্প সিদ্ধির জন্য সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিলেন; এমন সময়ে এই আখ্যায়িকার আরম্ভে বর্ণিত ঘটনাটী ঘটিল। পরদুঃখকাতর-হৃদয়া সারা মার্টিন এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া আপনার অভিষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। সেই কঠোর হৃদয়া রমণীর ঘোরতর অপরাধের কথা শুনিয়া, তিনি অতিশয়

ব্যথিত হইলেন। এই আট নয় বৎসর পর্য্যন্ত যে সংকল্প তাঁহার মনে জাগিতেছিল, এই ঘটনায় তাহা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। সহায়হীন সম্বলহীন দরিদ্রা রমণী কেবল মাত্র ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সেই হতভাগিনী রমণীর নাম জানিয়া কারাগারে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, কারাধ্যক্ষের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

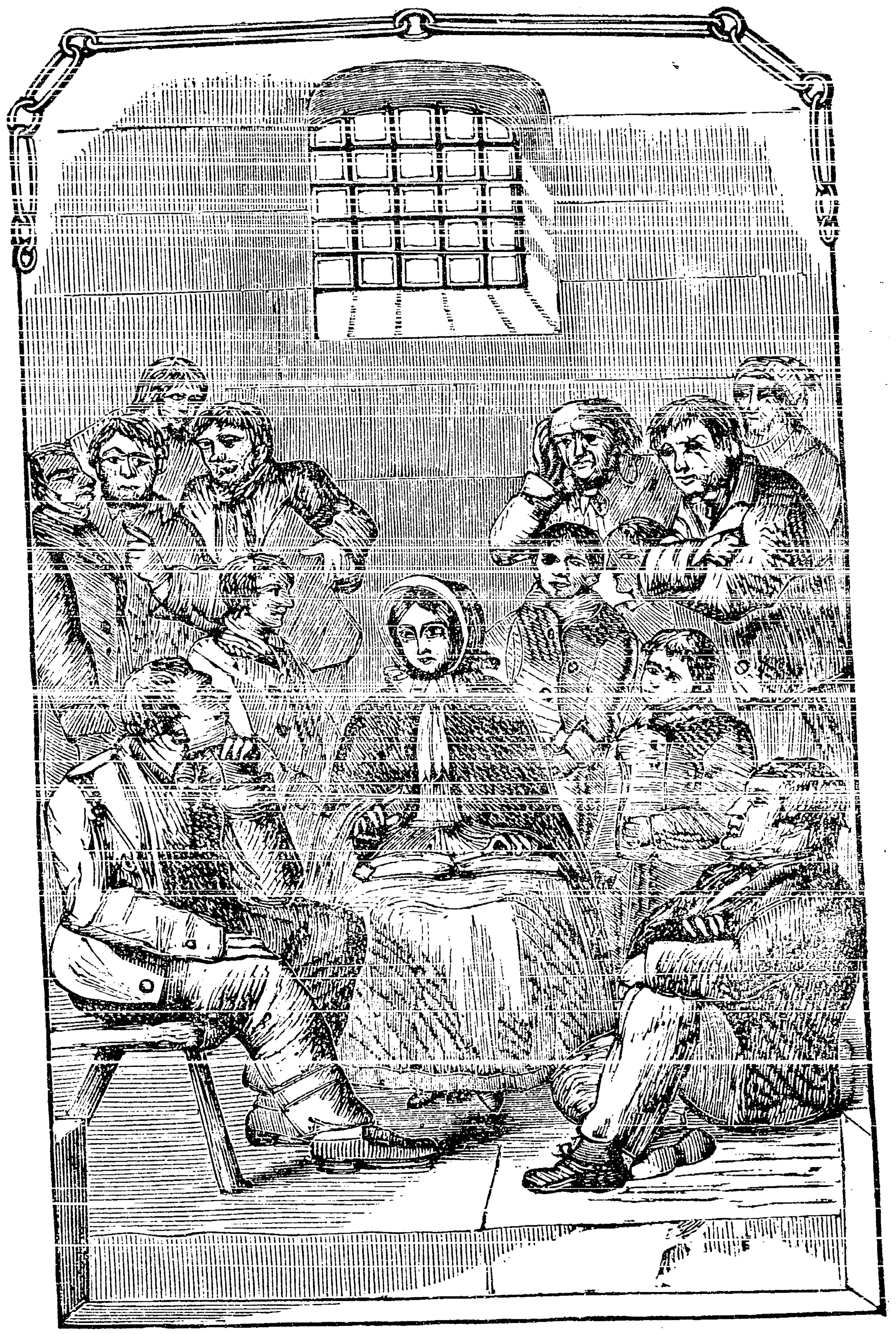

সৎকার্য্যে বহু বিঘ্ন। কারাগারে প্রবেশ করাই দুর্ঘট হইয়া উঠিল, তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। সারা মার্টিন ইহাতে নিরাশ হইলেন না; তাঁহার উৎসাহ, অধ্যবসায় ইহাতে বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইল না। তিনি অতি বিনীত ভাবে দ্বিতীয়বার প্রার্থনা করিলেন, এবার তাঁহার আশা পূর্ণ হইল। অনুমতি পাইয়া সারা মার্টিন কারা গৃহে প্রবেশ করিলেন। সারা মার্টিন যখন সেই হতভাগিনী রমণীর

সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন পর্য্যন্ত সে তাঁহার উদ্দেশ্য কিছু বুঝিতে পারে নাই; একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া সে কিছু বিস্মিত হইল মাত্র। কিন্তু যখন তিনি তাহাকে তাঁহার সেখানে যাইবার উদ্দেশ্য জানাইলেন; সে কি গুরুতর পাপ করিয়াছে, তাহা যখন তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, তখন সেই হতভাগিনীর কঠোর নিষ্ঠুর অন্তঃকরণ গলিয়া গেল। সে নিজ পাপ স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। সারা মার্টিন কারাগারে প্রথম প্রবেশ করিয়াই তাহার ফল পাইলেন। তিনি বুঝিলেন অতিশয় কঠোর এবং অসৎকেও স্নেহ দ্বারা বশীভূত করা যায়— স্নেহে শত্রুও পরাজিত হয়। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবেই। এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া সারা মার্টিন উৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ কিছুকাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন পোষাক বিক্রয়ের পর যে সময় পাইতেন, সেই সময়ে কারাগারে যাইয়া, অপরাধিনীদিগকে ধর্ম্ম-পুস্তক পড়িয়া শুনাইতেন। অল্পদিন পরেই তিনি তাহাদিগকে রীতিমত শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন। কিন্তু এ কার্য্যে অধিক সময়ের আবশ্যক, তিনি যে অবসরটুকু পাইতেন, তাহাতে ইহাদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। বিশেষতঃ যাহারা অতি সামান্য ভাবে সেলাইয়ের কার্য্য করে, তাহারা এত অল্প লাভ পায় যে, দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিলে, তাহাতে আর কুলাইয়া উঠে না। সারা মার্টিন সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন, অতি কষ্টে তাহাতে তাঁহাদের দিনপাত হইত। তিনি দেখিলেন, সেই সময়ের কতকটা যদি ইহাদিগের শিক্ষা দিবার জন্য ব্যয় করেন, তবে তাঁহাদের দিন চালানই কঠিন হইয়া উঠিবে। কিন্তু ইহা বুঝিয়াও তিনি নিরস্ত হইলেন না। এই হতভাগ্য হতভাগিনীদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন, সুতরাং ক্ষতি ও কষ্ট স্বীকার করিয়াও তিনি ইহাদিগের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য অগ্রসর হইলেন। তিনি দেখিলেন, ইহাদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক, এবং তাঁহাকেই সেই ভার লইতে হইবে। সুতরাং সারা মার্টিন হৃষ্টচিত্তে, প্রতিদিন অবসর সময়ে শিক্ষা দান ব্যতীত, সপ্তাহের মধ্যে একদিন ইহাদিগের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবেন স্থির করিলেন। ইহাতে তাঁহার ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হইবে, এমন কি ব্যবসায় একবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। কিন্তু পরহিতের জন্য যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, নিজ স্বার্থ চিন্তা করিবার আর তাহার অবসর কোথায়? সারা মার্টিনের ব্যবসায়ের ইহাতে অনেক ক্ষতি হইল, কিন্তু পরদুঃখকাতর-হৃদয়া রমণী সে ক্ষতি গণনার মধ্যেও আনিলেন না; হৃষ্টচিত্তে সে ক্ষতি সহ্য করিতে লাগিলেন! পরহিত ব্রতের ইহা অপেক্ষা আর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কি হইতে পারে? যাঁহার অবস্থা স্বচ্ছল, যাঁহার অর্থের অভাব নাই, তিনি একটা সৎকাজে দশ টাকা ব্যয় করিতে পারেন; কিন্তু যে দরিদ্র, সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যে উদরান্নের সংস্থান করে, তাহার পক্ষে এ প্রকার ত্যাগ স্বীকার সহজ কথা নহে!

(আগামী বারে শেষ হইবে।)

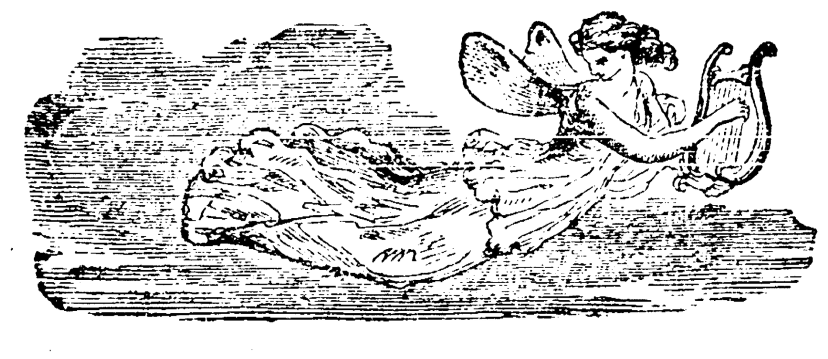

কুশধ্বজ।

(১৬০ পৃষ্ঠার পর।)

দরিদ্র হইলে লোকের বিবেচনা শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। কুশধ্বজের পিতা বেশ বুদ্ধিমান ছিলেন, কিন্তু দরিদ্রতায় পড়িয়া এখন তাঁহার বুদ্ধি লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। তিনি কুশধ্বজকে বিক্রয় করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। পণাপণও স্থির হইয়া গেল, তবে একবার ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা মাত্র। ব্রাহ্মণীও এই সময় গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত কথা শুনিয়া চারি দিক অন্ধকার দেখিলেন। গৃহের যাবতীয় দ্রব্যে কুশধ্বজের মোহিনী ছবিখানি দেখিতে পাইলেন। মায়ের প্রাণে এ দারুণ কথা অসহ্য হইল, তিনি কিছুতেই কুশধ্বজকে নয়নের অন্তরাল করিতে সম্মত হইতে পারিলেন না। আহা! হাজার হইলেও মায়ের প্রাণ এমন কথা শুনিয়া কি স্থির থাকিতে পারে? যাহাকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়া কষ্টের একশেষ হইয়াছে, এই আট বৎসর যাবৎ যাহাকে কত যত্নে কত ক্লেশ স্বীকার করিয়া, নিজের আহার যাহাকে দিয়া পালন করিয়াছেন, সেই প্রাণাধিক পুত্রকে কি মায়ের প্রাণ থাকিতে ছাড়িয়া দিতে পারেন? ব্রাহ্মণী বলিলেন "আমার প্রাণ যায় সেও স্বীকার তবুও বাছাকে বিক্রয় করিতে দিব না। তুমি আহার যোগাইতে না পার আমি ভিক্ষা করিয়া, দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাছাকে প্রতি পালন করিব। লোকালয়ে যদি স্থান না হয়, বাছাকে কোলে লইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, বন ফল আহরণ করিয়া খাওয়াইব। আমার নিজের ক্ষুধা পেলে বাছার মধুমাখা মা মা ডাক কর্ণ স্পর্শ করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিব। স্বামীন! বৃথা ধনের আশায় জগতের সার পুত্ররত্নকে বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছ। এই টাকার তোড়াটী একবার বুকে রাখ, আর কুশধ্বজকে একবার বুকে রাখ, দেখ কিসে বুক জুড়ায়। দুদণ্ড যাহাকে না দেখিলে মন ব্যাকুল হয়, গৃহ শূন্য বলিয়া বোধ হয়, দিন রাত অনিমেষ নয়নে যাকে দেখিলে নয়ন তৃপ্ত হয় না, তাকে কেমন করিয়া চিরদিনের জন্য বিদায় দিব! কুশধ্বজের মুখখানি একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তাকে ছেড়ে থাকা যায় কি না?" ব্রাহ্মণীর কথায় ব্রাহ্মণঠাকুর কি করিবেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। একবার ভাবিলেন ব্রাহ্মণীর কথাই রাখি, আবার ভাবিলেন কুশধ্বজ আমার গৃহে থাকিলে উপবাসেই কাল কাটাইবে। রাজার ঘরে গেলে দু বেলা ত ভাল ভাল খাবার জিনিস খেতে পাবে; বাছা আমার সুখে থাকবে। আমার কষ্ট হয় হউক, কুশধ্বজকে বিক্রয় করিব; না হয় তাহার অদর্শনজনিত শোকে প্রাণত্যাগ করিব। অনেক চিন্তার পর ঠিক হইল সন্তান বিক্রয় করিবেন। এই সময় কুশধ্বজ মা মা বলিতে বলিতে গৃহ প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণী পুত্র কোলে তুলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। পিতা মাতার এরূপ অবস্থা দেখিয়া কুশধ্বজ বড় ব্যাকুল হইল। অবশেষে রাজদূত মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া মাতাকে বলিল; "মা! রাজার কথা শুন। আমাকে বিক্রয় করিলে তোমরা চিরকাল স্বচ্ছন্দে কাটাইতে পারিবে। আমার জন্য দুঃখ কর কেন। পিতা মাতার দুঃখ দূর করা সন্তানের প্রধান কর্ত্তব্য; সে কর্ত্তব্য যে

আমি কোনদিন পালন করিতে পারিব এমন বোধ হয় না। তবে যদি সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। মহাশয়! মা যাই বলুন, টাকা দিয়া আমাকে লইয়া চলুন।" ব্রাহ্মণীর ক্রন্দন, ব্রাহ্মণের সেই শোচনীয় দশা, কুশধ্বজের খেলার সাথিদের স্বকরুণ বিলাপ লিখিয়া প্রস্তাব বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা নাই। যাইবার সময় কুশধ্বজ মাতাকে বলিল,—"জন্ম মৃত্যু, মিলন বিচ্ছেদ, সুখ দুঃখ সকল সেই শ্রীকৃষ্ণের নিয়ম। এ নিয়মের গুঢ়তত্ত্ব ভেদ করা মনুষ্য বুদ্ধির অতীত। তবে সুখে দুঃখে, আহ্লাদে শোকে, সম্পদে বিপদে, আমরা যেন নিত্য ধন শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া না যাই। শ্রীকৃষ্ণ দয়াময়, তাঁহার রাজ্যে অনিয়ম নাই। তিনি যাহা করেন সকল মঙ্গলের জন্য, আমরা ভ্রান্ত তাই বুঝিতে পারি না। মা, আমার জন্য কেঁদনা, আমি কে? আমাকে ভাল বাসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া যাইও না। ইহকালের, পরকালের সঙ্গী সে মধুসূদনকে এক মনে ডাক, তাঁকে ভালবাস, তিনি তোমার মনে শান্তি দিবেন। মা, একবার হরিবোল বল, দেখ্‌বে হরিবোল কেমন মিষ্ট। আমি চলিলাম, আশীর্ব্বাদ কর যেন কোন সময় কোন অবস্থাতেই হরি নাম ভুলিয়া না যাই।"

ইহার পর সেই যজ্ঞস্থল। মুনি ঋষিরা সমস্বরে বেদ গান করিতেছেন। ব্রাহ্মণদিগের মুখোচ্চারিত বেদমন্ত্রে সভাস্থল পরিপূর্ণ। নানা দেশের রাজা সভার শোভা সম্পাদন করিয়া বসিয়াছেন। অদ্ভুত যজ্ঞ দর্শন জন্য চারিদিক হইতে লোক আসিয়া সভাস্থল জনাকীর্ণ করিয়াছে। সকলেই কি কাণ্ড দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে, এমন সময় রাজ পুরোহিত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, নরপশু আনয়ন কর। বলিবামাত্র প্রহরী বেষ্টিত সেই দেবোপম-কান্তি ব্রাহ্মণ বালক যজ্ঞ স্থলে প্রবেশ করিল। বালকের সেই চাঁদ মুখখানি দেখিয়া উপস্থিত দর্শক মণ্ডলী স্তম্ভিত হইল। কি শোচনীয় দৃশ্য তাহাদিগকে দেখিতে হইবে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল। তখন সকলে মহারাজকে ধিক্কার দিতে দিতে প্রস্থান করিল। মুনি ঋষিরা বেদ ফেলিয়া পলায়ন করিলেন। মন্ত্রের অর্দ্ধেক উচ্চারিত হইয়াছে অর্দ্ধেক উচ্চারণ করিতে মুখ ব্যাদন করিয়াছেন, এই অবস্থায় ব্রাহ্মণেরা পলায়ন করিলেন। রাজারা সকলে সমবেত হওয়া যজাতিকে এই দুষ্কর্ম্মের সমুচিত প্রতিফল দিবার জন্য, সভা ত্যাগ করিয়া নগর তোরণে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজমহিষী কান্দিতে কান্দিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজা, রাজ পুরোহিত ও কতিপয় প্রহরী এবং ঘাতুক ভিন্ন, যজ্ঞ স্থলে আর কেহই রহিল না। রাজ পুরোহিত নরপশু উৎসর্গ করিলেন। রক্ত বস্ত্র দ্বারা কুশধ্বজের মুখ ঢাকা হইল। ঘাতুক শাণিত তরবারী হস্তে বালকের কোমল কণ্ঠ চ্ছেদন করিতে অগ্রসর হইল। হায়! নির্দ্দয় মানুষ পশুর সমান। নখের আঘাতে যে ফুলের বোঁটা ছেঁড়া যায়, তাহাকে কাটিবার জন্য কে শাণিত কুঠার ব্যবহার করিয়া থাকে। আমরাও বলি যযাতি রাজাকে ধিক্, যিনি এমন কাজ করিতে সম্মত হইতে পারিয়াছেন। যখন জীবনের আর আশা রহিল না, তখন ক্ষীণ কণ্ঠে কুশধ্বজ হরিনাম গান করিতে লাগিল,—"হে হরি, ভব-দুঃখ ভঞ্জন, হে ভক্ত বৎসল, আজ আমার মানব জন্ম অবসান হইল। প্রাণ ভরিয়া তোমার নাম করিতে পারি নাই, তোমাকে ভুলিয়া কত সময় খেলায় মন দিয়াছি, তোমার কথা না কহিয়া কত সময় কত বাজে কথা বলিয়াছি, এইত আমার জীবনলীলা ফুরায়। বৃথা কাজে এতদিন কাটাইয়াছি এখন আমার

গতি কি হইবে? হে অগতির গতি, তুমি আমায় দর্শন দেও—এ কথা বলিতে আমার সাহস হয় না। আমি তোমার দর্শন পাইবার অধিকারী নই। প্রহ্লাদকে কত বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে, আমি তোমার নিকট তেমন জীবন ভিক্ষা চাই না। তবে এই ভিক্ষা যেন নবজীবন লাভ করিয়া তোমার রাজ্যে চিরকাল বাস করিতে পারি। দয়াময়! দয়া করিয়া আমার মাকে সান্ত্বনা দিও। তিনি আমার জন্য উতলা হইলে, আমার হ'য়ে তাঁকে মা ব'লে ডাকিও। হরি হে, হৃদয়ে তোমার যে চরণ এযাবৎ ধ্যান করিয়া আসিতেছি, অন্তিম সময় সে চরণ হৃদয় ছাড়া করিও না।” শাণিত কৃপাণ উর্দ্ধে উথিত হইল, মুহূর্ত্তের জন্য অবশিষ্ট দর্শকগণের নয়ন মুদ্রিত হইল। যথন সকলে নয়ন মেলিয়া দেখিল, তথন এক অদ্ভুতপূর্ব্ব দৃশ্য সকলের চিত্ত মোহিত করিল। সে দৃশ্য সকলের ভাগ্যে ঘটে না। চতুর্ভুজ হরি কুশধ্বজকে কোলে করিয়া বসিয়াছেন। ঘাতুক মুর্চ্ছিত অবস্থায় দূরে পড়িয়া আছে। সকলেই সেই শ্রীহরির চরণ প্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। তথন হরি বলিলেন “পুরোহিত ঠাকুর, কোন্ শাস্ত্র মতে এই নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন?” পুরোহিত বলিলেন “আমি শাস্ত্র জানি না, আপনাকে জানি, আপনাকে দেখিব বলিয়া এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এখন মৃত মহারাজকে পাপ মুক্ত করিয়া আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।” “তথাস্তু” বলিয়া হরি অন্তর্ধ্যান হইলেন। কুশধ্বজের বাটী গমন, পিতা মাতার সঙ্গে মিলন, আর অধিক কি বলিব। বালক বালিকারা তোমরা মনে মনে কল্পনা করিয়া লইও।

বজ্রকবচ বা পুত্তিকাভুক্।

সেদিন একটি বড় কৌতুকাবহ ঘটনা হইয়াছিল। সখার পাঠকগণের জন্য তাহা বলিতেছি। আমার একটি বন্ধুর বাড়িতে তাঁহার চাকরেরা রাত্রিকালে শুনিতে পাইল কে যেন তাঁহার থালা ঘটী বাটি নাড়িতেছে। তাহারা চোর মনে করিয়া শশব্যস্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া দেখিতে গেল। দেখিল চোর নহে, ভোঁদড়ের মত একটা জন্তু বারাণ্ডায় থালা বাটি নাড়িতেছে। পাছে পলাইয়া যায়, এই ভয় করিয়া তাহারা লাঠি ঠেঙ্গা আনিয়া তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। জন্তুটি তাহাদিগের সরঞ্জাম দেখিয়া গুড়ি গুড়ি করিয়া বাগানের প্রাচীরের দিকে চলিয়া গেল। জন্তুটি যে কি, তাহা উহারা অন্ধকারে ভাল দেখিতে পাইল না, কিন্তু লাঠি ঠেঙ্গা দিয়া উত্তম মধ্যম রূপে আন্দাজে আন্দাজে বিলক্ষণ প্রহার আরম্ভ করিল। প্রথমে তুই চারিবার অঘাত পাইয়া কোঁ কোঁ করিল। কিন্তু পরে আর কোন শব্দ না করিয়া গুড়াইয়া একটা পিণ্ডের মত ইহয়া পড়িল। চাকরেরা মারিয়া মারিয়া দেখিল যে, সেই জন্তুটি সেইরূপ পিণ্ডের মতই পড়িয়া রহিল। তথন মারিতে নিরস্ত হইয়া অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জন্তুটি পুনর্ব্বার লম্বা হইয়া গুড়ি মারিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। তথন তাহারা নিরুপায় হইয়া ভাবিতে লাগিল—

“মারিলে না মরে জন্তু এ কেমন বৈরী।” অবশেষে সাহসে ভর করিয়া দড়ি আনিয়া বাঁধিবার আয়োজন করিল। দীপ আনিয়া বাঁধিতে গেল। দেখিল জন্তুটি পুনর্ব্বার পুঁটলি হইয়া

পড়িয়া আছে ও মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত লম্বা জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া বাহির করিতেছে। যাহা হউক কোন ক্রমে তাহার বন্ধন দশা ঘটিল। প্রাতঃকালে আমি দেখিতে গেলাম।

জন্তুটি চতুষ্পদ। প্রত্যেক পদে পাঁচটি করিয়া বড় বড় নথ। একটি লম্বা লেজ আছে, তাহা প্রায় শরীরের ন্যায় দীর্ঘ। লেজের প্রথমাংশ মোটা হইয়া শেষের দিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমুদয় শরীর ও লেজ বিলক্ষণ পুরু ও কঠিন আঁইশে আচ্ছাদিত। মস্তকের ও শরীরের নিম্নভাগে আঁইশ নাই। রোহিত মৎস্যের আঁইশের ন্যায় উহার আঁইশ। কিন্তু তেমন চক্‌চকে নহে। আঁইশ মেটে রঙ্গের। কর্ণদ্বয় প্রায় দেখা যায় না। মুখে দাঁত নাই, জিহ্বাটি প্রায় গোল ও প্রায় চেপ্‌টা এবং সাতিশয় দীর্ঘ হওয়াতে বহির্গত হইলে লক্ লক্ করে।

রাত্রিকালে উহা আহার সংগ্রহ করে। উই পিপিলিকা মাত্র আহার করে। উই বেশী প্রিয় সামগ্রী। লম্বা জিহ্বা বাহির করিয়া উই ও পিপিলিকার গর্ত্তের মুখে দিয়া উহাদিগকে আপনার মুখে টানিয়া লয়। জিহ্বাতে এক রকম আটার মত লাল আছে। তাহাতে পিপিলিকা জড়াইয়া যায়। জল দিলে জিহ্বা দিয়া চক্ চক্ করিয়া এত ঘন ঘন থায় যে জলে শীঘ্রই ফেণা জমিয়া যায়। দিবসে পড়িয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় হইতেই আগার অন্বেষণ করে।

মারিলে কিম্বা নাড়িলে সরু মস্তকটি সম্মুখের পদদ্বয়ের মধ্যে লুকায়। পরে গোলার ন্যায় হইয়া শরীরের উপর লেজটি গুটাইয়া দেয়। চলিবার সময় সম্মুখের পায়ের নথ গুটাইয়া পায়ের উপরিভাগ দিয়া চলিতে থাকে।

নথ দিয়া উহা মৃত্তিকার নীচে বড় বড় গর্ত্ত করিয়া বাস করে। গর্ত্তগুলি প্রায় ৩।৪ হাত বড়। গর্ত্তের মুখ মাটি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখে। এজন্য বাহির হইতে গর্ত্তের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। বাসস্থান করিবার জন্যই, বোধ হয়, উহার বড় বড় কঠিন ও বাঁকান নথ আছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উহার দন্ত আদৌ নাই। এজন্য প্রাণি-বিজ্ঞানে উহাকে অদন্ত-শ্রেণীর মধ্যে ধরা যায়। আমেরিকাতে উহার অপর কয়েকটি জাতিভাই আছে। তাহারা শ্লথ, বজ্রকবচ ও লোমশ পিপিলিকাভুক্ নামে পরিচিত। আমাদের দেশের এই প্রাণীটির দেহ লোমের পরিবর্ত্তে কঠিন আঁইশে আচ্ছাদিত। আঁইশ অত্যন্ত কঠিন হওয়াতে ইহার একটি নাম বজ্রকবচ। কোন কোন স্থানে ইহাকে বজ্রকীট বা বজ্রকাপাতা বলে। রঙ্গপুরে বোধ হয় ইহার নাম কেওট-মাছ। কেওটদিগের নিকট উহার মাংস নাকি বড় সুস্বাদু। উই বা পুত্তিকা থায় বলিয়া উহাকে কথন কথন পুত্তিকাভুক্ বলা যায়। পাহাড়িয়া স্থানেই সচরাচর বাস করে। এদেশে কিম্বা আসিয়ার অপরাপর স্থানেও ইহা বড় বেশী দেখা যায় না।

আজি কাল অদন্ত-শ্রেণীর প্রাণীর সংখ্যা বড় অল্প। বহুকাল পূর্ব্বে উহাদিগের বিলক্ষণ প্রতাপ ও সংখ্যা ছিল। কালক্রমে প্রায় নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে।

শীতকালে এই জন্তুর ছানা হয়। একবারে একটি বা তুইটির বেশী ছানা হয় না। জন্তুর বুকে তুধের তুইটি বাঁট আছে।

এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে যে কত প্রকার জীব বাস করিতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। মৎস্য শ্রেণী প্রাণীরই আঁইশ থাকে। দেখ, এই চতুষ্পদ, মৎস্যের ন্যায় আঁইশে আচ্ছাদিত।

আমাদের দেশের লোকেরা ও চীনবাসীরা উহার আঁইশের অঙ্গুরীয় প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে। উহাতে নাকি অর্শ প্রভৃতি রোগের উপশম হয়।

দুষ্টু-ছেলে।

আজ সকালে, সারা হলো, ঘর সংসার কাজ,
চাকর দাসী, বড়ই খুসি, খুব জিরুবে আজ!
বাড়ীর যত, মেয়েগুলি, এই অবসর পেয়ে,
আপন আপন, কর্ম্ম করে, আপন ঘরে যেয়ে!
কেউ পড়িছে, কেউ শুনিছে, কেউবা সেলাই করে,
নিষ্কর্ম্মা মেয়েগুলো গল্প ক'রে মরে!
মেজ পিসি, বুনেন মোজা, নূতন খোকার তরে,
তাঁর পাশেতে, সোণার ছেলে, ঘুমায় অকাতরে!
পড়ার ঘরে, ঠাকুর-মা, চেয়ার পেতে নিয়ে,
পড়েন বসে, মহাভারত দেয়াল ঠেসান দিয়ে!
হেন সময়, নগেন বাবু, ছুটাছুটী ক'রে
ইস্কুল হ'তে, এলেন ঘরে, মহা আমোদ ভরে!
স্কুলের আজ, কর্ত্তা বাবু, এসেছিলেন ব'লে,
আজ সকালে, তাইতে ছুটী, যত ছেলের দলে!
সেই কারণে, নগেন বাবু, আহ্লাদে আট্‌খান্!
ঘরে এসে, চীৎকারেতে, ফাটিয়ে দেন কাণ্!
ত্যক্ত হ'য়ে, ঠাকুর-মা, পড়ায় ব্যাঘাত পেয়ে,
"চুপ্ কর্‌রে, দুষ্টু-ছেলে", বলেন তাড়া দিয়ে!
আপনি এলি, পড়ে শুনে, খেল্‌গে যা এখন,
চীৎকারে কাণ, ঝালাপালা, করিস্‌নে এমন!
কথা শুনে, বড়ই রাগ, হ'লো বাবুর মনে!
চুপ্‌টি ক'রে, বসেন গিয়ে, ঘরের এক্‌টী কোণে!
আপন মনে, ঠাকুর-মা, পড়েন বসে বই,
দেখেন চেয়ে, নগেন বাবু, আড়-নয়নে ওই!
দেখে তাঁকে, মুচ্‌কে হেসে, সেলেট খানি নিয়ে,
কি জানি কি, লেখেন বাবু, বুড়ির পানে চেয়ে!
খানিক পরে, মেজ পিসি, আড়াল থেকে এসে,
এক টানেতে, সেলেট খানি, কেড়ে নিলেন হেসে!
বলেন "ওমা, দেখ তোমার, দুষ্টু নগের কাজ,
আঁক্‌তে ছিল, তোমার ছবি, রাগের ভরে আজ!"
হেসে মরে, দেখে বুড়ি, ছবি আপনার!
চস্‌মা চোকে, পড়েন ব'সে, আহা কি বাহার!
নগেন বাবু, দাঁড়িয়ে কাছে, দুষ্টু হাসি হাসে!
বুড়ির মুখে, হাসির ঢেউ, ঘুরে ফিরে আসে!
হেসে হেসে, ঠাকুর-মা, ধ'রে বাবুর কাণ,
ধীরে ধীরে, দিলেন তাতে, মিষ্টি-মধুর টান্।
পুরস্কারে, নগেন বাবু, তুষ্ট হ'য়ে মনে,
এক দৌড়ে, খেলতে যান, খেলার সাথি সনে।

চক্ষু।

(১৫৮ পৃষ্ঠার পর।)

আলোক এবং চক্ষুর সাহায্যে আমরা সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই। আলোক ব্যতীত চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না এবং চক্ষু ব্যতীত কেবল আলোক দ্বারাও দেখিতে

পাওয়া যায় না। বস্তু সকলের ধর্ম্মই এই যে, তাহাদের উপর কোন প্রকার আলোক পতিত হইলে তাহার কিয়দংশ সরল ভাবে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যেক বিন্দু হইতে যে কিরণরাশি বিক্ষিপ্ত হয়, তাহার সমস্ত যদি আমাদিগের অক্ষিজালে পতিত হইত, তাহা হইলে আমরা কোন বস্তু স্পষ্টরূপে দেখিতে পারিতাম না। কেবল আলোক, এবং অন্ধকারের প্রভেদ বুঝিতে পারিতাম। আমাদের প্রত্যেক বস্তু স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবার প্রধান আবশ্যক এই যে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তু হইতে বিক্ষিপ্ত কিরণরাশি অক্ষিজালের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে পতিত হয়। অক্ষিতারকা, অক্ষিযবনিকা, এবং অক্ষিমুকুর এ বিষয়ের সহায়তা করে। কোন বস্তু হইতে বিক্ষিপ্ত কোন একটী নির্দ্দিষ্ট আলোক-রশ্মি প্রথমতঃ বাতাস অপেক্ষা ঘন অক্ষিযবনিকার উপর পতিত হওয়ায়, ইহার গতি বাঁকিয়া যায়। তাহার পর অক্ষিকনীনিকার ভিতর দিয়া এই রশ্মিটী অক্ষিমুকুরের উপর পতিত হয়। এবং অক্ষিমুকুর হইতে অধিকতর বক্র হইয়া অক্ষিজালে পতিত হয়। এই প্রকার, কোন বস্তুর একটী বিন্দু হইতে যতগুলি আলোক রশ্মি অক্ষিযবনিকার উপর পতিত হইয়া অক্ষিকনীনিকার মধ্য দিয়া অক্ষিমুকুরের উপর পতিত হয়, সে সমস্ত রশ্মিগুলি

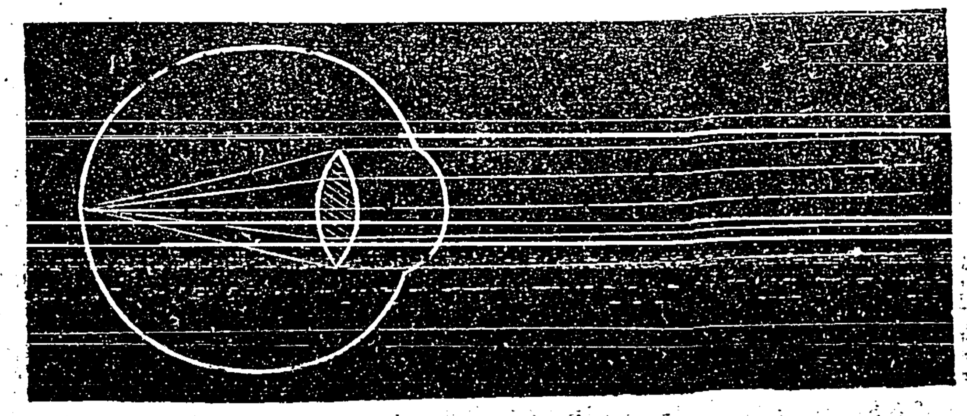

১ম চিত্র।

অক্ষিজালের উপর একটী বিন্দুতে মিলিত (অক্ষমধ্যস্থ বিন্দু) হয়। (প্রথম চিত্র দেখ)। বস্তুর অন্যান্য বিন্দু হইতে বিক্ষিপ্ত রশ্মিগুলিও এই প্রকারে অক্ষিজালের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। এবং অক্ষিজালের উপরিভাগে বস্তুর একটী অনুরূপ প্রতিবিম্ব পতিত হয়। এই প্রতিবিম্ব পতিত হওয়ায় অক্ষিজাল উত্তেজিত হয় এবং অক্ষিস্নায়ু দ্বারা সেই উত্তেজনা মস্তিষ্কে নীত হয় এবং আমরা মস্তিষ্কের সাহায্যে বস্তুটি দেখিতে পাই। বোধ হয় কথাটা তত সহজ হইল না। আর একটু সহজ করিয়া বলি। আমাদের শরীরের কোন স্থানে কোন প্রকার আঘাত পাইলে, সেই আঘাত দ্বারা সে স্থানের স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হয়, এবং মস্তিষ্কের সহিত স্নায়ুগুলি সংলগ্ন থাকায় সেই উত্তেজনা মস্তিষ্কে নীত হয় এবং মস্তিষ্কের সাহায্যে আঘাত জনিত কষ্ট আমরা অনুভব করিতে পারি। সেইরূপ আলোক দ্বারা অক্ষিজাল উত্তেজিত হয়, অক্ষিস্নায়ু দ্বারা সেই উত্তেজনা মস্তিষ্কে নীত হয় এবং মস্তিষ্কের সাহায্যে আমরা জিনিসটী দেখিতে পাই। মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে আমরা কোন বস্তুই দেখিতে পাই না।

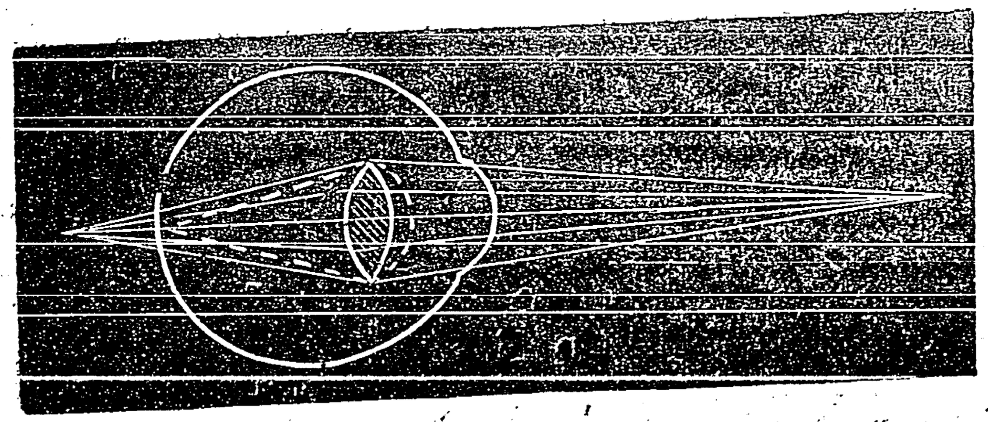

২য় চিত্র।

এখন অধিক দূরস্থিত এবং নিকটবর্ত্তী এই উভয় প্রকার দ্রব্য হইতে নিক্ষিপ্ত কিরণগুলি কি প্রকারে অক্ষিজালের উপর মিলিত হয়, তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব। যদি নিকটবর্ত্তী বস্তু হইতে নিক্ষিপ্ত কিরণগুলি কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে তাহারা অক্ষিজালের উপর মিলিত না হইয়া অক্ষিজাল হইতে দূরবর্ত্তী

কোন স্থানে মিলিত হইত। (দ্বিতীয় চিত্র দেখ।)।
কিন্তু সিলিয়ারি পেশীগুলি অক্ষিমুকুর চাপিয়া ধরায় অক্ষিমুকুর চ্যাপ্টা হইয়া পড়ে এবং আলোক রশ্মিগুলি এই চ্যাপ্টা অক্ষিমুকুরের মধ্য দিয়া যাওয়ায় অক্ষিজালের উপর মিলিত হয়। ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে না যে, বস্তু যতই নিকটে থাকুক্ না কেন আমরা তাহাকে দেখিতে পাই; কারণ সমস্ত জিনিসেরই সীমা আছে। সিলিয়ারি পেশী অক্ষিমুকুরকে ইচ্ছামত চ্যাপ্টা করিতে পারে বলিয়া যত ইচ্ছা তত চ্যাপ্টা করিতে পারে না। চ্যাপ্টা করিতে করিতে এমন এক সময় উপস্থিত হয় যখন আর চ্যাপ্টা করিতে পারা যায় না এবং সেই সময় আর কোন বস্তু দেখিতে পারা যায় না। তোমরা সকলেই এ বিষয়টি সহজে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। কোন একখানা পুস্তক ক্রমে ক্রমে চোখের নিকট আনিলে দেখিতে পাইবে যে, এমন এক সময় উপস্থিত হইবে, যখন আর অক্ষরগুলি চিনিতে পারিবে না এবং বইখানাও পড়িতে পারিবে না। যাহারা রাত দিন লেখা পড়া করে বা অন্য কোন প্রকারে কেবল নিকটের বস্তুই দেখে, দূরের বস্তু বড় বেশী দেখে না, তাহাদের অক্ষিমুকুর অনবরতঃ চ্যাপ্টা হইতে হইতে অবশেষে চ্যাপ্টা হইয়াই

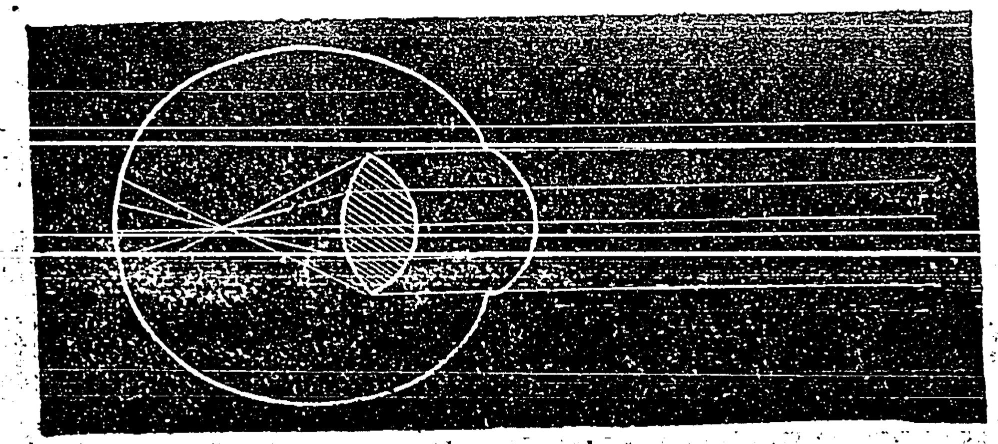

৩য় চিত্র।

থাকে এবং আর লম্বা হইতে পারে না; এই কারণে তাহারা তখন আর দূরের বস্তু স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পারে না। কারণ অক্ষিমুকুর চ্যাপ্টা হইয়া যাওয়ায় দূরের বস্তু হইতে বিক্ষিপ্ত কিরণগুলি অক্ষিজালের উপর মিলিত না হইয়া, অক্ষিজালের সম্মুখে মিলিত হয় এবং অক্ষিজালের উপর প্রতিবিম্ব পতিত না হওয়ায় বস্তুটি দেখিতে পাওয়া যায় না। (তৃতীয় চিত্র দেখ)। কিন্তু যদি চস্মা চোখে দেওয়া যায় তাহা হইলে দূরের বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ চস্মার (Concave) কাচে আলোক-রশ্মিগুলিকে অপেক্ষাকৃত সরল করিয়া দেয় এবং তাহারা অক্ষিজালে যাইয়া মিলিত হয়। যাহার অক্ষিমুকুর যতটা চ্যাপ্টা ঠিক সেইটুকু সংশোধন করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাচের আবশ্যক। এইজন্য এক জনের চস্মায় আর এক জন দেখিতে পায় না।

আবার কাহারও অক্ষিমুকুর চ্যাপ্টা না হইয়া অধিকতর লম্বা হইয়া পড়ে। ইহারা দূরের বস্তু

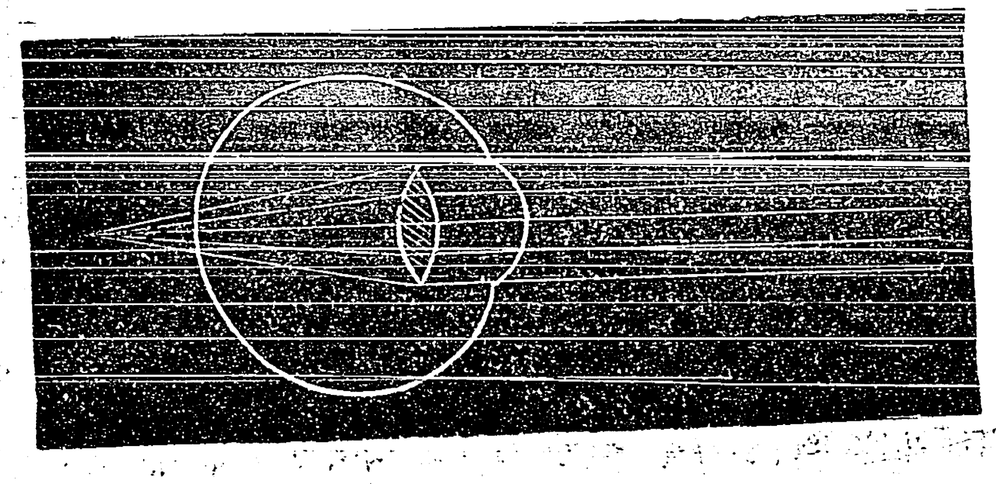

৪র্থ চিত্র।

দেখিতে পারে বটে; কিন্তু নিকটের বস্তু দেখিতে পারে না। কারণ নিকটের বস্তু হইতে যে আলোক-রশ্মিগুলি ইহাদের অক্ষিমুকুরে পতিত হয়, তাহা আবশ্যকীয় বক্রভাব প্রাপ্ত না হওয়ায় অক্ষিজালের দূরে মিলিত হয়। (চতুর্থ চিত্র দেখ)। ইহারাও চস্মার সাহায্যে নিকটের বস্তু দেখিতে পায়। চস্মার (Convex) কাচে আলোক-রশ্মিগুলিকে অধিকতর বক্র করিয়া দেয়, এবং তাহারা অক্ষিজালে মিলিত হয়। পূর্ব্বোক্ত কারণে

এরূপ অবস্থায়ও একজনের চস্মায় আর একজন স্পষ্ট দেখিতে পায় না; কারণ যাহার অক্ষিমুকুর যতটুকু লম্বা হইয়াছে ঠিক সেইটুকু সংশোধন করিতে ভিন্ন ভিন্ন কাচের আবশ্যক।

আমরা দুই চক্ষু দ্বারা এক বস্তু দেখি কেন? পণ্ডিতেরা এখনও এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে আমরা এক বস্তু দেখিবার জন্য একই সময় দুই চক্ষু একত্রে প্রয়োগ করি না। কিন্তু একথা ঠিক নহে। আবার কেহ কেহ বলেন যে দুই চক্ষুর দ্বারা যদি দুই অক্ষিজালের সমান অংশে (অর্থাৎ এক অক্ষিজাল আর এক অক্ষিজালের উপরে রাখিলে যে অংশ যে অংশের উপরে পড়িবে, ঠিক সেই সেই অংশে) প্রতিবিম্ব পড়িলেই আমরা একটি বস্তু দেখি, নতুবা নহে। একথা ঠিক, সকলেই ইহা সহজে পরীক্ষা করিতে পারে। যদি কোন গাছ কিম্বা অন্য কোন একটী জিনিসের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, আমরা এক চক্ষু অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া ধরি, তাহা হইলে একটি গাছের পরিবর্ত্তে দুইটী গাছ দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে এক চক্ষুর অক্ষিজালের যে অংশে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, অন্য চক্ষু অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া ধরায় তাহার অক্ষিজালের ঠিক সমান অংশে প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে না। কিন্তু অক্ষিজালের ঠিক সমান অংশে প্রতিবিম্ব পতিত হইলেই যে আমরা কেন এক বস্তু দেখিতে পাইব তাহার সন্তোষজনক উত্তর এখনও কেহ দিতে পারেন নাই। তোমার দুই পায়ের ঠিক একই স্থানে যদি একই সময়ে কোন প্রকার আঘাত করা যায়, তাহা হইলে একই সময়ে দুই পায়েই যন্ত্রণা বোধ করিবে। সেইরূপ দুই চক্ষু দ্বারা দুই অক্ষিজালের ঠিক সমান স্থানে দুইটী প্রতিবিম্ব পতিত হইলে দুইটী বস্তু না দেখিয়া একটী বস্তু দেখিবার কোন সন্তোষজনক কারণ পাওয়া যায় না। নানা পণ্ডিতে নানারকম কারণ দেখাইয়াছেন, কিন্তু সেগুলি নানারকম কুতর্কে পূর্ণ, সেইজন্য তাহা আর তোমাদিগকে বলিব না। আর একটী বিষয়ের পণ্ডিতেরা ঠিক মীমাংসা করিতে পারেন নাই। আমাদের অক্ষিজালে যে সমস্ত প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহা উল্টা অর্থাৎ বস্তুর নিম্নভাগ উপরের দিকে প্রতিবিম্বিত হয় এবং উপরিভাগ নীচের দিকে প্রতিবিম্বিত হয়। অথচ আমরা সমস্ত বস্তুই সোজা দেখিতে পাই। পণ্ডিতেরা কুট তর্ক দ্বারা ইহারও একটা মীমাংসা করিয়াছেন; কিন্তু সে মীমাংসা সন্তোষজনক নহে; এই জন্য তাহা তোমাদিগকে বলিলাম না।

তোমরা সকলেই দেখিয়া থাকিবে যে, অন্ধকার হইতে হঠাৎ আলোক মধ্যে পতিত হইলে এবং আলোক হইতে হঠাৎ অন্ধকারে পড়িতে হইলে মুহূর্ত্তের জন্য পদার্থ সকল উত্তমরূপে দৃষ্টি-গোচর হয় না। ইহার কারণ কি? অন্ধকারেও পদার্থ সকল দেখিবার জন্য আমরা চেষ্টা করি এবং অধিক আলোক চক্ষে পতিত হইবার জন্য কনীনিকা প্রশস্ত করি। কনীনিকার এইরূপ প্রশস্ত অবস্থা থাকিতে থাকিতে হঠাৎ অধিক আলোক চক্ষে পড়িলে, অধিক আলোক চক্ষু মধ্যে পতিত হয় এবং কোন বস্তু স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিক আলোক চক্ষু মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে এইজন্য বারম্বার চক্ষু মুদ্রিত করিতে হয়। আবার যখন অধিক আলোকে থাকি, তখন অধিক আলোক চক্ষু মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে এইজন্য কনীনিকা কুঞ্চিত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় হঠাৎ অন্ধকারে পড়িলে কুঞ্চিত কনীনিকার উত্তর

দিয়া অধিক আলোক চক্ষু মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না এবং পদার্থগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কিছুক্ষণ অন্ধকারে থাকিতে থাকিতে কনীনিকা প্রশস্ত হয় এবং তখন অধিক আলোক চক্ষু মধ্যে প্রবেশ করিতে পারায় পদার্থগুলি দৃষ্টি-গোচর হয়। চক্ষু সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য আরও অনেক বিষয় আছে; কিন্তু তাহা তোমরা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না আশঙ্কায় এখানে বলিলাম না। তোমরা বড় হইলে সে সব বিষয় জানিতে পারিবে।

পত্রপ্রেরকদের প্রতি

শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষ, তেঘরিয়া—স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন। লেখা মন্দ হয় নাই। তবে স্ত্রীলোকের বিদ্যা-শিক্ষার আবশ্যকতা এখন সকলেই বুঝিয়াছে, এখন আর তাহা লোককে বুঝাইবার বিশেষ একটা দর-কার আছে এমন বোধ হয় না। বিশেষ সখার পাঠক পাঠিকাদের ইহাতে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার, বগুড়া—শত্রুর প্রতি সদ্ব্যবহারের উদাহরণ আমাদের দেশের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিবেন। বিলাতি দৃষ্টান্ত অনেক সময় আমাদের দেশের ছেলেদের পক্ষে খাটে না। আপনার লেখা বেশ হইয়াছে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ নন্দী, কলিকাতা—আগামী বারে চেষ্টা করিব।

শ্রীসত্যরঞ্জন বসু, জামালপুর—পদ্য দুটী ঠিক সখার উপযুক্ত হয় নাই। অন্য কোন পত্রিকায় দিলে প্রকাশিত হইতে পারে। সখার উপযুক্ত করিয়া লিখিলে আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিব।

পু, চ, রায়—আপনার হেঁয়ালি পাইয়াছি। সখায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইলাম।

শ্রীনিশিথনাথ রায়—ইংরাজি পুস্তকে অনেক সময় অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প থাকে; তাহা অনু-বাদ করিয়া দিলে মন্দ হয় না। কিন্তু যে সকল সকলেই জানে এবং যাহা অতি সাধারণ, তাহা প্রকাশ করায় বিশেষ কোন ফল নাই।

শ্রীম, ল, ব—আপনার লেখা বেশ হইয়াছে। কিন্তু সখার পাঠক পাঠিকাদের পক্ষে বোধ হয় কিছু কঠিন হইবে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়, মাণিকগঞ্জ—আপনার পদ্যটী পাইয়াছি। কিন্তু সখার উপযুক্ত হয় নাই বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

সখা
সপ্তম ভাগ। ১২শ সংখ্যা।
ডিসেম্বর, ১৮৮৯।

বিবিধ।

তাঁতিয়া ভীলের জন্য সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়াছে। গত ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে তাহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। তাঁতিয়া যদিও একজন ডাকাইত ছিল, তথাপি তাহার ফাঁসিতে অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন।

তাঁতিয়ার ফাঁসির সময়ে প্রচলিত রীতি অনু-সারে মরণকালে তাহার কি অভিলাষ তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে তাঁতিয়া গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল "আমি সামান্য ভীল মাত্র এবং অসভ্য বটে, কিন্তু বাল্যাবধি যুদ্ধ করাই আমার ব্যবসায়; কোন সৈনিক পুরুষের হাতে আমায় মরিতে দিউন।" যে সকল সৈনিক পুরুষেরা প্রহরীরূপে তাহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান ছিল তাহাদের একজনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "আমার যদি মরিতেই হইবে তবে ঐ সৈনিকের বন্দুকের গুলিতে আমায় মরিতে দিউন।" এই কথায় দর্শকমাত্রেরই হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। কর্ণেল হ্যালেট অগ্রসর হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলি-লেন তাহার এ প্রার্থনা কখনই গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। তাঁতিয়া তখন বীর ভাবে বলিল, "তবে আমার অন্য কোন অনুরোধ নাই।"

* *
*

আগামী ৩রা জানুয়ারি তারিখে রাজপৌত্র প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টর কলিকাতা আসিবেন। এখানে তাঁহাকে কিপ্রকার অভ্যর্থনা করা হইবে তাহা লইয়া দুইটী দল হইয়াছে। এক দল বলিতেছেন নাচ তামাসায় অনর্থক টাকা খরচ না করিয়া স্থায়ী চিহ্নস্বরূপ কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করা হউক। আর একদল বলিতেছেন নাচ, তামসা না করিলে রাজ-পৌত্রের উপযুক্ত সম্মান করা হইবে না। এখন ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বোধ হইতেছে দুইই হইবে। অধিকাংশ রাজা, মহারাজা এবং সাহেবেরা নাচ তামাসা এবং খানার জন্য টাকা তুলিতেছেন, অপর মধ্যস্থিত লোকেরা এবং দুই একজন রাজা মহারাজাও কুষ্ঠাশ্রমের জন্য টাকা তুলিতেছেন।

* *
*

তোমরা অনেকেই ঠানদিদির নিকট সোণার কাঠি, রুপার কাঠির কথা শুনিয়া থাকিবে। কিন্তু যথার্থ সোণার কাঠি রুপার কাঠি বোধ হয় কেহই

দেখ নাই। সম্প্রতি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে একটি রোগী আসিয়াছিল, তাহার মাথার পিছনের দিক হাত দিয়া টিপিলে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িত এবং কোমরের কাছে নিল-দাঁড়ার উপর চাপিলে জ্ঞান প্রাপ্ত হইত। কি কারণে যে এইরূপ হইত, কলিকাতার বড় বড় ডাক্তারেরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিয়াছিলেন না। লোকটি এক জন ঘোড়সোয়ার, সে একবার এক ঘোড়-দৌড়ে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছিল এবং ঘোড়ায় তাহার মাথায় লাথি মারিয়াছিল, সেই অবধি তাহার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার 'রে' মনে করিয়াছিলেন তাহার মস্তিষ্কের উপর কোন প্রকার ফোঁড়া হইয়াছে, সেই জন্য তাহার মাথার যে জায়গায় হাত দিলে সে অজ্ঞান হইত সেই জায়গার খানিকটা হাড় কাটিয়া মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। কিন্তু কোন রকম ফোঁড়া দেখিতে পান নাই। ফোঁড়া না পাইলেও লোকটার রোগ কিন্তু এই হাড় কাটাতেই ভাল হইয়া গিয়াছে। সে ভাল হইয়া হাঁসপাতাল হইতে চলিয়া গিয়াছে।

* *
*

পৃথিবীতে যে কত রকম আশ্চর্য্য জিনিস আছে তাহা বলা যায় না। গত এপ্রিল মাসে আমরা একজন মানুষের ছবি দিয়াছিলাম, তাহার দাড়ি এত লম্বা যে দাঁড়াইলে দাড়ি ঝুলিয়া মাটিতে পড়ে; তাহা বোধ হয় তোমাদের মনে আছে। এই যে ছবি দেখিতেছ, উহা একটি স্ত্রীলোকের প্রতি-মূর্ত্তি; আমেরিকার অন্তঃর্গত ভার্জিনিয়া প্রদেশে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহার নাম মিস্ য়্যানিজোন্স। যখন ইহাঁর জন্ম হয়, তখন ইহাঁর মাথায় ১ হাত লম্বা চুল এবং মুখে অল্প অল্প কাল লোম ছিল। মিস্ জোন্সের পিতা মাতা তাহার মুখের দাড়িগুলি যাহাতে আর বড় না হয় এবং পড়িয়া যায় সেজন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এখন মিস্ জোনসের বয়স ২৪ বৎসর। তাহার

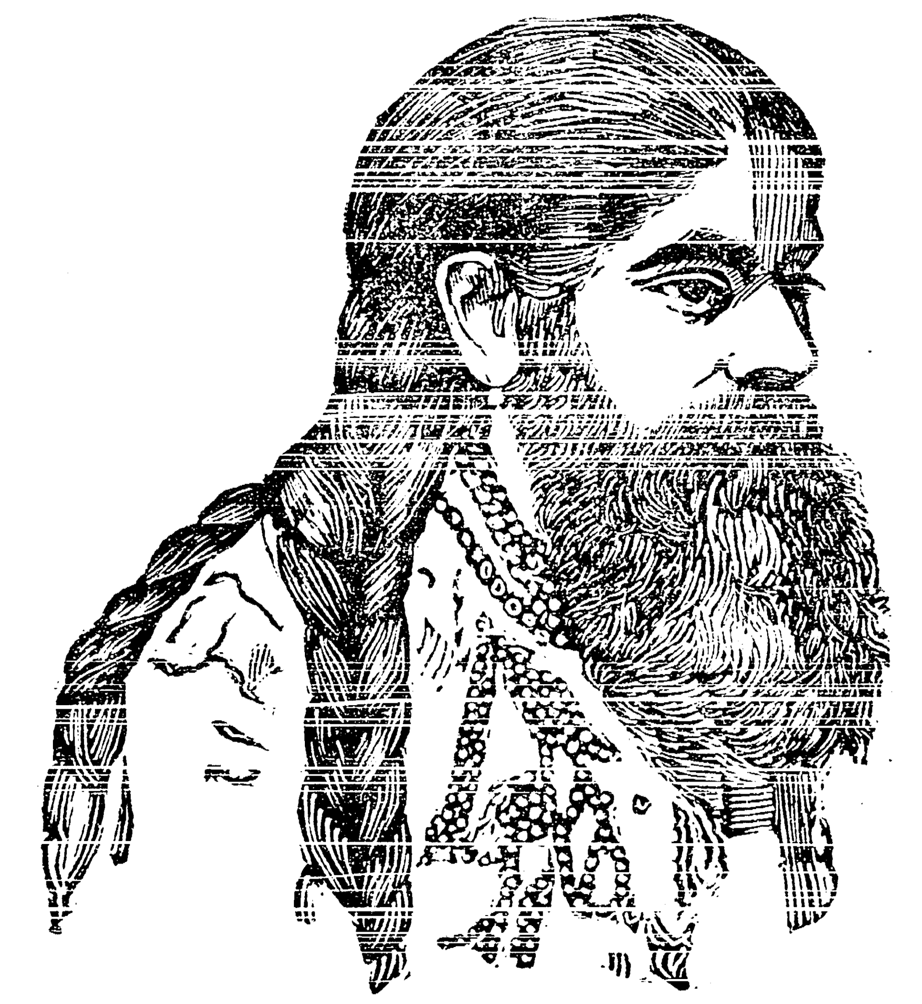

চুলগুলি এখন দাঁড়াইলে মাটিতে পড়ে এবং দাড়িও বেশ লম্বা হইয়াছে। দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছ।

* *
*

আর এক জনের ছবি দেওয়া গেল। জন্মাবধি ইহাঁর দুই হাতই নাই; কিন্তু তথাপি ইহাঁর কোন অসুবিধা হয় নাই। পায়ের দ্বারাই নিজের আবশ্য-কীয় সমস্ত কার্য্য করিতে পারেন। ছবিতে দেখি-তেছ পায়ের সাহায্যে চা তৈয়ার করিতেছেন। পায়ের দ্বারা বেশ লিখিতেও পারেন। ছবির নীচের যে নাম সহি দেখিতেছ তাহা ইহাঁর নিজের পায়ের লেখার নমুনা। ইহাঁর নাম চার্লস্ ট্রিপ। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে আমেরিকা দেশে ইহাঁর জন্ম হয়।

ট্রিপ নিজের যে জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন যে "আমার হাত নাই কেন অনেকে এই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমিও যদি পারিতাম তাহা হইলে আহ্লাদের সহিত তাঁহাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতাম। কিন্তু এ কথার উত্তর দিবার আমার সাধ্য নাই। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, জন্মাবধিই আমার হাত নাই এবং না থাকাতে আমি দুঃখিতও নই। কারণ আমার কখনও হাত ছিল না এবং তাহার অভাবও আমি বুঝিতে পারি নাই। হাত না

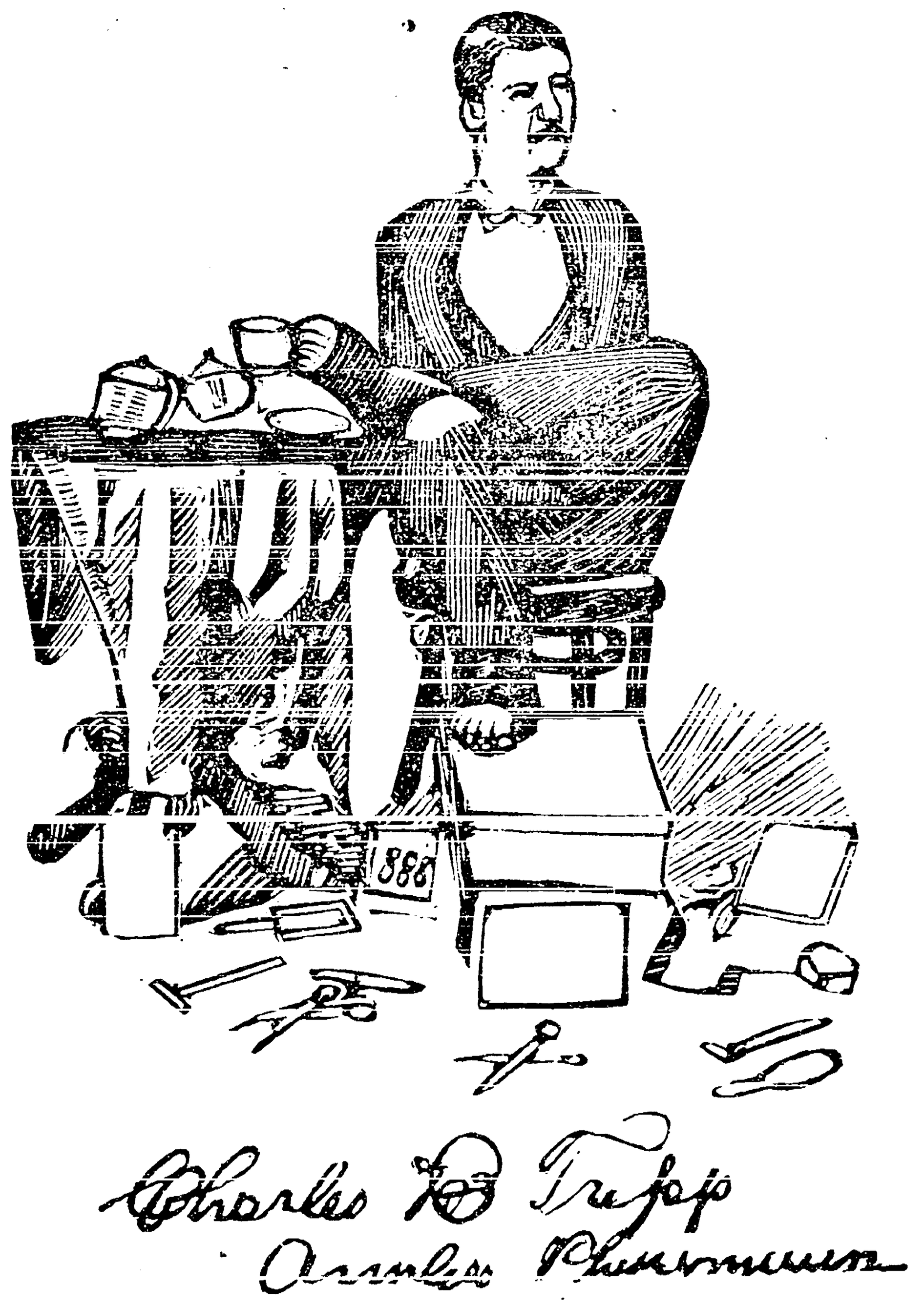

থাকাতে আমার কোন অসুবিধাও হয় না। কারণ আমি পায়ের দ্বারাই আমার আবশ্যকীয় সমস্ত কার্য্য করিতে পারি।"

* *
*

এইরূপ ফরাসি দেশের বিখ্যাত চিত্রকর "ডুকর্ণের" দুই হাতের চিহ্ন মাত্রও ছিল না। তিনিও জন্মাবধি ঐরূপ ছিলেন। দক্ষিণ পদ দ্বারা সমস্ত কার্য্য করিতেন। বাল্যাবধি চিত্র কার্য্যে তাঁহার বড় আশক্তি ছিল। দক্ষিণ পদের অঙ্গুলি দ্বারা তুলি ধরিয়া ভূমিতে কাগজ রাখিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চিত্র করিতেন। ক্রমে বিখ্যাত চিত্রকর হইয়া উঠিলেন। অন্য বড় বড় চিত্রকরেরা হাতে তুলি ধরিয়া যে চিত্র অঙ্কিত করিতেন তিনি পায়ে তুলি ধরিয়া তাঁহাদের অনেকের অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিতেন। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার চিত্র নৈপুণ্য দেখিয়া ফরাসি গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অনেক টাকা বৃত্তি দিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার এক প্রস্তর মূর্ত্তি প্রকাশ্য পথের সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছে। লোকে সাংসারিক অসু-বিধা ভোগ করিয়াও দৃঢ় ইচ্ছা ও অধ্যবসায়ের গুণে বড় লোক হইতে সক্ষম হয়। ইহাঁদের ন্যায় লোকের জীবনে দেখা যায় যে, শারীরিক অসুবিধা সত্ত্বেও মানুষ ইচ্ছা ও অধ্যবসায়ের গুণে কি না হইতে পারে।

* *
*

সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে এক দল লোক ক্রিকেট খেলিবার জন্য এদেশে আসিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে একজন লর্ড এবং একজন ইংলণ্ডের পার্লিয়া-মেণ্ট মহাসভার সভ্য আছেন। কলিকাতার বড় বড় সাহেব এবং দেশীয় লোক অনেকে মিলিয়া একটা ক্লব করিয়াছেন, তাহাকে কলি-কাতা ক্রিকেট ক্লব বলে। এই ক্লবের ১১ জন লোকের সঙ্গে বিলাতি দল খেলা আরম্ভ করিয়া-ছেন। খেলা এখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু যেরূপ গতিক দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় বিলাতি দলই জিতিবেন। কলিকাতার

দলের মধ্যে দেশীয় লোক কেহই নাই। এটা বড়ই দুঃখের বিষয়। আমাদের দেশের লোক শারীরিক পরিশ্রম করিতে বড়ই কাতর, ইহাতে যে দেশের কত অনিষ্ট হইতেছে তাহা বলা যায় না। ইংরাজ জাতি শারীরিক পরিশ্রম এবং শারীরিক উন্নতি মানসিক উন্নতি অপেক্ষা কোন অংশে হেয় মনে করেন না বরং কোন কোন সময় শারীরিক উন্নতিকে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিতে প্রস্তুত।

এই যে এত টাকা খরচ করিয়া ইহাঁরা কেবল খেলিবার জন্য এদেশে আসিয়াছেন, ইহাতেই তোমরা বুঝিতে পার ক্রিকেট খেলা ইহাঁরা কিরূপ আদর করেন। আমাদের দেশের অনেকে বিদ্যা শিক্ষার্থে ইংলণ্ডে যাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু এরূপ খেলিবার জন্য কি কেহ কখনও বিলাতে গিয়াছেন? বোম্বাইয়ের একদল পার্শি একবার গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালী কখনও যান নাই।

* *
*

সখার পাঠক পাঠিকারা "জাতীয় মহাসমিতির" কথা জান। গত বৎসর এলাহাবাদ সহরে মহাসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। এবার বোম্বাই সহরে হইবে। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ ও উপবিভাগ হইতে প্রায় দুই সহস্র প্রতিনিধি উপস্থিত হইবেন এরূপ অনুমান করা হইয়াছে। এবার নাকি মহিলারাও এই সভায় প্রতিনিধি প্রেরিত হইবেন। সকল কাজেই প্রায় দুই দল হইয়া থাকে। ইহাতেও তাহাই হইয়াছে। এক দল লোক আছে যাহারা কেবল ভারতবাসীদিগের নিন্দা ও কুৎসা করিতেই কৃতসংকল্প। তাহারা এই সভার বিরোধী। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেরও কোন কোন লোক যোগ দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা বৃথা। ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের বিজ্ঞ ও দেশহিতৈষী ব্যক্তিরা সকলেই একবাক্যে ইহার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। এবার ইংলণ্ড হইতে "ওয়েডারবার্ণ" নামে একজন বড় সাহেব এই মহাসমিতির সভাপতি হইতে আসিয়াছেন। ইনি বিলাতে খুব ক্ষমতাশালী ও সম্মানিত। সেখানে গ্লাড্‌ষ্টোন প্রভৃতি প্রধান প্রধান মহাত্মারাও এই মহাসমিতির সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। পার্লিয়ামেণ্ট সভার একজন প্রধান সভ্য ব্রাডল সাহেব এই মহাসমিতি দেখিবার জন্য বোম্বাই আসিয়াছেন। ইহাঁর জীবন-চরিত সম্বন্ধে দুই চার কথা বলিব। ইহাঁদের মত মহাত্মারা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

ওয়াংগা।

সেণ্ট লরেন্স নদীর তীরে অটোয়া নগরের নিকটে আদিম আমেরিকদিগের অনেকগুলি গ্রাম ছিল। এই সকল গ্রাম প্রায় নিবিড়

বনে বেষ্টিত। এক সময়ে এই সকল গ্রামের অধিবাসীরা ইয়োরোপীয়দিগের সহিত বীবর চর্ম্মের ব্যবসায় করিয়া বেশ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ইয়ুরোপখণ্ডে বীবর চর্ম্মের টুপীর পরিবর্ত্তে অন্য প্রকার টুপী প্রচলিত হওয়ার এই ব্যবসায়ের ভারি অবনতি হইল। এবং অধিকাংশ অধিবাসী নিঃসম্বল হওয়ায় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া দেশের অন্যান্য অংশে কাজ কর্ম্মের চেষ্টায় প্রস্থান করিল।

এইরূপ এক পরিত্যক্ত পল্লীতে ওয়ারাগা নামক একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বাস করিত। তাহার স্বামী, দুই পুত্র ও পুত্রবধূ ইতিপূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। সে তাহার একমাত্র পৌত্র ওয়াংগার সহিত জনশূন্য কুটীরে বাস করিতে লাগিল।

ওয়াংগার বয়স ৪ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তাহার চেহারা ভারি সুন্দর এবং চুলগুলি কোঁকড়া ও কোমল। পিতামহী ওয়াংগাকে বড়ই ভালবাসিত।

বৃদ্ধা ওয়ারাগার শরীর এক্ষণে জরাজীর্ণ হইয়াছে। কয়েকদিন হইল তাহার অসুখ আরও বাড়িয়াছে। একদিন রাত্রি প্রভাত হইল, কিন্তু ওয়ারাগা ওয়াংগাকে খাওয়াইতে তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিল না। বালক ওয়াংগা পিতামহীকে জাগরিত করিতে অনেক চেষ্টা করিল,—কয়েকবার তাহার গাল থাবড়াইল—চক্ষের রোম ধরিয়া টানিল কিন্তু ওয়ারাগা চক্ষু মেলিল না। তখন ওয়াংগা মেজেতে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল, পিতামহীর অসুখ বশতঃ ২।৩ দিন তাহার ভালরূপ খাওয়া হয় নাই।

এখন সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ওয়াংগা ভাবিল, খাড়ীর ধারে বনে নানা প্রকার ফল পাকিয়া আছে, কিছু খাইয়া আসি। ওয়াংগা ধীরে ধীরে কবাট খুলিয়া বনে প্রবেশ করিল, এবং যথেচ্ছা ফল খাইয়া জঠর জ্বালা নিবৃত্তি করিল। ওয়াংগা দেখিল বনের চারিদিকে গাছে গাছে নানাবর্ণের সুন্দর ফুল ফুটিয়াছে; কয়েকটী বহুরূপী হাত পা ছড়াইয়া রৌদ্রে বিশ্রাম করিতেছে; এবং সুন্দর সুন্দর পাখী ও প্রজাপতি সকল আনন্দে নৃত্য করিতেছে। বালক ওয়াংগা দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইয়া আরও বনের দিকে অগ্রসর হইল।

আকাশের কোণে মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল, দেখিতে দেখিতে হঠাৎ সকল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। গাছের পাতায় চট্‌পট্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। চারিদিক আঁধার হইয়া গেল। ওয়াংগা বাটীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য পিতামহীকে ডাকিতে লাগিল; অবশেষে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু বৃষ্টি আরও মুষল ধারায় পড়িতে লাগিল। বনের গাছ সকল প্রবল বাতাসে মড় মড় করিয়া উঠিল। বড় ভয় হইল। বালক ওয়াংগা বন হইতে বাহির হইতে যথাশক্তি দৌড়িতে লাগিল। চারিদিকে গাছ সকল আরও ঘন হইয়া আসিতে লাগিল; কাঁটা গাছে তাহার কোমল পা দুখানি ক্ষত বিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া গেল। তাহার পা হাঁটুসমান কর্দ্দমে গাড়িয়া পড়িতে লাগিল। বালকের ক্ষুদ্র দেহ ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তাহার আর চলিবার শক্তি রহিল না।

হায় ওয়াংগা! আজ এই বিশাল পৃথিবীতে তাহার আপনার বলিতে কেহই নাই। এই অন্ধকার বনের মধ্যে সে একাকী পড়িয়া রহিয়াছে। চারিদিকে হিংস্র জন্তু শিকার অন্বেষণে ছুটাছুটি করিতেছে। কেহই ওয়াংগার তত্ত্ব লইতে আসিল না। কিন্তু ওয়াংগার কোন বিপদও ঘটিল না। যিনি বিপন্নের বন্ধু ও অনাথের রক্ষক তিনি ঊর্দ্ধ হইতে ওয়াংগার এই কম্পিত কলেবর ও রক্তাক্ত পা

দেখিতেছিলেন, এই অন্ধকার বনের মধ্যে তাহার পা দুখানিকে তাহার নূতন ও নিরাপদ বাসস্থানের দিকে চালাইয়া আনিতেছিলেন ।

যখন ওয়াংগা আর কাঁদিতে পারিল না, দৌড়াইতে অশক্ত হইল, তখন ঘন বৃক্ষবল্লীর মধ্যে শুষ্ক ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। অনাহারে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, এবং শীতে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হঠাৎ দূরে কিসের শব্দ শুনা গেল ; ঘন পত্রাবলী হইতে একটী কৃষ্ণ বর্ণের মস্তক বহির্গত হইল ; এবং দুইটী উজ্জ্বল চক্ষু এক দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল ।

বালক চেঁচাইয়া উঠিল—“বা কুকুর রে ! পাছে পাছে কুকুর এসেছে !” পশুটী ধীরে ধীরে তাহার নিকটে আসিল ; এবং নাসিকা অবনত করিয়া মৃত্তিকা আঘ্রাণ করিতে লাগিল।

ওয়াংগা তাহার কর্কশ শরীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—“কুকুর ! বা কি মস্ত নাক ! কি মজার কাণ! তুই আমাকে নিতে এসেছিস্ ? আমার বাড়ী নিয়ে যাবি ? চল্, বাড়ী গেলে ঠাকুরমা তোকে কত খাবার দেবেন !”

হঠাৎ পশুটী তাহার পার্শ্ব হইতে বনের মধ্যে ছুটিয়া গেল। কি একটু শব্দ শুনা গেল। ওয়াংগার কুকুর একটী শশক মুখে করিয়া আবার ফিরিয়া আসিল।

ওয়াংগা বলিতে লাগিল—“এত বড় কুকুর আমি কখনও দেখি নাই ! তোমার লেজটী কেমন সুন্দর ! কুকুর, তোমার কত বড় পা ! চল, অমাকে ঠাকুরমার কাছে নিয়ে চল।” এই বলিয়া ওয়াংগা সেই কুকুরের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

পশুটী তাহার শিকার মুখে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল। ওয়াংগা বলিল—“কুকুর, চল তোমার সঙ্গে যাই। এই অন্ধকার বনে একা পড়িয়া থাকিতে আমার বড় ভয় হয়।”

এই বলিয়া ওয়াংগা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। পাঠক পাঠিকারা হয়তো বুঝিতে পারিয়াছেন ওয়াংগা যাহাকে কুকুর মনে করিয়াছিল তাহা কুকুর নহে, একটী ভয়ানক বাঘ।

“কুকুর ভাই, একটু আস্তে যাও। অত তাড়াতাড়ি কি আমি চলিতে পারি ? পা বড় ব্যথা করিতেছে।”

বাঘ যাইতে যাইতে এক একবার শিকার মাটিতে নামাইতে লাগিল ; এবং নাসিকা দ্বারা বালকের হাত মুখ আঘ্রাণ করিয়া আদর করিতে লাগিল।

অবশেষে বালক আর হাটিতে না পারিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। তাহার দুই চোক দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বালক কহিল—“ভাই কুকুর, আর কতদূরে তোমার বাড়ী ? আমার ভারি খিদে পাইয়াছে।”

আর একটু যাইয়াই তাহারা এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইল। এই বৃক্ষের প্রায় সমস্ত শিকড়ই ভূমির উপরে। তাহার নীচে একটী সুন্দর গর্ত্ত দেখা গেল।

তখনও বৃষ্টি পড়িতেছিল। বালক যাইয়া গর্ত্তের মুখে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ভিতরে অন্ধকার কিছুই দেখা যায় না ; কিন্তু কিসের গর্জ্জন শুনা যাইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ ৪টী ছা লাফাইয়া বাহিরে আসিল। তাহারা কি সুন্দর ও ক্রীড়াশীল ; ঠিক যেন ছোট ছোট কুকুর।

ওয়াংগা দেখিয়া ভারি সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু তাহার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল। সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। একটি শিকড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন

প্রাতঃকালে যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন ওয়াংগা দেখিল ৪টী ছা খেলা করিতেছে ; বড়টী যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ওয়াংগা একটী ছা কোলে লইল ; এবং দোলাইতে দোলাইতে বুকে রাখিয়া চুমো খাইল। বালক বলিল—“বা কি সুন্দর কুকুর ! আমি তোমাকে ঠাকুরমার কাছে লইয়া যাইব।” পিতামহীর কথা মনে হওয়ায় বালকের চক্ষে জল আসিল। ওয়াংগা কাঁদিতে লাগিল। ছাগুলি একটা অন্যটার উপর লাফাইয়া পড়িতে লাগিল। এবং মাটিতে পড়িয়া জড়াজড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু বালকের ক্রন্দন কিছুতেই থামিল না। “ঠাকুর মা” বলিয়া ওয়াংগা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

এই সময়ে একটী ক্ষুদ্র হরিণ মুখে করিয়া ব্যাঘ্রী ফিরিয়া আসিল। ছাগুলি মুহূর্ত্ত মধ্যেই হরিণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। ব্যাঘ্রী এক খণ্ড নরম কাঁচা মাংস ওয়াংগার সম্মুখে স্থাপন করিল। ওয়াংগার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছিল। সে আহ্লাদে সেই কাঁচা মাংস খাইতে লাগিল। ব্যাঘ্রী নিকটে বসিয়া তাহার শরীর আঘ্রাণ করিতে লাগিল, এবং ছাগুলি আনন্দে তাহাদিগের মার গা চাটিতে লাগিল।

এইরূপে মানুষের সঙ্গ ছাড়া হইয়া, গভীর বনের মধ্যে ব্যাঘ্রের গর্ত্তে মানুষের সন্তান দিন যাপন করিতে লাগিল। সময়ে সময়ে পিতামহীর কথা মনে পড়িত এবং ওয়াংগা কাঁদিয়া উঠিত। কালে পিতামহীর কথা আর তাহার মনে রহিল না। ক্রমে মানুষের ভাষা ও মানুষের ন্যায় সোজা হইয়া বেড়ান তাহার অনভ্যস্ত হইয়া পড়িল। ওয়াংগা এখন চারি পায়ে হাঁটিয়া তীরের মত দৌড়িতে পারে, ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন করে। কাঁচা মাংসে তাহার আর অরুচি নাই। কোন ক্ষুদ্র জীব সম্মুখে পড়িলে ওয়াংগা তাহাকে কামড়াই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিত। হায় ! মানুষের অদৃষ্ট ! ভগবান ! তোমারই কৌশলে বাঘ মানুষের মত স্নেহশীল হয় ও মানুষের সন্তান বন্য বাঘ হইয়া যায়।

ক্রমে তিন বৎসর গত হইল। ইঁয়ুরোপীয়গণ এই সকল গ্রামের মধ্য দিয়া যে রাস্তা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে বন ভেদ করিয়া ক্রমে এই বৃক্ষের সমীপবর্ত্তী হইল। একদিন এক জন ইঞ্জিনিয়ার দেখিলেন কয়েকটী বাঘের ছা দৌড়াইয়া এক বৃক্ষের মূলদেশে গর্ত্তে প্রবেশ করিল। ছাগুলিকে জীবিত অবস্থায় ধরিতে তাঁহার বড় ইচ্ছা হইল। তিনি লোক জন, কুকুর ও বন্দুকাদি লইয়া বৃক্ষের মূলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুতেই ছা সকল গর্ত্তের বাহিরে আসিল না। তিনি তখন বৃক্ষে আগুন ধরাইয়া দিলেন। উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া ছা সকল বহির্গত হইল। এবং তীরের ন্যায় বেগে দৌড়িতে লাগিল। কুকুর সকলও তীরের ন্যায় উড়িয়া চলিল। এবং সাহেবেরা ঘোড়া ছাড়িয়া দিলেন। কিছুদূরে যাইয়া একজন সাহেব চেঁচাইয়া উঠিলেন—“এ যে মানুষের ছেলে ! কুকুর ফিরাও জাল দিয়া ধর।” মুহূর্ত্ত মধ্যেই ওয়াংগা জালে ধৃত হইল।

এক জন সাহেব বলিল “তাইত, বালক যে ! বোধ হয় ৮ বৎসরের বেশী বয়স হয় নাই।”

দ্বিতীয় সাহেব বলিল “বালক হ’ক আর বালিকা হ’ক, আমার গা টা বাঘের মত আঁচড়াইয়া দিয়াছে ! সমস্ত জ্বলিয়া যাইতেছে।”

প্রথমতঃ বোধ হইল তাহার বাক্‌শক্তি বা শ্রবণ শক্তি কিছুই নাই ; একবারে বাঘের স্বভাব পাইয়াছে। সে কিছুতেই দাঁড়াইয়া হাঁটিতে চাহিত

না। বুধবারে পাওয়া যায় বলিয়া সাহেবেরা তাহার নাম ওয়েডনেস্‌ডে (Wednesday) রাখিলেন এবং তাহাকে মিশনারি স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। অনেক দিন পরে তাহার পিতা-মহীর কথা মনে পড়িল এবং তাহার নাম বলিতে পারিল। ক্রমে বন্য বাঘ আবার মানুষ হইয়া উঠিল ও মানুষের স্বভাব পাইল।

আদর্শের কি প্রবল পরাক্রম! আদর্শের গুণে কখন মানুষ পশু হইতেছে, কখন বা পশু মানুষ হইয়া উঠিতেছে।

হাসির দিনে কান্না।

ইস্কুলেতে পারিতোষিক দেওয়া হ'ল সায়।
ভাল ছেলে প্রাইজ্ পেলে হেসে ঘরে যায়॥
তিনখানা বই পেলে বিপিন, আবার বইএর পাতে।
ছবি কত, গল্প কত, আমোদ কত তাতে॥
সারা বছর ক'রেছিল মন দে নিজের কাজ।
বিপিন ভাবে তারি যেন ফল ফলেছে আজ॥
বাড়ী গিয়ে আশ মিটিয়ে দেখাবে সব মায়।
মুখে হাসি মনটি খুসি নেচে ঘরে যায়॥

কাছে বাড়ী নীলকান্ত নাম একটি ছেলে।
সারা বছর পার ক'রেছে কেবল খেলে খেলে।
মুখ শুক্‌নো, চোক ছল্‌ছল্, চিন্তায় মন ভার।
কষ্ট বড় হয় দেখ্‌লে রকম খানি তার॥
মায়ের কাছে আজ্‌কে ঘরে কেমন ক'রে যাবে।
উলট্ পালট্ মনের ভিতর এইটি শুধু ভাবে॥
সন্দেশ যা পেয়েছিল তাই-না খেতে খেতে।
চল্‌চে তবু, পা যদিও চলে না-ক যেতে॥

কিন্তু যাহার কপাল দোষে ঘরের ভিতর ভয়।
কোনও রূপে কখনও তার সুখ কি কোথাও হয়?
পথের মাঝে দেখা হ'ল সত্য কাকার সাথে।
জিজ্ঞাসিলেন—"কইরে বাপু বই নাই যে হাতে?
চারু বিপিন বই নে সবাই যাচ্চে ক'রে জাঁক।
এবার তবে দেখ্‌চি তুমি একাই গেলে ফাঁক!"
নীলকান্ত পড়্'ল স'রে জবাব তাঁরে দিয়ে।
"ভারি ত বই—চাইনে আমি—কি হবে ও নিয়ে?"

একটু বাদেই বাড়ীর ভিতর পড়্‌লো যখন এসে।
চিন্তা দিদি আদর ক'রে জিজ্ঞাসিলেন [illegible]
"এইমাত্র খুজ্‌তেছিলাম নীলকান্ত কই [illegible]
বই পাবে যে গিছ্‌লে ব'লে, দেখি কেমন বই।"
বিপদ দেখে তাঁর সাথে আর কথাটি না ব'লে।
মুখ ফিরিয়ে নীলকান্ত দৌড়ে গেল চ'লে॥

তার পরেতে নীলকান্ত গেল যখন ঘরে।
মা এসে তার জিজ্ঞাসিলেন বড়ই আদর ক'রে।
"নীলকান্ত, তোমার এত গৌণ কেন হ'ল।
তুমি কিছু বই আজ্‌কে পেলে কি না বল॥"
এতক্ষণে প্রাণের মাঝে বাজ্‌লো বড় তার।
মায়ের পানে চাইতে হেসে পার্‌লো না-ক আর॥

নীলকান্তের বাবা ছিলেন সেইখানেতে ব'সে।
ব'ল্লেন তাই নীলকান্তের রকম দেখে হেসে।
"নীলকান্ত বাহাদুরের পড়ায় মতি যে।

এমন ছেলে পাবে না ত, বই পাবে আর কে?
বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়ে সেই যে আছেন ছাই।
সাঙ্গ হ'ল বছর তবু বকের দেখা নাই!
বিপিন চারু মন্দ ছেলে বই নিয়ে তাই গেল।
নীলকান্ত ভাল, তাতেই শুধু হাতে এল॥"

বাবার কথায় অভিমানে মনটা গেল পুড়ে।
ঠোঁট ফুলিয়ে ভ্যাঁ ক'রে সে কান্না দিলে যুড়ে॥
মায়ের প্রাণে বাজ্‌লো দেখে, নিলেন তুলে কোলে।
মুখ মুছিয়ে ব'ল্লেন তায় মধুমাখা বোলে।
"বই পাও নাই—না-ই পেয়েছ তাতে ক্ষতি কি।
এস, তোমায় একটা আমি ছবির কেতাব দি॥"
এই-না ব'লে, বই থেকে তাঁর নীলকান্তের তরে।
চক্‌চকে এক ছবির কেতাব নিলেন বাহির ক'রে॥
ব'লে দিলেন নীলকান্তের হাতে সেটি দিয়ে।
"এ বইখানি তোমার হ[illegible] তুমি নিয়ে॥"

চক্‌চকে বই, খাসা ছবি, বড় বড় লেখা।
কান্না-মুখে নীলকান্তের ফুটলো হাসির রেখা॥
হ[illegible] হাসি মুখে মা ব'ল্লেন তায়।
"কেব[illegible] করলে বাপু চল্‌বে না-ক আর॥
এখন থেকে মন দে এবার পড় এমন ক'রে।
ভ্যাঁ ক'রে আর কাঁদ্‌তে যাতে না হয় বছর পরে॥"

সাঁওতালদের কুসংস্কার।

ছোটনাগপুরের কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে এক অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাদিগের বিশ্বাস যে ভূতেরা অসন্তুষ্ট হইলেই দেশে বিপদ উপস্থিত হয়। কোন গ্রামে ওলাউঠা বা অন্য কোন সংক্রামক রোগ হইলে সেই গ্রামস্থ স্ত্রীলোকেরা পুরুষের বেশ ধরিয়া ঠিক পূর্ব্ব দিকের গ্রামে শীকার করিতে বাহির হয়। এইখানে শূকর, পাখী বা অন্য কোন জন্তু যাহা পায় মারিয়া সঙ্গে লয়, এবং সেই গ্রাম হইতে মদ কিনিবার জন্য পয়সা চাহিয়া লয়; না পাইলে দুই একটা শীকার তাহাদের নিকট বিক্রয় করে। সন্ধ্যার সময় শীকারীগণ নদীর তীরে যাইয়া রাঁধে, তার-পর আহার ও মদ্যপান করিয়া গৃহে ফিরিয়া আইসে। ইহারা যে গ্রামে যায় সেই গ্রামের স্ত্রীলোকেরা আবার তাহাদের পূর্ব্ব দিকের গ্রামে ঐরূপ করিয়া যায়, সেখানকার স্ত্রীলোকেরা আবার তাহাদিগের পূর্ব্ব দিকে যায়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে এই ব্যাপার সেই জেলার সীমায় গিয়া শেষ হয়। ইহারা মনে করে এইরূপ করিলে ভূতকে ভুলাইয়া জেলার বাহিরে রাখিয়া আসা যায়।

প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর।

যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর বর্ম্মা হইতে ৩রা জানুয়ারী কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবেন। প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের পর ইনি ইংলণ্ডের রাজা ও ভারতের সম্রাট হইবেন। ইনি ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর ভ্রাতা প্রিন্স জর্জ ফ্রেডরিক ইহাঁর এক বৎসরের ছোট। দুই ভ্রাতাই বেশ লেখা পড়া শিখিয়াছেন। দুই জনে মিলিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী পরিভ্রমণে বহির্গত হন। সেই সময়ে ইহাঁদিগকে সামান্য নাবিকের পোসাক পরিয়া নাবিকের কায শিখিতে হইয়াছিল। ইহাঁরা দুই জনেই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ

করেন। আমরা যুবরাজ আলবার্ট ভিক্টরের ছবি দিলাম। এই ছবিতে ইনি সৈনিক পুরুষের বেশ পরিধান করিয়া আছেন। ইহাঁর খুড়া ডিউক অব এডিনবরা ও ডিউক অব কনট উভয়ই সৈনিক-বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী।

বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থান ইহাঁর দেখা হইয়া গিয়াছে। এখন কলিকাতা হইয়া নেপাল, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব ও রাজপুতানার প্রধান প্রধান নগর দেখিয়া পারস্য দেশে যাইবার কথা আছে। তথা হইতে গৃহে ফিরিবেন।

পেচক।

পেঁচা বাজ পাখী জাতি। ইহাদের ঘাড় এত ছোট যে ঘাড় পিঠে এক বোধ হয়। অন্যান্য পাখিরা কোন জিনিস দেখিবার সময়ে ঘাড় বাঁকাইয়া দেখে, পেঁচারা বড় বড় চোক দিয়া সোজা সম্মুখের দিকে তাকায়।

অসভ্য বা সভ্য পৃথিবীর কোন দেশের লোকেরই পেঁচার প্রতি অনুরাগ নাই। পেঁচা সর্ব্বত্রই ঘৃণার বস্তু। অন্যান্য গুণের কথা ছাড়িয়া দি, ইহার চেহারার প্রতিও লোকের দয়া নাই। "পেঁচা-মুখো" বা "পেঁচা-মুখী" আমাদের দেশের গালির কথা।

প্রাচীন গ্রীস ও ইটালি এবং অধুনাতন ইংলণ্ডেও পেঁচার ডাক দুর্ল্লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত। পেঁচার প্রতি এরূপ অযথা আক্রোশ শুদ্ধ ইউরোপে সীমাবদ্ধ নহে, ভারতবর্ষে, এসিয়ার অন্যান্য প্রদেশে, আফ্রিকায় ও আমেরিকারও পেঁচাটা ভয়ের জিনিস।

সেক্সপিয়ার ও অন্যান্য ইংরাজ কবিদিগের গ্রন্থে পেচকের অনেক মারাত্মক গুণের বিষয় চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। অন্ধকার গভীর রাত্রে পেঁচা ডাকিলে নিশ্চয় কোন দুর্ঘটনার লক্ষণ। দিনের বেলাও পেঁচা দেখা বড় দুর্লক্ষণ। সন্তানের জন্মকালে পেঁচা দেখা দিলে সন্তানের অমঙ্গল ঘটে। অন্যান্য সময়েও পেঁচার ডাক মৃত্যু বা বিশেষ কোন দুর্ঘটনার বিষয় জানাইয়া দেয়। বাঙ্গলা দেশেও অনেক স্থানে লোকের বিশ্বাস এক প্রকার পেঁচার হুট্ হুট্ হুট ডাক, গৃহের কাহারও শীঘ্র অত্যন্ত পীড়া হইবে তাহারই পরিচায়ক।

আফ্রিকা এবং বোর্ণিও প্রদেশের লোকের বিশ্বাস পেঁচা শয়তান বা মারের সহচর। ইহুদিদিগের বিশ্বাস পেঁচা ডাকিলে সন্তানাদির মৃত্যু ঘটে। এইজন্য যখনই তাহাদের বাড়ীর নিকটে পেঁচা ডাকে বা বাড়ীর উপর দিয়া পেঁচা উড়িয়া যায় তখনই তাহারা উঠানে এক কলসী জল ঢালিয়া দেয়। এইরূপ করিলে পেঁচার ভিতর যে শয়তান আছে তাহার দৃষ্টি বা মন সেই জলের দিকেই আকর্ষিত হয়, সন্তানের কথা ভুলিয়া যায়।

আরবদিগের বিশ্বাস পেঁচারা বৃদ্ধ, যুবা, শিশু

সকলেরই অনিষ্ট করিতে পারে। এই অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইবার উপায় সহজ। ইহারা যখনই পেঁচার ডাক শুনে তখনই পেঁচাকে অভিসম্পাত করে। পেঁচারা যখন ডাকে তখন তাহারা কেবল নিজ পেচক ভাষায় লোক বিশেষকে অভিসম্পাত করে। যাহার অনিষ্ট করিবে পেচক যদি তাহার নাম না জানে অথবা তাহার দিকে যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিতে পারে তবে সে লোকের আর কিছুই করিতে পারে না। শয়তানের নিদ্রা নাই কেবল লোকের অনিষ্ট চেষ্টায় ব্যস্ত, পেচক তাহার সহচর, প্রভুর আজ্ঞা পালন করাই তাহার রীতি, পেচককে যদি গালি দেওয়া যায় ও অভিসম্পাত করা যায় তবে শয়তান আর কিছুই করিতে পারে না; আরবদিগের এই বিশ্বাস।

পেচক সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এক এক ভাগের মধ্যে আবার অনেক শ্রেণী আছে।

অন্যান্য পেঁচা অপেক্ষা হুতুম পেঁচা খুব বড় হয়। ইহারা নদী, পুষ্করিণী ও অন্যান্য জলাশয়ে ও ধান্য ক্ষেত্রের ধারে থাকিতে ভালবাসে। দিনের বেলায় ইহাদের দৃষ্টি তত প্রখর নহে, তথাপি অন্ধ নহে। গাছের ডালে পাতার আড়ালে বসিয়া থাকে, বা কোটরে নিদ্রা যায়; মানুষের পদ শব্দ শুনিলেই কান খাড়া করিয়া মাথা হেঁট করিয়া স্থির দৃষ্টে আগমনকারীর প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতে থাকে। দূরভিসন্ধি একবার বুঝিতে পারিলে বাহির হইয়া আইসে, তখন কাহার সাধ্য আর এক পদ অগ্রসর হয়। সন্ধ্যার সময়ে ইহারা আহারের অন্বেষণে বাহির হয়। মধ্যে মধ্যে নিকটস্থ কোন বড় গাছে বসিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে থাকে।

পেঁচাদের আকার নানা প্রকার হয়। কয়েক প্রকার পেঁচা আছে তাহারা চড়াই পাখির অপেক্ষা বড় হয় না। আর এক প্রকার পেঁচা আছে তাহারা খুব বড় বড় হয়। ইহাদিগকে ইংরাজিতে ঈগল্-আউল্ বলে। ইহারা আমেরিকা, সাইবিরিয়া ও হিমালয় পর্ব্বতে বাস করে। ইহারা হরিণের ছানা, ছাগলের ছানা, ইন্দুর, ছুঁচা, সাপ, ব্যাং ও ইহাদের শত্রু দাঁড়কাক ও কাক ধরিয়া খায়। ইহাদের শব্দ পু-হু-পু-হুর ন্যায়। ইহারা এবং অন্যান্য জাতীয় পেঁচারা গাছে বাসা করে না। পর্ব্বতের ফাটলে বা ভগ্ন প্রাচীরে বাসা করে।

আর এক জাতীয় পেঁচা আছে, তাহাদের কান খুব লম্বা লম্বা হয়। দেশী কুকুরের কানের মত মাথার দুই ধারে খাড়া হইয়া থাকে।

ইউরোপে পেঁচা বুদ্ধি ও গাম্ভীর্য্যের আদর্শ বলিয়া প[illegible] তাহার কারণ বোধ হয়, এথিনী বা মিনার্ভা গ্রীক[illegible]গের বুদ্ধির দেবী আমাদের স্বরস্বতীর অনুরূপা, পেচক তাঁহারই প্রিয় পাখি। আমাদের দেশে পেঁচা [illegible] থাকে।

পেঁচাকে লোকে যতই [illegible] না, পেঁচা যে মানুষের অত্যন্ত হিতকারী তাহা নিঃসন্দেহ। ইহারা ইন্দুর প্রভৃতি মারিয়া [illegible] শস্য রক্ষা করে। ইহাদিগকে গোলাঘর বা শস্যক্ষেত্রের নিকট হইতে তাড়ান উচিত নহে। বরং ভাঙ্গা বাক্স, পিপে ইত্যাদি রাখিয়া ইহাদের বাস করিবার জন্য প্রলোভন দেখান উচিত। ইহাতে গৃহস্থের উপকার ভিন্ন অপকার নাই।